হরর কাহিনি

মৃত্যু-পুতুল

অনীশ দাস অপু



সূচি

মৃত্যু-পুতুল

ভূমিকা

মৃত্যু-পুতুল আমার পড়া ছিল না। টিংকু ভাই (কাজী শাহনূর হোসেন) গল্পটির বেশ প্রশংসা করেছিলেন। তবে গল্পটি রহস্যপত্রিকার কোন্ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে বলতে পারেননি। দ্বারস্থ হলাম শামীম পারভেজের। (এঁর কথা 'ভ্যাম্পায়ার'-এ আগেই উল্লেখ করেছি।) তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যু-পুতুল ফটোকপি করে পাঠিয়ে দিলেন রংপুর থেকে। সেই সঙ্গে আশির দশকে রহস্যপত্রিকায় ছাপা হওয়া বেশ কিছু গল্প। গল্পগুলো পড়ে ফেললাম। যেগুলো ভাল লাগল দিলাম টিংকু ভাইকে পড়ার জন্য। ওঁর কিছু গল্প আগেই পড়া ছিল। কয়েকটি পড়েননি। বেশিরভাগ গল্প তাঁর ভাল লাগল। প্রাথমিক সিলেকশন থেকে কিছু যোগ-বিয়োগ করার পরে চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচিত হলো ১৪টি গল্প। নামও ঠিক করা হলো—মৃত্যু-পুতুল। নামটি আমার কাছে চমৎকার লেগেছে, আপনার?

টাইটেলের গল্পটি প্রতিহিংসাপরায়ণ একটি পুতুলকে নিয়ে, বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে। কবীর আশরাফের ভাষার গাঁথুনি দারুণ, তরতর করে টেনে নিয়ে যায়। চমকে ওঠার মত হরর কাহিনি লিখেছেন পল্লব (ঘড়ি) এবং শুজা রশীদ (শোধবোধ)। আমি নিশ্চিত, দু'টি গল্পই মুগ্ধ করবে পাঠককে। দেলোয়ার হাসানের 'অশ্বমানব' পড়ে হবেন চমকিত, শিহরন জাগাবে নাজনীন রহমানের 'কামিনী'। কাজী শাহনূর হোসেনের ফ্যান্টাসি—হরর 'প্রেত' রোমাঞ্চিত করে তুলবে আপনাকে। গা শিরশিরে অনুভূতি এনে দেবে রোকসানা নাজনীনের 'দুঃস্বপ্ন' এবং সম্পাদকের 'মধ্যরাতের খাবার' (এ গল্পটির স্থান-কাল-পাত্রের কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে সম্পাদনার সময়) বিশু চৌধুরীর 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ' এবং কাজী মায়মুর হোসেনের 'দুঃস্বপ্নের রাত'ও পাঠকদের ভাল লাগবে। প্রিন্স আশরাফ হরর যে খুব ভাল লেখেন, 'ভয়'-এ নতুন করে আবার তা প্রমাণ করেছেন। সরোয়ার হোসেনের 'নতুন অতিথি' এবং শতদল চৌধুরীর 'ইরানী জিন'-এও আছে চমক। প্রতিটি গল্পেই যে গা ছমছমে একটা ভাব আছে, বইটি পড়া শেষে স্বীকার করবেন।

মৃত্যু-পুতুল আমার সম্পাদিত পঞ্চম হরর সংকলন। সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আর মাত্র একটি সংকলন করব—সেটি হরর বা পিশাচ যে কোনও কিছু হতে পারে। তবে হরর পিপাসু পাঠকদের সংগ্রহে রাখার মত বই হবে ওটা, এ নিশ্চয়তা রইল। বইটি এ বছরের যে কোনও সময় প্রকাশ হবে। ওই বইতে আমি আমার

সম্পাদিত বইগুলোর লেখকদের পরিচিতি তুলে ধরতে চাই। আশা করি লেখকরা এ ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করবেন। আমার সম্পাদিত পাঁচটি হরর ও পিশাচ গল্প সংকলনে যাঁদের লেখা ছাপা হয়েছে তাঁদেরকে আমার সঙ্গে ফোনে (০১৭১২৬২৪৩৩৬) অথবা পত্রপাঠ যোগাযোগের অনুরোধ করছি।

অনীশ দাস অপু

২৬৩, জাফরাবাদ (৪র্থ তলা)

শঙ্কর, ঢাকা।

মৃত্যু-পুতুল

প্রথম প্রকাশ: ২০০৭

মৃত্যু-পুতুল

'বাড়িটা তো ভালই, কিন্তু এত বড় বাড়ি সাজাব কী দিয়ে?' স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন মাজেদা বেগম।

'অসুবিধা কী। ফার্নিচার আমাদের কম নেই খুব একটা।'

'আব্বু, আমরা মোটে চারজন। এত বড় বাড়িতে থাকব কী করে?'

মেয়ের দিকে তাকালেন আহাদ সাহেব। বাড়ি দেখে মেয়ে খুশি হয়েছে কিনা বুঝতে পারলেন না। তবে চঞ্চলতা আছে খুব। ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে।

পুরনো লাল ইঁটের বাড়ি। খুব সস্তায় পেয়ে গেছেন আহাদ সাহেব। পাহাড়তলীতে ভাড়া বাসায় এতদিন ছিলেন। জাঁকজমক সেখানে ভালই ছিল। তবুও তো ভাড়া বাড়ি।

তা ছাড়া রমরমা প্র্যাকটিস। ডাক্তার হিসাবে নামডাক কিছুটা ছিল। সব ছেড়েছুড়ে চলে এলেন কুসুমপুরে। চিটাগাঙে এই অঞ্চলটাই সবচেয়ে প্রাচীন। হিন্দু জমিদারদের বাড়িঘর আছে ছড়ানো ছিটানো। ভাঙা-চোরা। পলেস্তারা খসা।

এই বাড়িটাই সবচেয়ে ভাল। মালিক কাদের চৌধুরী কেন যে হুট করে বিক্রি করে দিলেন বুঝতে পারলেন না আহাদ সাহেব। তেমন কিছু জিজ্ঞেসও করেননি এ ব্যাপারে।

হাজার হোক জমিদারী শানশওকত আছে বাড়িটাতে। সুযোগ বারবার আসে না। বিশাল বাড়িটার দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন আহাদ সাহেব। 'একটু নির্জন, এই যা।'

'একটু না, বেশ নির্জন। আমার তো রাত বিরেতে গা ছমছম করবে একা বেরুতে।' মাজেদা বেগম ক্ষোভ চেপে রাখার চেষ্টা করলেন না।

'আরে না না। ওই তো ওদিকে রশীদ চেয়ারম্যানের বাড়ি। আর পুবে ফজুমিয়ার বাড়ি। তেমন কোনও অসুবিধা হবে না,' স্ত্রীকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন আহাদ সাহেব।

'এই তোমরা সব দেখছ কী? মালপত্রগুলো নামাও না। বিকেল হতে তো আর বাকি নেই।'

তাড়া খেয়ে ঠেলাঅলারা ধরাধরি করে মালপত্র নামাতে শুরু করল। সেগুন কাঠের ভারি ভারি খাট পালং। টেনে হিঁচড়ে নামাবার চেষ্টা করতেই হ্যা হ্যা করে উঠলেন আহাদ সাহেব। 'আহ হা। আঁচড় লাগবে তো খাটে। আলগা করে তুলে নামাও না। কাজকর্ম শেখোনি কিছু?'

বিকেল নাগাদ সব জিনিসপত্র ঘরে তোলা হয়ে গেল। মিতার উৎসাহের অন্ত নেই। এটা সেটা ধরে টানাটানি করছে। আহাদ সাহেব খুশি হলেন। একে নিয়েই চিন্তা ছিল। ভীষণ জেদী মেয়ে। যদি অপছন্দ করে বসত তা হলে মুশকিল হত খুব।

'কি মা, পছন্দ হয়েছে বাড়ি?'

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর। কেমন রাজবাড়ি রাজবাড়ি ভাব, না?'

'আরে রাজবাড়িই তো ছিল এটা।' মেয়ের কথায় হাসলেন আহাদ সাহেব। 'জমিদার নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরীর বাড়ি ছিল এটা। কাচারী বাড়ি। কোলকাতা থেকে এখানে এসে থাকতেন মাঝে মাঝে।'

'আমার রুম ঠিক করে ফেলেছি দোতলায়।'

'তাই নাকি? তুমি একা একা থাকতে পারবে আলাদা রুমে?'

'বারে! আগের বাসায় ছিলাম না?' ঠোঁট ওল্টাল মিতা।

'ঠিক আছে। তোমার মাকে বলে দেখো।'

কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে বিছানাপত্র ঠিকঠাক করছিলেন মাজেদা বেগম। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। এখন তাঁর পরিশ্রম করার সময় নয়। হাবুর মাকে চিৎকার করে কিছু একটা বলে এ ঘরে এসে ঢুকলেন।

'কী কথা হচ্ছে বাপ-মেয়েতে?'

'মিতা দোতলায় আলাদা ঘরে থাকতে চাইছে।'

'বললেই হলো। ওই একরত্তি মেয়ে দোতলায় একা থাকবে!'

'আহা, তা কেন? আমরাও তো দোতলায়ই থাকব।'

'মোটেই না, একতলায় থাকব সবাই। দোতলায় কাঠের বড় বড় জানালা। কেমন একটা প্রাচীন প্রাচীন ভাব। মাকড়সার জালে ভর্তি।'

স্বামীর কথা আমলেই আনলেন না মাজেদা বেগম। ওপরতলাটা পছন্দ হয়নি তার। অনেক উঁচুতে সিলিং আর অদ্ভুত তিনকোনা জানালা। দেয়ালের গায়ে বড় বড় কাঠের আলমারি। ওখানে থাকলে রাতে ভয় লাগবে তার।

'জানো, আব্বু, দোতলায় বাদুর আছে,' চোখ বড় বড় করে বলল মিতা।

'বাদুর? কোথায়?'

'দোতলায় ভেন্টিলেটরে অনেকগুলো দেখলাম।'

'তোর আর ওপরে গিয়ে কাজ নেই। মুখে খামচে দেবে,' মেয়েকে সাবধান করে দিলেন মাজেদা বেগম। আহাদ সাহেব বললেন, 'যাক না। খেলুক ওপরে গিয়ে। বাদুর কাউকে খামচায় না।'

এই এক দুর্বলতা তার। মেয়েটার মুখের দিকে চাইলে কিছুতেই তাকে না বলতে পারেন না। বারো বৎসরের বিবাহিত জীবনে কোনও সন্তান হয়নি তাদের। চার বৎসরের মাথায় এতিমখানা থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন মিতাকে।

চার বৎসর বয়স তখন মিতার। আহাদ সাহেব বা মাজেদা বেগম কোনওদিনই বুঝতে দেননি কাউকে মিতা তাদের পালিতা মেয়ে। কিন্তু মিতা জানে।

মা-বাবার অভাব কখনও বোধ করেনি সে। সুযোগ হয়নি। আদরে স্নেহে তাকে ঘিরে রেখেছেন আহাদ দম্পতি।

সন্ধ্যা নামছে পাহাড়ে। দূরের সমুদ্রে অবিশ্রাম গর্জনে ভেঙে পড়ছে ঢেউ। সেদিকে তাকিয়ে রইলেন আহাদ সাহেব। সাগর পারের নতুন জীবন কেমন হবে কে জানে।

খুশিতে নাচতে নাচতে ঘরে ঢুকল মিতা। 'আব্বু, আব্বু, দেখো এটা কী?'

প্রায় দেড়ফুট লম্বা একটা পুতুল মিতার হাতে। 'কোথায় পেলে এটা?'

'দোতলায়। দেয়াল আলমারির ভেতরে ছিল। ইস, কী সুন্দর না পুতুলটা?' খুশিতে চকচক করছে মিতার চোখ।

ভাল করে পুতুলটা দেখলেন আহাদ সাহেব। অনেক পুরনো। তিরিশ চল্লিশ বছরেরও হতে পারে। এর আগে এ ধরনের পুতুল চোখে পড়েনি তাঁর। কালো ফ্রক পরা। মাথায় ইউরোপিয়ান বাচ্চাদের মত কালো বনেট।

'মনে হয় কাদের সাহেবের জিনিস। ভুলে ফেলে গেছেন। কাল একসময় দিয়ে আসতে হবে ওটা।'

'না, দেব না এটা আমি। আমি পেয়েছি এটা। আমার পুতুল।' বুকের সাথে চেপে ধরল মিতা পুতুলটা। যেন কেউ কেড়ে নেবে বলে ভয় পাচ্ছে।

মাজেদা বেগম ঘরে ঢুকলেন। মুখে ক্লান্তির ছাপ। 'না, আজকে সব গোছগাছ করা সম্ভব না। হাবুর মা তো একটা আলসের হদ্দ। তোমার ফার্মেসীর ওরা খাট-পালংগুলো ফিট করে না দিয়ে গেলে মেঝেতে শুতে হত আজ।'

আহাদ সাহেব হাসলেন। স্ত্রীর এই গোছগাছ করার অভ্যাস অনেক পুরানো। একদিনেই সব করে ফেলতে চায়।

'দেখো কী পেয়েছে তোমার মেয়ে।'

'দেখেছি আমি। সকাল থেকেই তো দোতলায় পই পই করে ঘুরছে। আরও কত কী যে আবিষ্কার করবে কে জানে। এই মিতা, যা হাতমুখ ধুয়ে আয়। মাকড়সার জাল আর তেলেপোকার লাদি দিয়ে তো ঢেকে গেছে মাথা।'

'অ্যাঁ, মা। কী বলো তুমি!' ঘেন্নায় তিড়িং-বিড়িং করতে লাগল মিতা। মাথা ঝাঁকাল কয়েকবার।

'চা খাইবেন, আম্মা?' নতুন পাকের ঘর থেকে বেরিয়ে এল হাবুর মা। আদর্শ ফোকলা বুড়ি। কানে প্রায় শোনেই না। তবে শরীর শক্ত সমর্থ। কাজ করতে পারে খুব। 'খাওয়া যাক এক কাপ, কী বলো?' স্ত্রীর দিকে চাইলেন আহাদ সাহেব।

'হরলিকস বানাও। খুব টায়ার্ড লাগছে।' চেয়ারে বসলেন মাজেদা বেগম।

'আম্মু, এটার নাম দিয়েছি কি জানো?' আদর করে পুতুলটার মাথায় হাত বুলাচ্ছে মিতা। অদ্ভুত একটা পুতুল। চোখ দুটো একদম সাদা। মাথাটা সামান্য ওপর দিকে তোলা, মনে হয় যেন অন্ধ।

'কী?'

'পুতুলটা খুব পুরনো মনে হয় না? তাই নাম দিলাম জুলেখা।'

'কী নাম দিলি?' ভ্রূ কুঁচকে গেল মাজেদা বেগমের।

'জুলেখা।'

'এটা একটা নাম হলো? কত সুন্দর সুন্দর নাম আছে। তা না একটা গাঁইয়া নাম রাখলি?'

'আমার বন্ধু। আমার যা খুশি রাখব।' ঠোঁট ফুলাল মিতা। মায়ের খোঁচাটা ভাল লাগেনি ওর।

বাপের গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল মিতা। 'তোমার বন্ধু বুঝি এটা?'

'হ্যাঁ। এতবড় ডল পুতুল আর কারও নেই।'
'ঠিক আছে। আমরা তা হলে পাঁচজন হলাম বাসায়, না?'
হেসে ফেলল মিতা। তার নিজের রুমের দিকে চলে গেল সে।
নীচতলায় মোট পাঁচটা রুম। সামনের দিকে ড্রইং রুম। মাঝখানের ঘরটাকে লিভিংরুম বানানো হয়েছে। উত্তর দিকের ছোট রুমটায় মিতা আর বুয়া থাকবে। পুবের ঘরটা আহাদ সাহেবের স্টাডি। পাঁচ নম্বর কক্ষে রান্নাঘর।
নতুন বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি, পানি, সবই আছে। মিতা নিজের ঘরে ঢুকে সুইচ টিপতেই উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল চারদিক।
বাইরে রাত নেমেছে। গ্রামটা এখন সুনসান, নীরব মনে হচ্ছে। শুধু সমুদ্রের চাপা গর্জন শোনা যাচ্ছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মিতা।

জোনাকীর আলোয় ভরে গেছে সমুদ্রের ধার। সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর সমুদ্রের উঁচু পাড়। পায়ের শব্দে পিছনে চাইল মিতা। আহাদ সাহেব ঢুকলেন ভিতরে।
'বাহ্। চমৎকার সাজানো হয়েছে তো মা মণির রুম।'
'জুলেখা থাকবে আমার পড়ার টেবিলের ওপর, আর বুয়া ওই দিকে। আচ্ছা, আব্বু, ওই ফাঁকা জায়গাটায় তো আমরা রাতে বেড়াতে পারব, না?'
জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন আহাদ সাহেব। কী গর্জন! অথচ কী সুন্দর। অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। চিটাগাঙের হৈ হুল্লোড়ের সাথে কোনও তুলনাই হয় না।
চাঁদের আলোয় দুই ফিটের মত উঁচু লাল ইঁটের দেয়ালটা চোখে পড়ল এতক্ষণে। হঠাৎ একটা অস্বস্তিতে ভরে উঠল মন। এই রুমে মিতাকে থাকতে দেয়া কি ঠিক হলো? জানালা দিয়ে তাকালেই ওর চোখে পড়বে ওটা।
চৌধুরীদের পুরনো পারিবারিক গোরস্তান। এই ঘরে বসে গোরস্তানটাই চোখে পড়বে ওর সবার আগে। ছোট্ট মেয়ে। ভয় পাবে না?
অথচ যে রকম জেদী। একবার যখন নিজে পছন্দ করেছে শত চেষ্টাতেও আর রুম বদলাতে রাজি হবে বলে মনে হয় না। খুঁতখুঁত করছে আহাদ সাহেবের মন।
'ওটা কবরস্তান, মা। ওখানে বেড়াতে যেতে পারব না আমরা।'
'চাইলে ওই দিকের রুমটা নিতে পারো।'
'কেন?'
'রাতের বেলা ভয় করবে না?'
'নাহ্। আমরা তো তিনজন থাকব এ ঘরে।'
'তিনজন মানে?'
'বারে। আমি, বুয়া আর জুলেখা। তিনজন হলাম না?'
ভুলেই গিয়েছিলেন আহাদ সাহেব ব্যাপারটা। 'ওহহো। তাই তো। তোমার তো আবার একজন বন্ধু জুটেছে।
রাতের খাবার শেষে তাড়াতাড়ি শোওয়া হলো আজ। নতুন বাড়ি। মাজেদা

বেগম একা উঠোনে যেতে রাজি হলেন না। তাঁর নাকি গা ছমছম করে। বুয়া গিয়ে উঠোনের দিকের দেয়ালের ছোট গেটটা বন্ধ করে দিয়ে এল।

বেশ কয়েকটা বড় বড় শিশু আর ইউক্যালিপ্টাস গাছ উঠোনে। একটা দুর্লভ গাছ আছে। নাগলিঙ্গম।

মিতাকে শুইয়ে দিতে এসে আহাদ দম্পতি উঠোনটা আরেকবার দেখলেন ভাল করে। মাজেদা বেগমের মনে হলো এই বাড়িতে আরও কিছু লোক থাকলে ভাল হত।

'চোর ডাকাতের ভয় নেই তো?'

'আরে না। এই তো কাছেই পুলিশ ফাঁড়ি আছে একটা। তা ছাড়া লোকজনও খুব ভাল এদিকটায়।'

স্ত্রীকে আশ্বস্ত করবার জন্যে বললেন বটে কথাটা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এসব ব্যাপার আরও ভাল করে ভেবে দেখা উচিত ছিল তাঁর। বাড়িটা সত্যি বড্ড নির্জন।

মিতার রুম থেকে নিজেদের ঘরে চলে আসবার সময় পুতুলটাকে দেখতে পেলেন আহাদ সাহেব। টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে জানালার বাইরে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত চিন্তা মাথায় এল আহাদ সাহেবের। মনে হলো সত্যি সত্যি দশ-বারো বছরের একটা মেয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। চোখ দুটো দুধ সাদা, অদ্ভুত। কিন্তু মনে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছে সব কিছু। জীবন্ত।

মেয়ের গোঙানির শব্দে ঘুম ভাঙল মাজেদা বেগমের। ঘুম প্রায় আজকাল হয়ই না তাঁর। এখন সাত মাস চলছে। শুয়ে বসে কোনভাবেই স্বস্তি পান না।

তাড়াতাড়ি উঠে আলো জ্বাললেন। দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। হালকা নীল আলোয় চুপচাপ শুয়ে আছে মিতা। মশারীর ফাঁক দিয়ে সুন্দর, মায়াভরা মুখটা দেখা যাচ্ছে। 'এই মিতা।' ঝাঁকানি দিলেন মেয়েকে মৃদুভাবে। 'স্বপ্ন দেখছিলি?'

চোখ খুলে চাইল মিতা। কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে। তারপর স্বাভাবিক হয়ে এল। 'হ্যাঁ। এখন না। সকালে বলব।'

'ওই ঘরে শুবি? ভয় লাগছে?'

ঘাড় নাড়ল মিতা। কী যে হয়েছে মেয়ের—সাত-আট মাস হয়ে গেল সব সময় আলাদা বিছানায় ঘুমাবে। মেঝেতে অঘোরে ঘুমুচ্ছে হাবুর মা। বুকটা সামান্য ওঠানামা করছে। তাতেই বোঝা যাচ্ছে বেঁচে আছে।

শুয়ে শুয়ে মিতা স্বপ্নটার কথা ভাবছে। বড় অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছে সে।

অন্ধ একটা মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে সমুদ্রের ধারের উঁচু রাস্তা দিয়ে। কয়েকটা দুষ্টু ছেলেমেয়ে পিছু নিয়েছে তার। ক্ষ্যাপাচ্ছে।

'সামনে একটা পাথর আছে। ঘুরে যাও।'

'এদিকে গেলে সোজা পানিতে পড়বি।'

চুপচাপ হাঁটছে মেয়েটা। দশ এগারো বছর বয়স। দৃষ্টিহীনের আড়ষ্ট,

সাবধানী হাঁটা। দুই হাত শূন্যে ভাসছে। বোঝার চেষ্টা করছে কোনও বাধা আছে কিনা।

হাসছে দুষ্টু ছেলেগুলো। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ মেয়েটা। সন্দেহ দেখা দিল মনে। এই পথ তার মুখস্থ। বহুবার গেছে এখান দিয়ে। তবু কোনও ভুল হচ্ছে না তো?

কী করবে সে এখন। মনকে শান্ত করল অনেক চেষ্টা করে। ওদেরকে পাত্তা না দেয়াই ভাল। পাজী ছেলেমেয়ে সব।

'তোর মা নাগর নিয়ে বসে আছে। জলদি বাড়ি যা।'

'তোর বাবাই নাকি ভাড়া খাটায়। আব্বার কাছে শুনেছি।'

কান ঝাঁ ঝাঁ করছে মেয়েটার। মাথা ঠাণ্ডা। রাখতে চেষ্টা করল তা সত্ত্বেও।

সামান্য ভুল হলেই বিপদ হতে পারে। কয়েকবার এদিক ওদিক পা বাড়িয়ে পরখ করল সে। কয়েকটা নুড়ি ঠেকল পায়ে। এই পথে তো নুড়ি নেই। তা হলে?

সমুদ্রের আওয়াজ শুনে দিক খোঁজার চেষ্টা করল মেয়েটা। জোরে বাতাস বইছে আজ। চারদিক থেকেই ভেসে আসছে জলরাশির গর্জন। ভয় পেল সে এবার।

হাততালি দিয়ে হাসছে ছেলেমেয়েগুলো। মনে হচ্ছে চারদিক ঘিরে রেখেছে ওরা। বাঁয়ে একটু ঘুরল মেয়েটা। সম্ভবত এটাই।

পাঁচ-সাত হাত এগিয়ে গেল সামনে। হঠাৎ একটা বড় পাথরে ঠেকল হাত। ক্ষুদ্র বুকটা কেঁপে উঠল অজানা আশঙ্কায়।

'ঠিকই আছে। যাও না,' বিকৃত স্বরে বলল একজন।

কয়েক পা পিছিয়ে এল সে এবার। সমুদ্রের গর্জনের শব্দ হঠাৎ বেড়ে গেল। একটা গাংচিলের কর্কশ ডাক শোনা গেল কাছেই।

সোজা সামনে হাঁটবার চেষ্টা করল মেয়েটা। অসহায় বোধ করল ভীষণ ভাবে। আর কত দূরে বাড়ি?

এক পা সামনে দিয়েই বুঝতে পারল ভুল হয়ে গেছে। পিছিয়ে আসার চেষ্টা করল তাড়াতাড়ি। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল। বাতাসে কয়েকবার দ্রুত পাক খেল ছোট দুটো হাত। টের পেল শূন্যে ভাসছে তার শরীর।

চারপাশ থেকে ঠাণ্ডা পানি এসে যখন তাকে ঘিরে ধরল তখন কোনও কষ্ট অনুভব করল না মেয়েটা।

তার সমস্ত মন জুড়ে তখন ভর করেছে ভীষণ ক্রোধ। কেন, কেন সে দেখতে পায় না? কেন তাকে এভাবে অসহায় অবস্থায় পড়তে হলো।

ঘৃণা আর রাগে তখন চারপাশের পরিস্থিতি বেমালুম ভুলে গেছে মেয়েটা। ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছে, আর তখনই মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙল মিতার। বুঝতে পারল ঘেমে গেছে সারা শরীর। স্বপ্নের মেয়েটার কথা মনে পড়ল। খুব মায়া হলো তার জন্যে। কেমন যেন চেনা চেনা লাগল ওকে। কোথায় দেখেছে আগে?

নতুন স্কুলে আজই প্রথম গেল মিতা। চট্টগ্রাম শহরের স্কুলের সাথে কোনও

তুলনাই চলে না এর। সব কিছু ছোট ছোট। শেলী আর চম্পাকে খুব ভাল লাগল ওর। প্রথম দিনই ওকে বেঞ্চে বসার জায়গা করে দিয়েছে ওরা।

কিন্তু শিউলিকে পছন্দ হয়নি। কেমন যেন হিংসুটে চেহারা মেয়েটার। মিতা স্কুলে ফার্স্ট হত শুনে চেহারা শুকনো হয়ে গেছে ওর। এ পর্যন্ত শিউলিই ছিল ফার্স্ট গার্ল। শেলীই সাবধান করে দিল ওকে।

'শিউলিটা খুব হিংসুটে। আর খুব ডাঁট। ওর বাবা তো সওদাগর। খুব বড়লোক। কাউকে পাত্তাই দেয় না।'

মিতার মন খারাপ হয়ে গেল। নতুন জায়গায় এসেই কারও সাথে মন কষাকষি করতে চায়নি ও। কিন্তু কপাল খারাপ। 'আমি ওর সাথে ঠিকই খাতির জমাতে পারব, দেখো। আমার নামই তো মিতা।'

'চেষ্টা করেই দেখো না।'

ঘণ্টা বাজার পর এগিয়ে গেল মিতাই।

'তোমার নাম শিউলি?'

'হ্যাঁ, তোমার?'

'মিতা।'

'তোমরা ওই পুরনো জমিদার বাড়িটা কিনেছ?'

'হ্যাঁ। খুব সুন্দর না বাড়িটা?'

'সুন্দর না ছাই। ক'দিন গেলেই বুঝতে পারবে।'

ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল শিউলি। মুখ কালো করে চলে এল মিতা। মেয়েটা আসলেই হিংসুটে। ওরা জমিদারবাড়ি কিনেছে বলে হিংসা করছে। মনে মনে রাগ হলো মিতার।

'তোমরা আমাদের বাসায় খেলতে এসো, কেমন?' চম্পা, শেলীদেরকে বলল মিতা।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা।

'না, ভাই। অতদূরে মা যেতে দেবে না। তারচে' তুমিই বরং এসো আমাদের বাসায়।'

'বারে। আমার বুঝি দূর হবে না?'

'তা হলে সাগরের ধারে আম বাগানে খেলব আমরা, কেমন?'

'তা না হয় হলো। তাই বলে আমাদের বাসায় আসবে না কেন?'

চোরা চোরা মুখে হাসল শেলী। কোনও উত্তর দিল না।

ক্লাশে প্রথম দিনটা ভালই কাটল মিতার। বাসায় ফিরতেই মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কীরে, কেমন লাগল স্কুলে।'

'খুব ভাল। জানো, আম্মু, এখানে আপা, স্যাররা না খুব ভাল। একদম বকে না। শেলী, চম্পা, চিত্রা এরাও খুব ভাল।'

'এরি মধ্যে এত বন্ধু জুটে গেছে?'

'হ্যাঁ।' হঠাৎ কী মনে পড়ল, বলল, 'কালকে জুলেখাকে স্কুলে নিয়ে যাব, আম্মু। আজকে মনেই ছিল না।'

'কথা শোনো ধাড়ি মেয়ের। ক্লাস ফাইভের মেয়ে পুতুল নিয়ে স্কুলে গেলে

হাসাহাসি করবে না সবাই?'

'করলে করবে। আমি ওদের ধার ধারি নাকি?'

হাত-মুখ ধুতে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল মিতা। মাজেদা বেগম খুশি হয়েছেন যে মিতার স্কুল ভাল লেগেছে। চট্টগ্রাম শহরের স্কুলের কথা মনে পড়ল তার। কয়েকটা মেয়ে, 'পালিতা মেয়ে' বলে খুঁচিয়ে প্রায় পাগল বানিয়ে দিয়েছিল মিতাকে।

সেই ভয় এখনও কাটেনি তাঁর। এখানে কেউ যদি আবার জেনে ফেলে তা হলে? মেয়ের মায়াভরা মুখটা মনে হতেই বুকটা খাঁ খাঁ করে উঠল। বারো বছর পর তাঁর নিজের সন্তান আসছে।

সহ্য করতে পারবে তো মিতা? নাকি নিজেকে অবহেলিত মনে করবে? মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে না তো? অজানা আশঙ্কায় মুখটা মলিন হয়ে গেল।

হাজার হোক মিতাই তাঁদের প্রথম সন্তান।

বিকেলবেলা হাঁটতে বেরুল মিতা। উত্তর দিকে চট্টগ্রামের রাস্তা। সেদিকে গেল না সে। পুব দিকে সাগর। ওদের বাসা থেকে প্রায় চারশো গজ দূরে হবে।

সরু পায়ে চলা পথ। কিছুদূর হাঁটতেই গোরস্তানটা চোখে পড়ল মিতার। অনেক পুরনো লাল ইঁটের নিচু দেয়াল। পলেস্তারা খসে পড়েছে। ঝোপঝাড় লজ্জাবতী লতায় ভর্তি। সিমেন্ট আর মার্বেল পাথরে ঘেরা কবরগুলো প্রায় দেখাই যায় না। কয়েকটা হেডস্টোন খুব উঁচু। ত্রিশ চল্লিশটার মত কবর। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মিতা।

ভেতরে ঢোকবার ইচ্ছা হলো। কিন্তু একটু ভয় ভয়ও লাগছে। আম বাগানটা নজরে পড়ল ওর। কবরস্তানের পাশেই।

দোলনায় দুলছে একটা ছোট ছেলে। আরেকটা মেয়ে ধাক্কা দিচ্ছে পাশে দাঁড়িয়ে। মিতার চেয়ে ছোটই হবে মেয়েটা। ছেলেটা আরও ছোট।

ওদের দিকে এগিয়ে গেল মিতা। দাঁড়িয়ে রইল দোলনার পাশে।

'তুমি দোলনায় ঝুলবে?' ছোট্ট ছেলেটা বলল। খুব মিষ্টি চেহারা ছেলেটার।

ইস্। এ রকম যদি একটা ভাই থাকত আমার। ভাবল মিতা। মনটা খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ। নিজের বাবা-মারই খবর নেই। আবার ভাই।

দোলনা থেকে নেমে এসে হাত ধরে ওকে টানছে ছেলেটা। 'তুমি খেলবে? তা হলে এসো।'

'তোমার নাম কী?'

'টুনু। ওর নাম বিলু।' মেয়েটাকে দেখাল টুনু।

খুশিভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। কিন্তু কিছু বলছে না। আবার কথা বলল টুনু। 'বিলু কথা বলতে পারে না।'

'তোমার বোন, না?'

'হ্যাঁ।'

দোলনায় দুলতে গিয়ে হাত থেকে ফসকে নীচে পড়ে গেল মিতার পুতুলটা। চম্পাকে দেখতে পেল সে। আম বাগানে এসে দাঁড়িয়েছে।

'কী, তোমার পুতুল। খুব সুন্দর তো।'

চম্পার কাছ থেকে নিয়ে নিল পুতুলটা মিতা। 'এইটা আমার বন্ধু।'
'কোত্থেকে কিনেছ?'
'পেয়েছি। আমাদের নতুন বাসার দোতলায়,' খুশিভরা কণ্ঠ মিতার।
সন্দেহভরা চোখে চাইল চম্পা। 'আগে থেকেই ছিল ওটা?'
'হ্যাঁ।'
'পুতুলটা ফিরোজার ছিল। আমি দেখেছি ওর কাছে। এটা ফেলে দিও। ভাল না পুতুলটা,' বিরসমুখে বলল চম্পা।
'এত্তবড় পুতুলটা ফেলে দেব, না?'
'নইলে ফিরোজার মত তুমিও মরবে।'
চম্পার উপর রাগ হলো মিতার। এসব কথার মানে কী? 'মরব মানে?'
'তোমাদের বাসায় আগে থাকত ফিরোজা। দুদিন পুতুলটা দেখেছিলাম ওর কাছে। তারপরই তো ছাদ থেকে পড়ে মারা গেল ও। হাতে তখন এটা ছিল।'
'ধ্যাৎ।'
'চলো ওই দিক থেকে ঘুরে আসি। শেলীদের বাসা না ওটা?'
'চলো।'
টুনুদের রেখে হাঁটতে লাগল ওরা। শেলীকে দেখা গেল ওদের বাসার বারান্দায়। মিতাদের সাথে যোগ দিল সেও।
'এখানে এসে অনেক বন্ধু হলো আমার। সবচেয়ে আগে বন্ধু হয়েছে জুলেখা।' বুকে চেপে ধরল মিতা জুলেখাকে।
'কে?' অবাক হলো শেলী।
'জুলেখা।' পুতুলটাকে দেখাল মিতা।
বিস্মিত চোখে চম্পার দিকে চাইল শেলী।
'এই নামটা তুমি কোথায় পেলে?'
'মনে হলো,—তাই দিলাম। একটু পুরনো ধরনের পুতুল তো।'
'কেউ বলেনি তোমাকে?' চোখ আরও বড় হলো শেলীর।
'নাহ্।'
মিতাকে এড়িয়ে আবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ওরা। কিছু একটা কথা বিনিময় করল চোখে চোখে।
'এসো আমার সঙ্গে।'
মিতাকে টানতে টানতে কবরস্তানের দিকে নিয়ে গেল শেলী। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, বুঝতে পারছে মিতা। সেও কোনও কথা না বলে ওদের সাথে ঢুকল গোরস্তানে।
একটা অনেক পুরনো কবরস্তানের কাছে এল শেলী। ঝুঁকে দেখল কিছু একটা। তারপর ঘাস, লতাপাতা হাত দিয়ে সরিয়ে একটা জীর্ণ হেডস্টোন বের করল। খোদাই করা সিমেন্টে ছোট্ট করে লেখা, 'জুলেখা।'
আর কিছুই লেখা নেই। কবে জন্ম, কবে মৃত্যু, বাবা-মার নাম, কিছুই নেই।
মিতা কিছু বুঝতে পারল না। শেলী আর চম্পা বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কিন্তু ঘাবড়াল না মিতা।

'চলো আম বাগানে গিয়ে খেলি।'

কিন্তু শেলী আর চম্পার মধ্যে খেলার কোনও আগ্রহ দেখা গেল না।

বেশ কয়েকবার মিতাকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল ওরা।

স্কুলে শিউলির সাথে ছোটখাট একটা ঝগড়াই হয়ে গেল মিতার। কোথা থেকে যেন শুনেছে সে মিতা বাবা-মার পালিতা মেয়ে। এতিমখানায় ছিল। সেটা ধরেই খোঁচা দিল সে। 'তুমি তো আহাদ সাহেবের মেয়ে না। এতিমখানায় ছিলে। তুমি আমাদের সাথে খেলবে না।'

রাগ চেপে রাখতে পারল না মিতা। শেলী আর চম্পার দিকে তাকাল সে। নতুন খবরটা শুনে ওদের মুখেও একটা পরিবর্তন লক্ষ করল। আরও কয়েকজন তাকিয়ে আছে এই দিকে।

'খবরদার, বাজে কথা বলবে না। আমি তো আব্বু-আম্মুরই মেয়ে।'

'বাড়িতে থাকলেই মেয়ে হয় না।' বিদ্রূপ ঝিলিক দিচ্ছে শিউলির চোখে।

অসহায় বোধ করছে মিতা। শেলীরাও কিছু বলছে না। মিতা জানে শিউলি সত্যি কথাই বলেছে। কিন্তু আব্বু-আম্মু এত আদর করে ওকে। ওরাই তো তার বাবা-মা। হঠাৎ কান্না পেল মিতার।

শেলী থামিয়ে দিল শিউলিকে। 'বেশি প্যাটপ্যাট করো তুমি। এসব নিয়ে তোমার কথা বলার কী দরকার?'

বাসায় ফেরার সময় কেমন জ্বর জ্বর বোধ করল মিতা। শরীর খারাপ লাগছে বলে আপার কাছ থেকে এক ঘণ্টা আগেই ছুটি চেয়ে নিয়েছে।

সমুদ্রের ধার দিয়ে হেঁটে আসছে মিতা। একা। মন খুব খারাপ। শিউলি, শেলী, চম্পা, সবার ওপর রাগ হচ্ছে তার। কচুর স্কুল। আর যাবে না সে ওখানে।

মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সমুদ্রের দিকে চাইল কয়েকবার। ফিকে হয়ে আসছে রোদ। কয়েক মিনিটের মধ্যে কুয়াশায় ঢেকে গেল চারদিক।

কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছে মিতা। কুয়াশায় পথ ঘাট কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

একটা হালকা ছায়ার মত আবছা দেখতে পেল মিতা। কালো ফ্রক পরা একটা মেয়ে হেঁটে আসছে যেন এদিকে। কুয়াশার ঘন পর্দা ভেদ করে কিছু দেখতে পাচ্ছে না মিতা।

গন্ধটা হঠাৎ করেই চিনতে পারল সে। কর্পূরের গন্ধ।

আন্দাজে পা ফেলতে গিয়ে তাল হারিয়ে ফেলল মিতা। জ্বরের ঘোরে বুঝতে পারল না কী ঘটতে যাচ্ছে। হালকা ছায়াটা বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই উপর থেকে নীচে পড়ল মিতা।

বাতাসে তখন সমুদ্রের বুনো গর্জন ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

বিলুই প্রথম দেখল মিতার জ্ঞানহীন দেহটা। বোবা বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল উঁচু রাস্তা থেকে। নীচে কয়েকটা পাথরের উপর অদ্ভুত ভঙ্গিতে শুয়ে আছে সেই একটু আগে দেখা মেয়েটা।

আহাদ সাহেব থরথর করে কাঁপছেন। বিলুর দুর্বোধ্য চিৎকারে কয়েকজন

লোক জুটে গিয়েছিল। তারাই ধরাধরি করে মিতাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে।

যতটা ভয় করেছিলেন ততটা ক্ষতি হয়নি। বাম পায়ের হাড়ে ফ্র্যাকচার হয়েছে। গ্রীনস্টিক ফ্র্যাকচার।

'আল্লার রহমত, মাজেদা। মিতা ভয়েই জ্ঞান হারিয়েছিল। চিন্তার কিছু নেই।'

মাজেদা বেগম নির্বাক হয়ে রইলেন। এক্স-রে রিপোর্টটা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন তারা। মিতা শুয়ে রইল বিছানায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা নিয়ে।

রশীদ চেয়ারম্যানের বউ খবরটা শুনে সন্ধ্যার দিকে আহাদ সাহেবের বাড়িতে এলেন।

'এইমাত্র শুনলাম খবরটা। আহা হা। আসতে না আসতেই কী একটা বালা মসিবত!'

'আগেই বলেছিলাম পাহাড় পর্বতের কাছে বাড়ি কিনে কাজ নেই, উনি শুনলেন না।'

'পাহাড় পর্বতের দোষ নয়, ভাবী, তবে বাড়িটা একটু দেখে শুনে কিনলেই হত।'

'এই বাড়িটা তো ভালই। একটু বেশি বড় অবশ্য।'

'রাতে একা বাইরে যাবেন না, ভাবী। উঠোনের গাছপালাগুলো অনেক পুরনো তো। সাবধান থাকা ভাল।'

'কেন?'

'না, পোয়াতী মেয়েদের একটু সাবধান থাকা ভাল।'

'ও,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন মাজেদা বেগম।

খারাপ কিছু শুনবেন ভেবেছিলেন। বাড়িটা তাঁর নিজেরই এখন আর ভাল লাগছে না। মিতার পা-টা ভাঙল এখানে আসার জন্যেই তো।

জ্বরের ঘোরে মাথা এপাশ ওপাশ করছে মিতা। চোখ মেলে তাকিয়ে আছে মায়ের মুখের দিকে। অপরিচিত আরেকজনকে দেখতে পেল পাশে। রশীদ চেয়ারম্যানের বউ।

'আমি চম্পার মা। কেমন আছ মিতা?'

উত্তর দিল না মিতা। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'জুলেখা কোথায়?'

'কাকে খুঁজছ?'

'জুলেখা। ওর পুতুলের নাম।'

কথাটা এখানেও ছড়িয়ে গেছে। 'মিতা আপনার পালিতা মেয়ে নাকি?' আস্ত পানটা গালে পুরে জিজ্ঞেস করলেন রশীদ গিন্নী।

'নিজের মেয়ের চেয়ে বেশি ভালবাসি আমরা ওকে,' বলেই হেসে ফেললেন মাজেদা বেগম। এ ব্যাপারে আর কিছু বলতে চান না।

'এই পুতুলটা কোথায় পেলেন?' প্রায় চমকে উঠলেন রশীদ গিন্নী। প্রাচীন চেহারার পুতুলটা এতক্ষণে চোখে পড়েছে তাঁর। টেবিলের ওপর নির্নিমেষ দাঁড়িয়ে আছে।

'আমার মেয়ে খুঁজে বের করেছে। দোতলায় দেয়াল আলমারির ভেতর ছিল।'

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না রশীদ গিন্নী। কাদের খানের

একমাত্র মেয়ে ফিরোজা দোতলায় ব্যালকনি থেকে পড়ে মারা যাবার পর তার বউ নিজে চুলোর আগুনে পুড়িয়ে ছাই করেছিলেন এটাকে।

ফিরে এসেছে পুতুলটা।

শিরশির করে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল মেরুদণ্ড দিয়ে। এরই নাম জুলেখা। নামটাও কেমন যেন। কোথায় যেন শুনেছেন আগে। আর দেরি করলেন না।

'আজ উঠি, ভাবী। কোনও চিন্তা করবেন না। মিতা ভাল হয়ে উঠলে আমার বাসায় বেড়াতে যাবেন কিন্তু।'

কার নিয়ে এসেছিলেন রশীদ গিন্নী। স্টার্ট দিচ্ছে ড্রাইভার গাড়িতে। সদর দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন তাকে মাজেদা বেগম।

রশীদ আহমেদ বাড়িতেই ছিলেন। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন তার স্ত্রী।

'ওগো শুনছ?'

'কী ব্যাপার, চম্পার মা?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ রশীদ সাহেব।

'কাদের সাহেবের মেয়েটা মারা যাবার সময় একটা পুতুল নিয়ে তাঁর বউ খুব হৈ চৈ করেছিলেন, তোমার মনে আছে?'

'না তো। কোন্ পুতুল?'

'ফিরোজা সারাদিন ওটা নিয়েই থাকত। শেষের দিকে বিড়বিড় করে নাকি আলাপও করত ওটার সাথে।'

'তো কী হয়েছে? বাচ্চা মেয়েরা এমন করতেই পারে।'

'আরে না। গভীর রাতে ওই পুতুল হাতে নাকি ছাদে ঘুরে বেড়াত ফিরোজা। ফরিদা ভাবীর ধারণা পুতুলটাই ধাক্কা মেরে তার মেয়েকে দোতলা থেকে ফেলে দিয়েছিল। ফিরোজা মারা যাবার পর চুলোর আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন উনি সেটাকে।'

'ব্যস, চুকে গেল।' মুচকি হাসি রশীদ সাহেবের ঠোঁটে।

'ওই পুতুলটা ফিরে এসেছে,' ফিসফিস করে বললেন রশীদ গিন্নী।

'তার মানে?' ভ্রূ কুঁচকে গেল রশীদ সাহেবের।

'এইমাত্র আমি নিজে দেখে এলাম। মিতার পড়ার টেবিলে সাজানো রয়েছে ওটা।'

'ওরকম পুতুল আরও থাকতে পারে।'

'না। দোতলায় দেয়াল আলমারির ভিতর পেয়েছে ওটাকে মিতা। তা ছাড়া অদ্ভুত একটা পুতুল। আমাদের দেশে এ রকম তৈরি হয় না।'

'আমি তো এর মধ্যে কোনও রহস্য দেখি না।'

'কী নাম রেখেছে জানো? জুলেখা।' তুরুপের তাসটি টেবিলের রাখলেন রশীদ গিন্নী।

'তাই নাকি?' এবার আর কণ্ঠে হালকা সুরটি নেই।

'আসতে না আসতেই পা ভাঙল মেয়েটা। দেখো আরও কত কী হয়।'

চুমকির কাজ করা শাড়ির মত লাগছে সমুদ্রকে। দুপুরের খর রোদ পড়ে ঝিকমিক করছে। কুসুমপুরের সবুজ প্রকৃতিতে যেন আনন্দের শিহরন জেগেছে।

সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটছে মিতা। পায়ের ব্যথাটা এখন আর নেই। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আর কখনও হাঁটতে পারবে কিনা জানে না সে। স্কুলে যেতে চায়নি ও। কিন্তু মাজেদা বেগম বুঝিয়ে সুজিয়ে পাঠিয়েছেন।

বিষণ্ণ হয়ে আছে মিতার চেহারা। ডাইনে দূরে তাকিয়ে দেখতে পেল গোরস্তানের পাশের আম বাগানে এককা দোককা খেলছে তিনটে মেয়ে। বিলুকে চিনতে পারল।

ও কি আর কোনওদিন ওদের মত দৌড়ঝাঁপ করতে পারবে?

স্কুলে অন্য মেয়েরা কীভাবে তাকাবে ওর দিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মিতা। পায়ে সামান্য ব্যথা লাগছে এখন। বাসায় ফিরে যাবে কি?

শিউলির চেহারাটা দেখতে পেল মনের পর্দায়। মন শক্ত করল মিতা। কারও সাথে কথা বলবে না সে। দরকার হলে একাই থাকবে। জুলেখার কথা মনে পড়ল। নিয়ে এলে ভাল হত না?

'কী, তোর পা সারেনি?' রূপালি আপা জিজ্ঞেস করলেন ক্লাশে।

'সেরেছে।'

'তো খুঁড়িয়ে হাঁটছিলি যে?'

অনেক কষ্টে স্বাভাবিকভাবে হাঁটবার চেষ্টা করেছে মিতা। পারেনি। চম্পা আর শিউলির দিকে তাকাল। ওরা আজ একসাথে বসেছে। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছে। ওর দিকে চেয়ে হাসল চম্পা।

মিতাও চেষ্টা করল হাসতে। কিন্তু পারল না। কান্না পাচ্ছে ওর। শেলীকে খুঁজল বার কয়েক। আসেনি ও।

টিফিনের সময় শিউলিকে ক্লাশ রুমের কোণায় স্কিপিং করতে দেখল মিতা। চম্পা এসে জিজ্ঞেস করল, 'স্কিপিং করতে পারবে? তা হলে এসো।'

মিতার খুব রাগ হলো। কোনও সন্দেহ নেই শিউলিই পাঠিয়েছে চম্পাকে ইচ্ছা করেই। ওকে অপমান করতে চায়।

'আমি খেলব না। তুমি খেলো গে।'

'পারলে তো খেলবে। তোমার তো পা খোঁড়া,' শিউলি বলল রুমের কোণ থেকে।

'খোঁড়া!' মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল মিতার। মনে হলো শিউলিকে খামচে রক্তাক্ত করে দিলে ওর ভাল লাগত।

অন্য আরেকটা মেয়ে বোধহয় উপরের ক্লাশের, ধমক দিল শিউলিকে। মিতা আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না সেখানে। অভিমানে, দুঃখে চোখে পানি এসে গেল। বইখাতা হাতে নিয়ে বাড়ির পথ ধরল।

সমুদ্রের ধার দিয়ে উঁচু রাস্তা। মিতা একা হাঁটছে। মার কথা মনে পড়ল। বার বার সাবধান করে দিয়েছেন মা। 'কিনার দিয়ে হাঁটবি না। সামনে ডাইনে বাঁয়ে দেখেশুনে চলবি।' চোখ ঝাপসা হয়ে এল আবার।

অস্বচ্ছ হয়ে গেল চারদিক। রোদের আলো তিরতির করে কাঁপতে কাঁপতে হারিয়ে গেল হঠাৎ। ঘন কুয়াশায় আটকা পড়ল মিতা।

এবার আর ভুল করল না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। একটা ছায়া নড়ে

উঠল ওর সামনে। ছোট একটা মেয়ে। কালো ফ্রক পরা। মাথায় কালো কাপড়ের কুঁচি দেয়া বনেট।

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল মিতা। দশ বারো বছরের একটা মেয়ে। ওর পাশে এসে দাঁড়াল। ইচ্ছে করলেই ছুঁতে পারে মিতা। ইচ্ছে করলেই।

দুর্বল একটা কণ্ঠ শোনা গেল। মিতার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। মনে হলো ওকে কেউ জোর করে ধরে রেখেছে। এখন ইচ্ছা করলেও আর হাঁটতে পারবে না ও।

'ওরা কেউ তোমাকে দেখতে পারে না।' ফিসফিস করল মেয়েটা। বাতাসে কাঁপছে শরীর। 'তুমি আমার বন্ধু হও। আমরা দুজনে বেড়াব। খেলব।'

ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল মিতার চোখে মুখে। পুরনো গন্ধটা আবার পাচ্ছে। কর্পূরের গন্ধ।

'কে তুমি?'

'তোমার বন্ধু।'

'কেউ আমার বন্ধু না। সবাই শিউলির মত,' বিড়বিড় করল মিতা।

'শিউলিকে আমি দেখে নেব। তোমাকে আর খোঁড়া বলার সাহস পাবে না,' হিস হিস করে উঠল কণ্ঠস্বর।

মিতার মনে হলো সে এখন স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে পারবে। শরীরটা হালকা লাগছে। বাড়ির দিকে রওনা হলো মিতা। সত্যিই সে হাঁটতে পারছে।

কুয়াশা কেটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। রোদের আলোর ঝলকানিতে মিতা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সমুদ্র, পাহাড়, গ্রাম সবকিছু।

টুনু খেলছে আম বাগানে। মিতার খুব ইচ্ছা করছে ওর সাথে দোলনায় দুলতে।

একটু আগে দেখা মেয়েটাকে হঠাৎ চিনে ফেলল মিতা। একেই দেখেছে সেদিন স্বপ্নে।

গোরস্তানের কাছাকাছি আসতেই আবার খুঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল মিতা। ভেতরে ঢোকার একটা অদম্য আগ্রহ বোধ করল। নিজের অজান্তেই হাঁটতে শুরু করল সেদিকে।

দোলনায় ঝোলা বন্ধ করে টুনু একদৃষ্টে চেয়ে দেখছে মিতাকে। গোরস্তানের দিকে কেন যাচ্ছে মেয়েটা?

সরু কাঁচা রাস্তার দুপাশে সারি সারি কবর। কেমন যেন নেশার মত লাগছে। সেই কবরটার সামনে এসে দাঁড়াল। দুহাত দিয়ে সরিয়ে দিল ঝোপঝাড়। ছোট্ট একটা নাম। জুলেখা। মিতা তাকিয়ে রইল সেদিকে। ওর পুতুলের নাম।

রান্নাঘরে অনেকক্ষণ বসে থেকে হাঁপিয়ে উঠলেন মাজেদা বেগম। খোলা বিশাল জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখা যায়। ডানদিকে দিগন্ত ভেদ করে উঠেছে সারি সারি পাহাড়।

বাতাস শির শির করে ঢুকছে রান্নাঘরে। মাজেদা বেগম উদাসভাবে তাকিয়ে রইলেন সমুদ্রের দিকে।

আরে! কে ওটা? চমকে উঠলেন মাজেদা বেগম। গোরস্তানের ভাঙা দেয়ালের ওপাশে ঝুঁকে পড়ে কিছু একটা খুঁজছে মিতা। কী করছে ওখানে?

স্কুলে যায়নি? অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল বুকটা। অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। একা একা ভর দুপুরবেলা গোরস্তানে কী করছে?

মিতা দাঁড়িয়েই আছে। নড়ছে না। মেয়েকে নিয়ে আসার জন্য নিজেই বাড়ি থেকে বের হয়ে এলেন তিনি। জোরে হাঁটতে লাগলেন। ভারী শরীর, হাঁসফাঁস করছেন ক্লান্তিতে। জোরে হাঁটার উত্তেজনায় বুক ধড়ফড় করছে। ঘাম ঝরছে শরীর বেয়ে।

প্রায় সাত মিনিট হেঁটে গোরস্তানের সামনে এসে পড়লেন মাজেদা বেগম। হাবুর মা বাড়িতে থাকলে তাঁকে এই কষ্টটা করতে হত না।

'এই মিতা, এখানে কী করছিস?'

মায়ের গলার আওয়াজ শুনে চমকে গেল মিতা।

'এমনি, আম্মু। জুলেখার কবর দেখছিলাম।'

'কার কবর?'

'জুলেখার।' হাত তুলে দেখাল মিতা।

'তোর কী মাথা খারাপ হয়েছে? স্কুলে যাসনি?'

'চলে এসেছি।'

'বাসায় চল্।' মেয়ের হাত ধরে টানলেন মাজেদা বেগম।

'জুলেখার কবরটা দেখবে না, মা?'

মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন মা। শান্ত সমাহিত মুখ। কী মনে করে ঝুঁকে পড়লেন হেডস্টোনটার দিকে। লেখাটা চোখে পড়ল। 'জুলেখা।' অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

পাশের কবরটার দিকে নজর গেল। সাদা সিমেন্টের ওপর কালো অক্ষরে লেখা।

'গুলবাহার বেগম।

পাপে মৃত্যু

১৮৭০ সাল।'

এটা কী ধরনের লেখা? এর মানে কী? কুসুমপুর এলাকাটাই যেন কেমন রহস্যে ঘেরা। চিন্তাগ্রস্ত মনে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেলেন মাজেদা বেগম। হঠাৎ তীব্র ব্যথায় অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ। কোমরের কাছটায় লক্ষ লক্ষ সূঁচ ফোটাচ্ছে কেউ।

মায়ের চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল মিতা। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন মাজেদা বেগম, 'জলদি দৌড়ে যা ফার্মেসীতে। তোর আব্বাকে খবর দে,' বলেই বসে পড়লেন মাটিতে।

সময় হয়ে গেছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড়াচ্ছে মিতা। পিছন থেকে আধাশোয়া অবস্থায় অসহায়ভাবে চেয়ে রইলেন মাজেদা বেগম।

শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে যাচ্ছে এইখানে। এই গোরস্তানে! হায় খোদা!

তুলতুলে পেঁজা তুলোর মত একটা শিশু। আহাদ সাহেব তাকিয়ে তাকিয়ে

দেখছেন। ঠিক মায়ের আদল পেয়েছে। চুমু দিলেন মেয়ের লালচে গালে। দাড়ির খোঁচায় কেঁদে উঠল অবোধ শিশু।

'আবার তুমি কাঁদাচ্ছ ওকে?' মাজেদা বেগম কৃত্রিম রোষে বললেন।

মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন আহাদ সাহেব বাচ্চাটাকে। কান্না থামবার কোনও লক্ষণ নেই পিচ্চিটার।

'মিতা কোথায়?'

'কী জানি। সকাল থেকেই তো দেখছি না ওকে। স্কুলেও গেল না আজকে।'

মিতাকে পাওয়া গেল তার ঘরে। জুলেখাকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে।

উদ্বিগ্ন হলেন আহাদ সাহেব। এই সময় কখনও ঘুমায় না মেয়েটা। অসুখ করেনি তো!

চোখের কোনা সামান্য চকচক করছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল তাঁর। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে মিতা।

সকাল থেকে একটু দূরে দূরে ছিল মিতা। ব্যাপারটা মাজেদা বেগমকে বলতেই উত্তর দিলেন, 'তোমাকে আগেই বলেছি, মিতার ব্যাপারে একটু কেয়ারফুল থাকা দরকার। কোনওভাবেই ও যাতে মনে না করে যে ওকে আমরা অবহেলা করছি।'

'আমি তো খুব কেয়ারফুলই থাকি।'

'সকাল থেকে একবারও মিতার সাথে কথা বলেছ তুমি?'

আমতা আমতা করলেন আহাদ সাহেব। সত্যিই খেয়াল করেননি ব্যাপারটা।

উঠোনের কোনায় একটা ছোট ঘর। লাল ইঁটের তৈরি। টালির ছাদ। দেখলেই বোঝা যায় বহুকাল ব্যবহার করা হয়নি ওটা।

হাবুর মা সকাল থেকেই পরিষ্কার করছিল ঘরটা। মাকড়সা, তেলাপোকা আর ইঁদুরের মচ্ছব ভিতরে। ধুলায়, ময়লায় কাশতে কাশতে হার্টফেল হবার দশা বুড়ির।

ভেতরটা খারাপ নয়। অদ্ভুত কিছু জিনিস পাওয়া গেল সেখানে। কয়েকটা পেইন্টেড আর কয়েকটা খালি ক্যানভাস। ছবি আঁকত চৌধুরীদের কেউ।

মেঝেটা দেখে অবাক হলেন মাজেদা বেগম। পুরোটাই মোজাইক করা। জবরজং ছোট্ট ঘরটার এত সুন্দর মেঝে ভাবাই যায় না।

ঝেড়েমুছে ঝকঝকে করে ফেলল রুমটা হাবুর মা। চিমসে বুড়িটার গায়ে শক্তি আছে বটে। কালো একটা লম্বা দাগ কিছুতেই উঠছে না। প্রায় দেড় ফুট লম্বা বিচিত্র ধরনের একটা দাগ।

কিছু একটা পড়েছিল মেঝেয়। এখনও উঁচু হয়ে আছে। কীসের দাগ?

হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলেন মাজেদা বেগম। কোনও সন্দেহ নেই।

রক্তের দাগ।

এখানে রক্তের দাগ কেন? দ্রুত হেঁটে গিয়ে আহাদ সাহেবকে ডেকে নিয়ে এলেন তিনি।

'এই দেখ, এটা কীসের দাগ? কিছুতেই উঠছে না।'

'কত কিছুর দাগ হতে পারে। কী করে বলি।'

'আমার মনে হয় রক্তের দাগ,' ফিসফিস করে বললেন মাজেদা বেগম।

'এরকম মনে হলো কেন তোমার?'

'এই বাড়িটায় ভূতুড়ে কিছু একটা আছে। পুরনো জমিদারবাড়ি। এখানে রক্তের দাগ থাকতেই পারে।'

আহাদ সাহেবের গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন মাজেদা বেগম।

'খুঁচিয়ে তুলে ফেলো দাগটা, হাবুর মা। দা, ছুরি কিছু একটা দিয়ে খোঁচাও।' বললেন আহাদ সাহেব।

স্কুলে আবার শিউলির সাথে ঝগড়া হয়ে গেল মিতার। সবার আগে এসে সামনে বসেছিল মিতা। লাল সুটকেসটা রেখে বাইরে গিয়েছিল।

দশ মিনিট পরে এসে দেখল আগের জায়গায় নেই সুটকেসটা। কেউ ওটাকে দ্বিতীয় বেঞ্চে নিয়ে রেখেছে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল মিতার।

শিউলির কথাই মনে পড়ল প্রথম। তাই হবে। ওর ব্যাগটা রয়েছে সামনের বেঞ্চে।

'আমার সুটকেস সরিয়েছ কেন?'

'আমার বয়েই গেছে তোমার সুটকেস ধরতে,' ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল শিউলি।

'আমি সরিয়েছি ওটা, মিতা। আমরা একসঙ্গে বসব।' পিছন থেকে বলল শেলী।

'আন্দাজী কথা বলো কেন তুমি? আমি আপাকে বলে দেব।' খেপে উঠল শিউলি।

'বলো গে!'

'বলবই তো। বেশি ডাঁট হয়েছে না? ল্যাংড়া মেয়ের এত ডাঁট ভাল না,' খোঁচা দেবার জন্যেই বলল শিউলি।

কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল মিতার। আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না সে। অস্পষ্ট কয়েকটা কথা কানে গেল।

'ঢং কত, ধাড়ি মেয়ে পুতুল নিয়ে স্কুলে আসে।'

মিতাকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল শেলী। ইচ্ছা করছিল খামচে রক্তাক্ত করে দেয় শিউলির মুখচোখ।

টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা পানি পড়ল মিতার চোখ বেয়ে।

'শিউলিটা না ভারি পাজি। তুমি কিছু মনে কোরো না, কেমন?' সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল শেলী।

'কেন, ওর কী দোষ? না জেনে শিউলিকে বলতে গেল কেন মিতা?' পেছন থেকে বলল আরেকটা মেয়ে।

রাগে দুঃখে স্কুল থেকে বেরিয়ে এল মিতা। পায়ের ব্যথাটা বাড়ছে দ্রুত। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। সুটকেসটাও ভারী মনে হচ্ছে খুব।

জুলেখার দিকে চোখ পড়ল মিতার। দুধ সাদা চোখ দুটো ভাবলেশহীন চেয়ে আছে। মনে হচ্ছে খুব দুঃখ পেয়েছে সেও।

সমুদ্রের ধারে আসতেই বাতাসের ঠাণ্ডা ছোঁয়া লাগল শরীরে। হঠাৎ কেঁপে উঠল সূর্যের আলো। দেখতে দেখতে ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেল চারপাশ।

বাতাসে ভাসছে সেই পুরনো গন্ধ।

কালো ফ্রক পরা ছায়াটাকে আবার দেখতে পেল মিতা। বাতাসে তির তির কাঁপছে।

'বাড়ি যেও না, মিতা। বসে থাকো ওই গাছের আড়ালে।' আদেশের সুরে বলল মেয়েটা।

জুলেখাকে আরও জোরে বুকের সাথে চেপে ধরল মিতা। পায়ের ব্যথাটা একদম সেরে গেছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত কাজ করল সে। হেঁটে গিয়ে বিশাল বটগাছটার আড়ালে শিকড়ের ওপর বসে রইল।

ঘন কুয়াশার চাদর ঢেকে দিয়েছে সব কিছু। ঘুম পাচ্ছে এখন ওর। মিনিট, ঘণ্টা কীভাবে যাচ্ছে বুঝতে পারছে না কিছু। ঘোর লেগে গেছে।

কালো বনেট পরা ছায়াটাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

হঠাৎ দূরে হাসির শব্দ শোনা গেল। বারো-তেরো বছরের কয়েকটা মেয়ে হাসছে। আসছে এদিকে।

কান খাড়া করে রইল মিতা। পরিচিত কণ্ঠটা শুনতেই রাগে হাত গা জ্বলতে লাগল ওর, ফ্রক পরা ছায়াটাকেও দেখা গেল হঠাৎ।

কোনও কিছু বোঝার আগেই পা টিপে টিপে উঠে এল মিতা। হিস হিস করে উঠল একটা মিহি কণ্ঠ, 'আসছে। এইই সুযোগ।'

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল মিতা। চুম্বকের মত টানছে ওকে ফ্রক পরা মেয়েটা।

'আমি তোমার বন্ধু। ওরা তোমাকে ভালবাসে না। এসো আমার সঙ্গে।'

দুই দিকে বেণী ঝোলানো একটা মেয়েকে আবছা মত দেখতে পেল মিতা। কাঁধে ঝুলছে দামী স্কুল ব্যাগ। একা।

কেমন সতর্ক পায়ে এগুচ্ছে মেয়েটা। এখনও ওর মুখোমুখি যায়নি মিতা।

সমুদ্রের ধার দিয়ে উঁচু ঢাল। প্রায় পঁচিশ তিরিশ ফুট নীচে চিকচিক করছে বালু আর পাথর। ঢালের ওপর দিয়ে হাঁটছে মেয়েটা।

মিতাকে দেখেই চমকে উঠল। দু'হাতে বিদ্যুৎ খেলে গেল মিতার। নিজেও চমকে উঠল সে।

এত শক্তি সে পেল কোথায়? ওর আর মেয়েটার মাঝখানে কালো ফ্রক পরা ছায়াটাকে মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল মিতা। সাদা চোখ দুটো পাথরের মত নিষ্প্রাণ।

মুহূর্তের মধ্যে কেটে গেল কুয়াশার মেঘ। ঝলমল করে উঠল রোদেলা দুপুর। বিশাল ঢালের ওপর একা দাঁড়িয়ে আছে মিতা।

পায়ে ভীষণ ব্যথা। কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠল। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা। সুটকেস হাতে নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো সে।

যে কোনও মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে পারে। খুব দুর্বল লাগছে।

এদিকে বোবা বিলু তখন আতঙ্কিত চোখে চেয়ে আছে মিতার দিকে। কয়েকশো গজ দূরে আমবাগানে খেলতে খেলতে খুব খারাপ কিছু একটা দেখেছে

সে। খুব খারাপ।

স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরছিলেন হাশেম সাহেব। সমুদ্রের পাশে পাশে অনেকদূরে যেতে হয় তাঁকে। সাইকেল চেপেই যাতায়াত করেন প্রতিদিন। শাহবাজপুর প্রায় আড়াই মাইল দূরে এখান থেকে।

রোদ এখনও চড়া। ঘামে ভিজে উঠছে সার্ট। কুসুমপুর জামে মসজিদের গম্বুজে ঠিকরে পড়ছে রোদ। খুব ধীরে প্যাডেল করছেন হাশেম সাহেব।

সামনে বড় একটা বাঁক। বাঁকের মাথায় বুড়ো বটগাছটা ঝিরঝির বাতাস ছাড়ছে। নীচে ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচছে সমুদ্র।

আরে! কী ওটা?

জোরে প্যাডেল করে কাছে চলে এলেন হাশেম সাহেব। ভাল করে দেখে চমকে উঠলেন ভীষণভাবে।

ত্রিশ হাত নীচে বড় পাথরগুলোর মাঝখানে চার হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে কাজেম সওদাগরের ছোট মেয়ে শিউলি।

জোয়ারের পানি প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে ওর পা। দেখলেই বোঝা যায় প্রাণহীন দেহটা অনুভব করতে পারছে না কিছুই। তাড়াতাড়ি সাইকেল থেকে নেমে ঢালের নীচের দিকে রওনা হলেন হাশেম সাহেব।

আর দশ মিনিট দেরি হলে পানিতে ভেসে যাবে লাশটা। তার আগেই তুলে আনতে হবে ওকে। পরে খবর দেয়া যাবে লোকজনকে।

জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে মিতা। ডাক্তার বলেছেন চিন্তার কিছু নেই। কড়া রোদে অনেকক্ষণ বসেছিল বোধ হয়। তাই জ্বর উঠেছে।

বিলুর কাছ থেকে জানতে পেরেছেন মাজেদা বেগম দুপুরের রোদে সমুদ্রের ধারে বটগাছের কাছে বসেছিল মিতা। আরও কী কী যেন বলতে চাইছিল মেয়েটা। তিনি বুঝতে পারেননি।

মাথায় জলপট্টি দিচ্ছেন মাজেদা বেগম। বিড়বিড় করে জুলেখার নাম বলছে মিতা। 'ওই পুতুলটাই যত নষ্টের মূল,' মনে মনে বললেন তিনি।

রশীদ চেয়ারম্যানের বউ অনেকভাবে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বিলুর কথা বুঝতে পারছেন না কিছুতেই। বোবা মেয়েটা হাত নেড়ে মুখের বিচিত্র ভঙ্গি করে কিছু একটা বলতে চাইছে।

শুধু বুঝতে পারলেন শিউলির মৃত্যুর সাথে মিতার একটা সম্পর্ক আছে।

কী সেটা?

সকালবেলা উঠোনের ধার ঘেঁষে লাগানো ফুলের চারাগুলোতে পানি দিচ্ছিলেন মাজেদা বেগম। মৌসুমী ফুলের চাষ করা তাঁর পুরনো অভ্যাস।

টালির ঘরটাকে স্টোর রুম হিসাবে ব্যবহারের ইচ্ছা আছে তাঁর। টুকিটাকি জিনিসপত্র রাখা যাবে ওখানটায়।

দরোজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন মাজেদা বেগম। ঝকঝক করছে ঘর।

মেঝের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেলেন। মেরুদণ্ড বেয়ে বয়ে গেল ঠাণ্ডা একটা স্রোত।

লম্বা কালচে দাগটা তেমনি আছে।

দৌড়ে বেরিয়ে এলেন মুহূর্তে। সমস্ত শরীর কাঁপছে।

স্পষ্ট মনে আছে গতকাল খুন্তা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পুরো দাগটা তুলে ফেলেছিল হাবুর মা।

তখনও ফার্মেসীতে যাননি আহাদ সাহেব। সব শুনে থ হয়ে গেলেন। নিজে এসে দেখলেন বিদঘুটে দাগটা। কোনও কথা সরল না মুখে।

'এই ঘরটা ব্যবহার না করাই ভাল। বন্ধ করে রাখো এটা। দরকার নেই স্টোর রুম।'

এই বাড়িটায় যে অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে এতদিন পর সেটা স্বীকার করলেন আহাদ সাহেব।

আরও খোঁজ-খবর নিয়ে কেনা উচিত ছিল বাড়িটা।

স্কুলে মিতাকে এড়িয়ে চলতে লাগল ওরা। একমাত্র শেলি ছাড়া ওর আর কোনও বন্ধু নেই। চম্পা ওকে দেখলেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যায়।

কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে ভেতরে ভেতরে। মিতার পুতুলটার কথাও জানে ওরা। হেডমাস্টারকে সব কথা খুলে বলেছেন আহাদ সাহেব।

'হয় এ রকম। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। আশ্বাস দিয়েছেন উনি।'

পিছনের বেঞ্চে চুপচাপ বসে থাকে মিতা। কখনও খেলতে যায় না। শেলির সাথে কথা বলে মাঝে মাঝে।

শুক্রবার সকালে হাঁটতে হাঁটতে আমবাগানের কাছে চলে এল মিতা। খুব অস্থির লাগছে ওর। জুলেখার সাথে কথা বলেছে রাতে।

ঘুমুতে যাবার পরপরই একটু শীত শীত লাগছিল ওর। বাতাসে একটা গন্ধ ভেসে এল হঠাৎ। টেবিলের ওপর রাখা জুলেখার দিকে চাইল মিতা।

ভুল দেখল কী?

আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে ওটা। এক সময় হাওয়ায় ভাসতে লাগল যেন।

বিছানায় সেঁটে গেল মিতা। মেঝেতে নাক ডাকাচ্ছে হাবুর মা। মিহি একটা অস্পষ্ট স্বর শোনা গেল।

'তোমাকে খুব পছন্দ করি আমি। কিন্তু তোমার আব্বু-আম্মু তোমাকে ভালবাসে না।'

প্রতিবাদ করতে চাইল মিতা। কিন্তু গলায় জোর পেল না।

'তুমি ওদের মেয়ে নও, রীতা ওদের মেয়ে। রীতাকে আদর করে ওরা। ও থাকলে তোমাকে কেউ ভালবাসবে না।'

একঘেয়ে সুরে বলে যাচ্ছে কেউ।

'কই উঠে পড়ো। এখনই সময়।'

চিন্তা করবার শক্তি হারিয়ে ফেলল মিতা। স্বপ্ন দেখছে বলে মনে হলো।

হঠাৎ পাশের রুম থেকে কেঁদে উঠল রীতা। অবুঝ শিশুর আতঙ্কিত কান্না।

মাঝখানের দরোজা খোলাই ছিল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল মিতা। কখন যে বিছানা থেকে উঠে পড়েছে খেয়াল নেই। রীতার বিছানার কাছে চলে এল নিঃশব্দে।

আহাদ সাহেব, মাজেদা বেগম কেউ নেই। এখনও শুতে আসেননি ওঁরা।

ড্রয়িং রুমে রয়েছেন।

ছোট্ট মশারীটা গুটিয়ে তুলতুলে ফর্সা শিশুটিকে কোলে তুলে নিল মিতা। আরও জোরে কাঁদতে শুরু করল রীতা। বুকের সাথে জোরে ঠেসে ধরল ওকে।

ইস কী সুন্দর। গালে একটা চুমো দিল মিতা। কিন্তু নিজের হাত দুটোকে কিছুতেই সামলে রাখতে পারছে না ও, আরও জোরে পিচ্চিটাকে ঠেসে ধরল দুহাত দিয়ে।

কর্পূরের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে এ ঘরেও। ভয় পেল মিতা। নীল হয়ে উঠেছে বাচ্চাটার ফর্সা মুখ। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। হাত থেকে ছেড়ে দিতে চেষ্টা করল ওকে। কিন্তু পারছে না।

প্রাণপণে চেঁচাতে গিয়ে খুক খুক কাশছে রীতা।

'কী রে মিতা কী হয়েছে।' তীক্ষ্ণ গলা মাজেদা বেগমের। কান্নার শব্দে উঠে এসেছেন ওপরে।

'কাঁদছে মা। রীতা কাঁদছে।' ঘোর কেটে গেছে মিতার।

'আমাকে ডাকিসনি কেন! দেখি দেখি। ইস। এত ঠেসে ধরে কোলে নেয় কেউ। আরেকটু হলেই তো দম বন্ধ হয়ে যেত,' কড়া গলায় ধমক দিলেন মাজেদা বেগম। রীতাকে কোলে নিয়ে আদর করছেন। 'শুয়ে পড়গে যা।'

চোখে জল এসে গেল মিতার। অভিমানে কোনও কথা বলল না। চুপচাপ এসে শুয়ে রইল বিছানায়। রাতে আবার সেই স্বপ্নটা দেখল।

কালো ফ্রক পরা একটা অন্ধ মেয়েকে সবাই মিলে খেপিয়ে, খুঁচিয়ে উত্যক্ত করে তুলছে। শেষ পর্যন্ত উঁচু ঢাল থেকে নীচে পড়ে গেল অসহায় মেয়েটা।

ছোট্ট মেয়েটার চোখে মুখে কী অসহ্য বেদনা, ক্রোধ আর প্রতিহিংসার আগুন। ঢাল বেয়ে উঠে আসছে সে অদ্ভুত ভঙ্গিতে। সাদা দৃষ্টিহীন চোখ জুড়ে প্রচণ্ড আক্রোশ।

ঘামে বালিশ ভিজে গেল মিতার। শরীরটা অল্প অল্প কাঁপছে। মার কাছে গিয়ে শুতে ইচ্ছে করল খুব। কিন্তু রীতা আছে ওখানে। অন্ধকারে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল মিতা।

'শুনছ, মিতার ভাবসাব খুব একটা ভাল মনে হচ্ছে না।'

'কী করেছে।'

'একটু আগে রীতার কান্না শুনে ওপরে উঠে দেখি ওকে ধরে চাপ দিচ্ছে মিতা। দম প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নীল হয়ে গিয়েছিল চেহারা। আমি সময়মত না গেলে হয়তো মরেই যেত।'

'কী যা তা বলছ?' উষ্মা প্রকাশ করলেন আহাদ সাহেব।

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় কিছু একটা আছে ওর সঙ্গে। কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে হাসি খুশি মেয়েটা।'

'ওসব কিছু না। পা টা নরমাল হচ্ছে না বলে খুব আপসেট হয়ে আছে ও।'

'ঢাকায় নিয়ে দেখানো দরকার। মেয়েমানুষ। আল্লা না করুক কিছু একটা হয়ে গেলে, তখন?' মাজেদা বেগমের গলা দুশ্চিন্তায় কেঁপে উঠল।

'প্রফেসর শরীফকে দেখিয়েছি না? উনি তো বললেন আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।'

দোলনায় দুলছিল বিলু। পেছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে টুনু। সুন্দর ছেলেটাকে দেখে ওর দিকে এগিয়ে গেল মিতা। এই ছেলেটা খুব ভাল। কী সুন্দর করে হাসে।

'তুমি খেলবে?' আগ্রহের সঙ্গে বলল টুনু।

'হ্যাঁ।' ঘাড় কাত করল মিতা।

মিতাকে দোলনার দিকে আসতে দেখে নেমে পড়ল বিলু। মিতা ধাক্কা দিক এটা চায় না সে। শিউলি মারা যাবার সময় ঢালের ওপরে ওর সাথে মিতাকেও দেখেছে সে। ঠিক বুঝতে পারেনি কী ব্যাপার। কিন্তু হঠাৎ করে দেখল আচমকা ঢালের ওপর থেকে নেই হয়ে গেছে শিউলি।

কিন্তু টুনু নাছোড়বান্দা। মিতাকে খেলতে নেবেই সে। বেশ কয়েকবার ওকে দোলনায় তুলে ধাক্কা দিল টুনু। খুব ভাল লাগছে।

এবার উঠল বিলু। দুজনে মিলে খুব জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে। প্রায় সাত-আট ফিট উঠে যাচ্ছে দোলনা। খিল খিল করে হাসছে বোবা মেয়েটা।

এখন থামা দরকার। দম হারিয়ে ফেলেছে সে। কিন্তু থামছে না মিতা। ব্যা ব্যা করে কিছু একটা বলল বিলু। বুঝতে পারছে না মিতা। আরও জোরে ধাক্কা দিল এবার।

ভয় পাচ্ছে বিলু। প্রায় দশ-এগারো ফিট উঠে আসছে দোলনা। আর্তনাদ করছে সে। কিন্তু কিছুতেই থামছে না মিতা।

মিতার চারপাশে তখন ঘোর কুয়াশা। কানের কাছে ফিসফিস করে বলছে কেউ, 'এই মেয়েটা তোমার শত্রু। তোমাকে খেলায় নিতে চায়নি। তোমাকে পছন্দ করে না। এই সুযোগ।'

নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারছে না মিতা। সবাই তার শত্রু, শুধু জুলেখা তার একমাত্র বন্ধু। 'কোথায় তুমি জুলেখা।'

'এই যে আমি। তোমার পিছনে।'

হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে এক ধাক্কা মারল মিতা। প্রায় চোদ্দ ফুট উপরে উঠে গেল বিলু। হাত থেকে ছুটে গেল মোটা দড়ি।

হাওয়ায় উড়ে এল যেন মেয়েটা। মাথাটা আগে পড়ল শক্ত মাটিতে। ধড়াস করে পুরো শরীরটা বাড়ি খেল প্রচণ্ড ভাবে।

প্রাণঘাতী আর্তনাদ করে উঠল বিলু। ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল টুনু। হাত-পা মাটিতে ছড়িয়ে নিথর হয়ে গেল বোবা মেয়েটা।

তখনও অনবরত দুলছে দোলনাটা। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিতা। বিলুর নাক দিয়ে দু ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল। পায়ের ব্যথাটা আবার বাড়ছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দৌড়াতে লাগল মিতা। চোখ দিয়ে অনবরত জল গড়াচ্ছে।

মিতার কাছে খবর পেয়েই সবাই জানতে পারল কী ঘটেছে। টুনু একটানা কাঁদছে তো কাঁদছেই। মিতাকে দেখাচ্ছে আর বলছে, 'ধাক্কা দিছে এ্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ।'

গলা শুকিয়ে গেল মিতার। কোনওমতে ওকে বাসায় নিয়ে এলেন আহাদ সাহেব। বিলুর মায়ের গালাগালি আর আহাজারিতে পাগল হবার দশা তার।

সবাই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে মিতার দিকে। রশীদ চেয়ারম্যান বলেই ফেললেন, 'মেয়েটাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিন, আহাদ সাহেব। এখানে থাকাটা ওর নিজের জন্যেই খারাপ হবে।'

মাজেদা বেগম এই প্রথম মারলেন মেয়েকে। চড় খেয়ে কোনও কথা বলল না মিতা। কাঁদল না পর্যন্ত। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

চুপে চুপে নিজের ঘরে এল সে। সেই কর্পূরের গন্ধটা নাকে এল। হিসহিস করে উঠল পরিচিত কণ্ঠ। 'আমি ছাড়া আর কেউ তোমার বন্ধু নয়। শত বছর ধরে তোমার অপেক্ষায় ছিলাম আমি।'

'তুমিও আমার বন্ধু নও। তুমি আমার ক্ষতি করতে চাও,' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল মিতা।

'না-না।' আর্তনাদ করে উঠল কণ্ঠটা। 'তোমার চোখেই আমি দেখছি সব। কাউকে আমি ছাড়ব না।'

'কী চাও তুমি?' কান্না কান্না সুরে বলল মিতা।

'আমার মায়ের কী হয়েছিল দেখতে চাই। দেখাও আমাকে।'

'কী দেখাব?'

'উঠানে চলো, ওঠো।'

দরোজার খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে এল মিতা। খালি পায়ে নিঃশব্দে হাঁটছে। বুকে শক্ত করে ধরে রেখেছে জুলেখাকে। উঠানে নেমে স্টোররুমের কাছে এল মিতা।

'ভেতরে ঢোকো।'

'কী করে ঢুকব? তালা দেয়া যে।' অসহায় শোনাল ওর গলা।

'ভাঙো তালা। ভাঙো,' কর্কশ শোনাচ্ছে কণ্ঠ।

ছোট্ট টিপ তালাটায় প্রচণ্ড জোরে চাপ দিল মিতা। কখন যে কেটে গেছে নরম হাত বুঝতেও পারল না। কিন্তু খুলে গেল তালা।

উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সব। কাঁচের জানালা দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে আলো। অদ্ভুত আলো আঁধারির খেলা ঘরটাতে। এক কোনায় কিছু জিনিসপত্র স্তূপ করা। 'দেখো কী হচ্ছে এখানে। দেখো। বলো আমাকে।' প্রাচীন, খসখসে গলায় বলল সে।

এতক্ষণে কালো ফ্রক পরা মেয়েটাকে দেখতে পেল মিতা। দাঁড়িয়ে আছে ওর পাশেই। কড়া গন্ধে ভরে গেল ঘরটা।

মিতার চোখের সামনে ধোঁয়াটে আবছায়া। মনে হচ্ছে কোনও এক অজানা পরিবেশে দাঁড়িয়ে আছে সে।

কয়েকবার কেঁপে উঠল ওর সামনের কুয়াশার চাদর। স্পষ্ট দেখতে পেল সে খুব সুন্দর চেহারার একটা মেয়ে শুয়ে আছে দামী চাদরে ঢাকা বিছানায়। অদ্ভুত মায়াবী হাসি ওর মুখে।

পাশেই বসে আছে লম্বা একহারা একটা লোক। পুরু গোঁফ আর ঝাঁকড়া চুল লোকটার। সালোয়ার কামিজ পরা মেয়েটার মাথা হাঁটুর ওপর নিয়ে বসে আছে সে। মাথাটা ঝুঁকিয়ে কিছু একটা বলছে।

'বলো কী দেখছ। বলো আমাকে,' তীব্র কঠিন কণ্ঠে বলল কালো ফ্রক পরা মেয়েটা।

হুবহু বর্ণনা করল মিতা যা দেখছে তাই। এবার হাসছে ওরা। পকেট থেকে দামী একটা নেকলেস বের করল লোকটা। খুব যত্ন করে পরিয়ে দিল মেয়েটার গলায়। চোখে চোখে তাকিয়ে হাসল ওরা।

এই পর্যন্ত শুনেই করুণ, তীক্ষ্ণ স্বরে বলল কালো ফ্রক পরা মেয়েটা, 'হায় হায়। আমাকে যারা খেলাচ্ছিল, ওরা তা হলে মিথ্যে বলেনি!'

হিংস্র দেখাচ্ছে কালো ফ্রক পরা মেয়েটাকে। ঘৃণায়, কষ্টে বিকৃত হয়ে গেছে ওর মুখ। হঠাৎ চমকে উঠল গোঁফঅলা লোকটা।

দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়েছে আরেকজন লোক। জমিদারী কেতায় শেরওয়ানী পরে আছে। দু চোখ ঠিকরে আগুন বেরোচ্ছে ওর। দাঁতে দাঁত চাপছে রাগে।

আচমকা বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে এক প্রচণ্ড ধাক্কায় শেরওয়ানী পরা লোকটাকে ঘরের কোনায় পাঠিয়ে দিল গোঁফঅলা। তারপর এক দৌড়ে বাইরে চলে গেল।

সেদিকে ফিরেও তাকাল না নতুন লোকটা। তার হাতে ততক্ষণে চলে এসেছে লম্বা একটা ছুরি। দুপা সামনে এগিয়ে এল সে।

ভয়ে, আতঙ্কে বিছানার সাথে কুঁকড়ে গেছে মেয়েটা। করুণ সুরে মিনতি করছে।

ম্লান আলোয় ভরে গেছে ঘর। নির্মমভাবে পুরো ছুরিটা খ্যাচ করে মেয়েটার বুকে বসিয়ে দিল লোকটা। রক্ত পানি করা স্বরে আর্তনাদ করে উঠল মেয়েটা। আর্তনাদ করে উঠল মিতাও। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বিছানা, মেঝে। দুহাতে চোখ ঢাকল সাথে সাথে।

মিলিয়ে যাবার আগে কঠোর কণ্ঠে বলল কালো ফ্রক পরা মেয়েটা, 'উচিত শিক্ষা হয়েছে তোমার গুল বাহার বেগম!'

ঘোর কেটে গেল মিতার। নিজেকে আবিষ্কার করল সে উঠোনের ছোট্ট ঘরের ভেতর একা। সারা শরীর কাঁপছে উত্তেজনায়।

একটা আর্তচিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল মাজেদা বেগমের। কী ব্যাপার? চোর ডাকাত? নাকি অন্য কিছু? স্বামীকে ডেকে তুললেন তিনি। দরোজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন কী ব্যাপার জানতে। উঠানের দিক থেকেই এসেছে চিৎকারটা।

এদিক ওদিক কিছুক্ষণ তাকিয়েই ছোট্ট ঘরটার দিকে দৃষ্টি গেল মাজেদা বেগমের। দরোজা খোলা কেন? 'এই দেখছ? ওই ঘরের দরজা খোলা কেন?'

'চোর নাকি?' ফিসফিস করে বললেন আহাদ সাহেব।

হঠাৎ একটা হার্টবিট মিস হয়ে গেল তাঁর। মাজেদা বেগমেরও রক্ত হিম হয়ে গেল ভয়ে।

খোলা ঘরের ভেতর থেকে জুলেখাকে কোলে নিয়ে সন্তর্পণে হেঁটে বেরিয়ে আসছে মিতা।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন আহাদ সাহেব। হাতের টর্চটার কথা মনে পড়ল তাঁর। সরাসরি মেয়ের মুখের উপর ফেললেন আলো।

'ওখানে কী করছ, মা? এত রাতে?'

চমকে বারান্দার দিকে চাইল মিতা। ভিড়মি খাবার যোগাড় হলো আহাদ সাহেবের। সারামুখে রক্তের দাগ মিতার।

'ও মাগো।' বলেই জ্ঞান হারালেন মাজেদা বেগম। খপ করে পড়ন্ত শরীরটাকে ধরে ফেললেন আহাদ সাহেব। আস্তে করে শুইয়ে দিলেন বারান্দার ওপর।

মিতা উঠে আসছে ওপরে। সিঁড়িতে হালকা পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

বাড়িটা ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন আহাদ সাহেব। এখানে থাকলে মাজেদা বেগম হয়তো পাগল হয়ে যাবেন। মিতাকেও হারাতে হতে পারে।

এরিমধ্যে সবার আতঙ্কের বস্তুতে পরিণত হয়েছে মেয়েটা। স্কুলে যাওয়া বন্ধ। কেউ খেলতে চায় না ওর সাথে। মাথা খারাপ হতে দেরি নেই ওরও।

ওদিকে রশীদ গিন্নী বাড়ি বাড়ি বলে বেড়াচ্ছেন মিতা ইচ্ছা করেই বিলুকে মেরে ফেলেছে। শিউলিকেও ওই ফেলে দিয়েছে ঢাল থেকে।

এখানে আর না। কেউ বাড়িটা না কিনলে এটাকে ফেলে রেখেই চলে যাবেন কুসুমপুর ছেড়ে।

মিতাকে আলাদা ঘরে শুতে দিলেন না মাজেদা বেগম। জুলেখাকেও আনতে দিলেন না এ ঘরে। বড় খাটের ওপর ঠাসাঠাসি করে শুয়ে রইলেন সবাই মিলে।

বেহুঁশ হয়ে ঘুমাচ্ছে মিতা। সুন্দর মুখটা ক্লান্ত লাগছে। এই ক'মাসে অনেক শুকিয়ে গেছে মিতা। সত্যিই খুব কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা।

আহাদ সাহেবের বুকে মমতা উথলে উঠল। মিতার মুখটা একটু একটু নড়ছে। হঠাৎ চোখ খুলে চাইল সে। কিন্তু আহাদ সাহেবকে দেখতে পেল বলে মনে হলো না।

বিছানা থেকে আলতো ভাবে নেমে পড়ল মিতা। কাঠ হয়ে শুয়ে রইলেন আহাদ সাহেব।

কোথায় যাচ্ছে মেয়েটা? সতর্কভাবে রুমের বাইরে বেরিয়ে এল মিতা। চুপি চুপি হাঁটছে নিজের ঘরের দিকে।

ঘরে ঢুকে জুলেখাকে হাতে নিল সে। কান খাড়া করে রইলেন আহাদ সাহেব। নিজেও সন্তর্পণে উঠে এসেছেন।

মিতার দুর্বল গলা শোনা গেল, 'তুমি চলে যাও। তোমার জন্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

চমকে উঠলেন আহাদ সাহেব। কী বলছে মেয়েটা? হঠাৎ দ্বিতীয় আরেকটা কণ্ঠ শুনে ঘাবড়ে গেলেন তিনি।

'যাব না আমি। কিছুতেই না। সব কিছু দেখতে চাই আমি।'

'তুমি চলে যাও। দোহাই তোমার।'

'কিছুতেই না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোমাকেও ছাড়ব না,' হিংস্রভাবে হিস হিস করে উঠল মিহিকণ্ঠটা।

ধাক্কা দিয়ে দরোজা খুলে মিতার রুমে ঢুকে পড়লেন আহাদ সাহেব।

মেঝেতে জুলেখাকে রেখে তার সামনে স্থির বসে আছে মিতা। পাতলা ঠোঁট দুটো রাগে, হতাশায় মৃদু কাঁপছে।

ঘরে আর কেউ নেই।

'কার সঙ্গে কথা বলছ?'

চমকে উঠল মিতা। বাপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জুলেখার সঙ্গে।'

মেয়েকে আদর করে বুকে টেনে নিলেন আহাদ সাহেব। হয়তো ভুল শুনেছেন। 'জুলেখা একটা পুতুল, মা। এত রাতে ওর সাথে কথা না বললেও ও রাগ করবে না।'

মিতা কোনও কথা বলল না। শুধু বাপের বুকে মুখ ঘষতে লাগল।

সকালবেলা মিতার চেহারায় একটা প্রসন্নতা লক্ষ করলেন আহাদ সাহেব।

'দেখেছ, মিতাকে একটু খুশি খুশি লাগছে আজ।'

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন মাজেদা বেগম। 'মনমরা ভাবটা কেটে গেছে।'

হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এল মিতা। 'এই পুতুলটা ভাল না, আব্বু। আমার সাথে শুধু ঝগড়া করে।'

'তাই নাকি? খুব পাজী তো।'

'পুড়িয়ে ফেল্ ওটাকে।' পুতুলটাকে শেষ করে দেবার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না মাজেদা বেগম।

'তাই করব,' বলেই হন হন করে রান্নাঘরের দিকে হাঁটতে লাগল মিতা।

স্বামীর দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন মাজেদা বেগম। কোলে হাত-পা নাড়ছে অবোধ রীতা।

'আপদ বিদেয় করাই ভাল।'

হাবুর মা নাস্তা বানাচ্ছিল রান্নাঘরে। মিতাকে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেল।

'এইহানে কী আপামণি?'

'জুলেখাকে পুড়িয়ে ফেলব,' গম্ভীরভাবে বলল মিতা।

'হেইডাই বালো। খুব খারাপ জিনিস এইডা।'

গনগনে আগুন বেরুচ্ছে বড় চুলার মুখ থেকে। একটু ইতস্তত করল মিতা। তারপর জুলেখার মাথাটা ঢুকিয়ে দিল চুলোর ভিতরে।

প্রচণ্ড উত্তাপে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল মাথাটা। মিতার মনে হলো ব্যথায় আর্তনাদ করছে জুলেখা। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে গলে যাওয়া পুতুলটার দিকে। খেয়াল করল না কখন একফাঁকে—আগুনের একটা হালকা শিখা আলতোভাবে ছুঁয়ে গেল তার জর্জেটের জামাটাকে।

প্রথমে হাবুর মার চোখেই পড়ল জামার ঝুলের কোনার ছোট্ট আগুনটা।

'আগুন! ইয়া আল্লা! আগুন! আপা!'

লাফিয়ে এল বুড়ি মিতার দিকে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। চমৎকার ডিজাইন করা জর্জেটের জামাটাকে মুহূর্তের মধ্যে গ্রাস করল লেলিহান শিখা, ভয়ে আতঙ্কে মরণ চিৎকার জুড়ে দিল হাবুর মা।

কবির আশরাফ

শোধবোধ

স্পষ্ট অনুভব করলাম আমার বাম নাকের ভেতর কিছু একটা ঢুকে যাচ্ছে। শির শির করে উঠল সমস্ত শরীর, মস্তিষ্ক সংকেত পাঠাল ওটাকে বের করে আনার জন্যে। চোখ ট্যারা করে তাকালাম, ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক—একটা জলজ্যান্ত তেলেপোকা। কিন্তু হাতদুটো কিছুতেই নাড়াতে পারলাম না। দেখলাম তেলেপোকার অর্ধেক শরীর ঢুকে গেছে নাকের গর্তে। প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে অবশ হাতদুটোকে নাড়ানোর চেষ্টা করলাম, নড়ল না। আতঙ্কে লোমকূপগুলো খাড়া হয়ে গেছে, দরদর করে ঘাম ঝরছে শরীর দিয়ে, হারিয়ে যাচ্ছে চিন্তাশক্তি। নিজের অজান্তেই কয়েকবার চিৎকার করবার চেষ্টা করলাম, একটা শব্দও বের হলো না। বিশ্রী পোকাটা প্রায় সম্পূর্ণ ঢুকে গেছে; প্রচণ্ড রাগ, ঘৃণা আর অসহায়ত্ব নিয়ে তীব্র চিৎকার দিয়ে উঠে বসলাম আমি, স্যাঁৎ করে বেরিয়ে এল পোকাটা, ধরবার আগেই উড়ে পালাল।

এই নিয়ে তিনবার! পরপর তিনরাতে তিনবার! অসহ্য। প্রথমবার ভেবেছিলাম দুর্ঘটনা মাত্র। পরেরবার একটু অবাক হয়েছিলাম, কিন্তু এবার? কী যে ভাবব নিজেও বুঝতে পারছি না। জীবনে কোনওদিন কোনও তেলেপোকা কারও নাকে ঢোকার চেষ্টা করেছে বলে শুনিনি, দেখা দূরের কথা। কিন্তু এখন নিজের নাকে ঢুকছে, দেখেও অবিশ্বাস করি কীভাবে। কাউকে ব্যাপারটা বলতেও পারছি না, নির্ঘাত পাগল ঠাউরাবে সবাই। কিন্তু এভাবে চুপচাপ বসেও থাকা যায় না, কিছু একটা করতেই হবে। মনে মনে ভাবার চেষ্টা করলাম, কী করে এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা বন্ধ করা যায়? প্রথমেই এল ধ্বংসাত্মক চিন্তাটা; বাড়ির যেখানে যত তেলেপোকা আছে, সবকটাকে শেষ করতে হবে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রাত তিনটে চুয়ান্ন। এখন আবার ঘুমাতে গেলেও লাভ হবে না। আসবে না ঘুম। কাজেই নামলাম তেলেপোকা নিধন যজ্ঞে।

সকাল সাতটা পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টার পর মাত্র চারটাকে শেষ করতে পারলাম। কোথায় যে পালাল বাকিগুলো হাজার খুঁজেও বের করতে পারলাম না। অফিসের সময় হয়ে গেছে, সুতরাং তেলেপোকা-টোকা রেখে অফিসে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম। মিনিট বিশেক লাগল। অফিস সাড়ে সাতটায়, ঘরে তালা ঝুলিয়ে বের হলাম। মিণ্টুটা থাকলে আর তালা লাগাই না, কিন্তু ওকে আবার দিনকয়েকের জন্য বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। দু'এক দিনের মধ্যে এসে যাবে। গ্যারেজে ঢুকে গাড়ি বের করলাম। এই সময় হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা। আমার শোয়ার ঘরে চারটে মৃত তেলেপোকা ছাতের দিকে ঠ্যাং তুলে শুয়ে আছে, ওদেরকে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া হয়নি। কেমন অস্বস্তি লাগল। বেডরুমের মধ্যে চারটে তেলেপোকা, একটু কেমন কেমন লাগেই। এই তো মাত্র দু'রাত আগেও নীতা শুয়েছিল ওই ঘরে। নীতা আমাকে ভালবাসত। অন্তত তাই জানতাম আমি। তারপর জানলাম,

বাসত না। আসলে আমাকে নিয়ে খেলত সে, ভালবাসত আরেকজনকে। যেই জানলাম, অমনি ওকে পটিয়ে নিয়ে এসে শোয়ালাম বিছানায়।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম, পঁচিশ। উহ্, আজ কিছুতেই লেট হওয়া যাবে না। গত তিন দিন ছুটি কাটিয়ে আজ লেট হলে আস্ত রাখবে না চীফ ইঞ্জিনিয়ার কামরুল হোসেন। ছুটল গাড়ি মতিঝিল অভিমুখে। ভুলে গেলাম চারটে মৃত তেলেপোকার কথা, আমার বেডরুমে ওপর দিকে পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে।

একটা পার্টি অ্যাটেণ্ড করে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন বাজে প্রায় ন'টার মত। মদটা একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গেছে। খুব ক্লান্তি লাগছে, গোসল করব মনস্থ করলাম। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার খুলে নীচে দাঁড়ালাম। হঠাৎ মনে পড়ল— তেলেপোকা! সেই চারটে তেলেপোকা গেল কোথায়? বেডরুমে ওদের দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না। তবে? একটা খটকা লাগল মনে, সন্দেহটা ঘোচাবার জন্যেই ছুটে গেলাম বেডরুমে। নেই, সত্যিই নেই! আমি বাড়ির দরজা বন্ধ করে বেরিয়েছিলাম সুতরাং আমার অনুপস্থিতিতে কেউ ভেতরে ঢোকেনি, তেলেপোকাগুলোও বেঁচে ছিল না যে হেঁটে সরে যাবে, তা হলে গেল কোথায়? ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অস্পষ্টভাবে বিপদ সংকেত জানাল যেন। ঠিক ধরতে পারলাম না। ভাবার চেষ্টা করলাম, এটা কী সত্যিই খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার? হতে পারে ওগুলো বাতাসের ঝাপটায় সরে গেছে, বিছানা অথবা চেয়ার টেবিলের নীচে ঠিক তেমনিভাবে ঠ্যাং উঁচিয়ে শুয়ে আছে। তক্ষুনি খাটের নীচটা দেখতে যাচ্ছিলাম, কী মনে করে আর দেখলাম না। ফিরে গেলাম বাথরুমেই। গোসল সারতে সারতে ঠিক করলাম, তেলেপোকার বাচ্চাগুলোর যা খুশি হোক তাতে আমার অত ভাববার কিছু নেই। ওরা ওখানে থাকল কি না থাকল তাতে কার কী?

তবু খেয়েদেয়ে শুতে যাবার সময় মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। গত তিনদিনের বিশ্রী অভিজ্ঞতার পর আজ রাতে আর ঘুম আসবে কিনা সন্দেহ। বার বার তিনবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি! ভয় পাওয়ারই কথা! শয্যাসঙ্গিনী করার জন্যে কোনও মেয়েকে ডাকা যায় কিনা ভাবতে গিয়ে পছন্দমত কারও কথা মনে পড়ল না। অবশেষে দূর ছাই বলে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। মশারীটা ভালভাবে বিছানার চারদিকে গুঁজে দিলাম যেন একটা পিঁপড়েও অনধিকার প্রবেশ করতে না পারে। এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত চিত্তে ঘুমানোর চেষ্টা করতে লাগলাম, যদিও ছোট্ট একটা অস্বস্তি রয়েই গেল।

খস-খস, খস-খস অতি মৃদু একটা শব্দ একটানা হয়েই চলেছে। ঘুম ভাঙতেও সঙ্গে সঙ্গে উঠলাম না। চুপচাপ শুয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম ব্যাপারটা কী। শেষ পর্যন্ত কিছু বের করতে না পেরে সাহস করে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে লাইট জ্বাললাম। কিলবিল করে নড়ে উঠল ছয়পেয়ে, কুৎসিত পোকাগুলো। ওদের খয়েরী শরীরে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এল বৈদ্যুতিক আলো। সুদৃশ্য গালিচার একটা কণাও চোখে পড়ল না আমার, দু'চোখ মেলে দেখতে লাগলাম লক্ষ লক্ষ তেলেপোকার ইতস্তত বিচরণ আমারই বেডরুমে! আতঙ্ক, হ্যাঁ, একটা আতঙ্কই

ধীরে ধীরে ভর করল আমার চেতনায়। ঘাড়ের পেছনে চুলগুলো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, পেটের ভেতরটা খালি। এ কী অদ্ভুত ব্যাপার! কী চায় ওরা আমার কাছে? এলোই বা কোথা থেকে? ঠিক কী করা উচিত বুঝতে পারলাম না। ঘড়ির দিকে তাকালাম, রাত তিনটে বেজে কয়েক মিনিট। এসময় টেলিফোনে কাউকে বিরক্ত করার প্রশ্নই নেই, কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কী? কাকে ডাকা যায় ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল স্থানীয় থানার ওসি সাজ্জাদ খান-এর কথা। তিনি আমার পরিচিত। কিন্তু ঠিক কী বলব ভাবতে গিয়েই আবার হোঁচট খেলাম। এই রাত তিনটের সময় তাঁকে ঘুম থেকে তুলে যদি বলি, আমাকে তেলেপোকারা অবরুদ্ধ করেছে, এখান থেকে আমাকে উদ্ধার করুন আপনি, তা হলে ব্যাপারটাকে ঠিক কী চোখে দেখবেন তিনি? ইয়ার্কি ভাববেন নাকি স্রেফ উন্মাদ ঠাউরে নেবেন? লক্ষ করলাম আমার এই চিন্তাটুকুর ফাঁকেই অনেক বেড়ে গেছে ওরা সংখ্যায়। ওদের সবার ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে যেন প্রতিশোধস্পৃহা দেখতে পেলাম। তবে কি ওরা ওদের চারজনের খুনের প্রতিশোধ নিতে এসেছে? আশ্চর্য—জীবনে এমন কথা কেউ কোনওদিন শুনেছে? তেলেপোকারা দল বেঁধে প্রতিশোধ নিতে আসে!

টেলিফোনের দিকে তাকাতেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল আমার। ঘরের মেঝে ছাড়া আর কোনও আসবাবপত্রে ওঠেনি ওরা, একমাত্র টেলিফোনটাই ব্যতিক্রম। ওটাকে একেবারে ছেয়ে ফেলেছে পোকাগুলো। ভেবেই পেলাম না, ওরা কী করে বুঝল যে ওটা দিয়ে আমি সাহায্য চাইতে পারি? কী করে? তবে কি মানুষের মত ওদেরও চিন্তার ক্ষমতা এসে গেল? রাগে দুঃখে প্রায় কান্না এল আমার। কী করব কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না। একটু আগেও টেলিফোন করার কথা ভাবছিলাম অথচ এখন সেটাও অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। মশারীটার কোথাও কোনও ফাঁক আছে কিনা বারবার পরখ করে নিলাম। কোথাও কোনও ফাঁক না পেলে ভেতরে ঢুকতে পারবে না ওরা। মাত্র ঘণ্টাখানেক কাটাতে পারলেই হয়, তারপরেই সকাল হয়ে যাবে। হয়তো মিণ্টুটাও এসে যাবে আজ। দরজায় ধাক্কা দিয়ে যখন দেখবে কেউ খুলছে না তখন নিশ্চয় কোনও না কোনওভাবে ঢোকার ব্যবস্থা করে নেবে ও, তারপর ভেতরে ঢুকে এই তেলেপোকাগুলোকে ভাগানোর একটা মতলব ঠিকই বের করে ফেলবে। কিন্তু তারও এখনও ঘণ্টাখানেক বাকি। তাই ভয়ে ভয়ে শুয়েই পড়লাম।

সংখ্যায় ক্রমে বেড়ে চলা ছ'পেয়ে কুৎসিত জীবগুলোর দিকে তাকাতেও ভয় হলো, হয়তো তাকালেই দেখব সবগুলো একসাথে ভেঙচি কেটে উঠল। উহ্, এমন বিপদেও মানুষ পড়ে। সামান্য তেলেপোকা, ওরাই আতঙ্কিত করে ছাড়ল আমাকে। শুয়ে শুয়ে সম্ভব অসম্ভব অনেকভাবেই এই বিশ্রী পোকাগুলোকে ফাঁকি দিয়ে বাড়ির বাইরে বহাল তবিয়তে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ভাবলাম, কোনওটাই বিশেষ সুবিধাজনক মনে হলো না। বাতি নেভালাম না, সাহসে কুলাল না। আসলে ওদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে চাইছি।

বাইরে সম্ভবত এখন পড়ন্ত বিকেল। তাই-ই হবে, কারণ ঘড়ি বলছে—পাঁচটা পঁচিশ। মিণ্টু এখনও আসেনি অর্থাৎ আজ আর আসছে না। এ যাবৎ দু'বার রিং

হয়েছে টেলিফোনটায়, একবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে—নিঃসন্দেহে অফিস থেকে, আরেকবার দুপুরের দিকে—সম্ভবত কোনও বন্ধু। রিসিভার তোলার প্রশ্নই আসে না। ওটা এখন তেলেপোকাদের তীর্থস্থান!

ওদের আগমনের কোনও বিরতি নেই। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ভিড় বাড়ছে তো বাড়ছেই। আচ্ছা, কেউ কী লক্ষ্য করছে না হাজার হাজার তেলেপোকা একটা বিশেষ বাড়ির দিকে লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে? নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হলো। সামান্য এই তেলেপোকাগুলোর বিরুদ্ধেও কিছুই করতে পারছি না আমি! খিদেয় নাড়িভুঁড়ি জ্বলছে অথচ রান্নাঘরে যাওয়ার কোনও উপায় দেখছি না। বেশ বুঝতে পারছি, মাটিতে পা দেয়া মাত্র হাজার হাজার তেলেপোকা আমার শরীর বেয়ে উঠতে শুরু করবে। খুব বেশি হলে সেকেণ্ড পাঁচ ছয় লাগবে ওদের আমার মুখে পৌঁছাতে। তারপরই নাক-মুখের সব ক'টা ফুটো দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবে ওরা। ভাবতেও শরীর ঘিন-ঘিন করে উঠল। টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। সেখানে আগের মতই ভিড়। অগত্যা আবার শুয়ে পড়লাম।

অসম্ভব। আর সহ্য করা যায় না। পেটের ভেতর অসহ্য খিদে, মুখে দুর্গন্ধ, মাথায় যেন চল্লিশ মণ ওজনের পাথর চাপানো। সারাটা রাত কেটেছে নিদারুণ যন্ত্রণায়। আজও প্রায় বিকেল হয়ে এল অথচ এখনও কেউ এল না। মিণ্টুটাও আসেনি। কী করছে হতভাগাটা। ইস্, ও যদি এখন থাকত কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা হয়েই যেত। কিন্তু নীতার জন্যই ওকে সরাতে হলো। কথাটা এভাবেও বলা যায়, নীতাকে সরাতে হবে বলেই ওকে ভাগাতে হলো। না, নীতার কথা ভাবব না। এখন এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া সবচেয়ে আগে দরকার। আরও দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। তারপরও যদি কেউ না আসে তা হলে টেলিফোনটাকে যে করেই হোক ব্যবহার করবার চেষ্টা করব। করতেই হবে। তেলেপোকার হাতে মৃত্যু হলেও না খেয়েই হয়তো পটল তুলতে হবে আমাকে।

দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেছে আরও একঘণ্টা আগেই। এতক্ষণ ধরে সাহস সঞ্চয় করছি—টেলিফোনটাকে ঘিরে থাকা পোকাগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে। মনে মনে একটা প্ল্যানও ঠিক করে ফেলেছি। প্রথমে টেলিফোনটাকে দু'হাতে ধরে একটা জোর ঝাঁকুনি দেব। তা হলে মোটামুটিভাবে বেশিরভাগ তেলেপোকাই ঝরে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনটাকে মশারীর ভেতর নিয়ে আসতে হবে। সঙ্গে দু'চারটে দু'পেয়ে থাকলে ওগুলোরও অকালমৃত্যু ঘটবে, দু'চারটের ভাগ্য ভাল থাকলে আমার উদরে যাবার সৌভাগ্যও হতে পারে; এমন ভয়ঙ্কর খিদে লেগেছে তাতে তেমন কিছু ঘটলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। অ্যাসাইনমেণ্টটা শুরু করবার আগে আরও একঘণ্টা অপেক্ষা করবার কথা ভাবলাম। মনে মনে আশা করছি কেউ না কেউ আমাদের খোঁজে আসবেই। আসতে বাধ্য। গত দু'দিন ধরে অফিসে যাইনি আমি, সুতরাং অফিস থেকে লোক আসতে পারে, যদিও রাতে আসবার সম্ভাবনা একেবারেই কম। এ ছাড়াও, আজ দুপুরে একটা পার্টিতে যাওয়ার বিশেষ নিমন্ত্রণ ছিল, সেখানেও যখন যাইনি তখন ওদেরও খোঁজ করা

উচিত। সবশেষে মিণ্টু। যেকোনও মুহূর্তে এসে পড়তে পারে ও।

ন'টার সময় সিদ্ধান্ত নিলাম, টেলিফোনটাকে ছিনিয়ে নেব। কয়েক মিনিট লাগল প্রস্তুতি নিতে; তারপর... হঠাৎ করে মশারীটা সামান্য তুলে টেলিফোনটার দিকে হাত বাড়ালাম। নরম, কুৎসিত শরীরগুলোর ওপর পড়ল হাত। টেলিফোনটাকে সজোরে আঁকড়ে ধরে ঝাড়া দিলাম একবার। আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করলাম মাত্র দু'একটা ঝরে পড়ল, বাকি সবগুলো সেঁটে থাকল টেলিফোনের শরীরের সাথে। কয়েকটা ইতিমধ্যেই হাতে উঠে এসেছে। পরপর আরও দু'বার ঝাঁকুনি দিলাম দ্রুত, ফলাফল একই। অন্তত কয়েকশো তেলেপোকা ঘিরে আছে সেটটাকে। আট-দশটা আমার কনুইতে পৌঁছে গেছে ততক্ষণে। চকিতে টেলিফোন সেটটাকে ছেড়ে ওগুলোর দিকে নজর দিলাম। প্রচণ্ড আক্রোশে এক এক করে চিড়ে চ্যাপ্টা করলাম সব ক'টাকে। ওদের শরীর থেকে নির্গত নোংরা পদার্থগুলোকেও তেমন একটা পাত্তা দিলাম না।

দীর্ঘ দুটো দিন কিচ্ছু খাইনি। উহ্, সব সহ্য করা যায় কিন্তু খিদে সহ্য করি কীভাবে! ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসছি আমি, শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিক দিয়েই। গতকাল সামান্য একটু ঘুমিয়েছিলাম বোধহয়, নীতার স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছি। স্পষ্ট দেখলাম নীতা হাসছে। আনন্দের হাসি, প্রতিশোধের হাসি। তবে কি এই লক্ষ লক্ষ তেলেপোকার সমাবেশ আমাকে শাস্তি দেয়ার জন্যেই? এটা কি তা হলে প্রকৃতির প্রতিশোধ? ঝিমঝিম করছে সমস্ত শরীর, খিদে এবং পিপাসা দুটোই গ্রাস করছে আমাকে। নিজের ভেতরের শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে ফেলছি।

এখনও ওরা আসছে, কিলবিলিয়ে নড়ছে চড়ছে সারাটা ঘরময়। ওদের যেন কোনও ক্লান্তি নেই, খিদে নেই, পিপাসা নেই। ওহ্, কী অসহ্য শাস্তি! চোখে অন্ধকার দেখছি আমি, বুকের ভেতর কীসের যেন ব্যথা। কীসের ব্যথা? নীতার জন্যে ব্যথা।

তিন তিনটে দিন চলে গেছে। শেষ হয়ে গেছি আমি। সামান্য, আসলে কতটুকু সামান্য জানি না—ওই তেলেপোকাগুলোই আমাকে শেষ করে দিয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি এ আর কিছুই নয়, প্রকৃতির বিধান। আমাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। এ শাস্তি আমাকে মাথা পেতে নিতেই হবে। ক্লান্ত দু'চোখ মেলে চাইলাম টেলিফোনটার দিকে। আ...শ্চ...র্য! নেই, একটা তেলেপোকাও নেই ওটার ক্রিমকালার শরীরে! ধীরে ধীরে দুর্বল হাতে ডায়াল করলাম।

'হ্যালো?' ভেসে এল গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর, সাজ্জাদ খানের।

'আ-মি রফিক আহমেদ বলছি।'

'কেমন আছেন?'

'নীতা নামের যে মেয়েটাকে আপনারা নিখোঁজ হিসাবে খুঁজছেন, আসলে সে এখন আমার বাড়ি থেকে চল্লিশ হাত দূরে শুয়ে আছে, মাটির তিন হাত নীচে।'

'কী!'

'কাজটার পেছনে মোটিভ ছিল—প্রতিশোধ। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।'

'কোথায়?' চেঁচিয়ে উঠলেন খান।

'বাড়িতে।'

রেখে দিলাম রিসিভার। ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে তাকালাম মেঝেতে। চলে যাচ্ছে ওরা, বেশ তাড়াহুড়োর সাথে। ওদের অ্যাসাইনমেণ্ট শেষ হয়ে গেছে।

সুদৃশ্য গালিচার ওপর চোখ পড়তে দেখলাম, সেই চারটে তেলেপোকা, ঠিক তেমনিভাবে আকাশের দিকে ঠ্যাং উঁচিয়ে শুয়ে আছে ওরা।

শুজা রশীদ

কামিনী

যাত্রাবাড়ি থেকে ঢাকায় ফিরছিল কাজল। বন্ধুর বিয়েতে গিয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে রাত বারোটা বাজল—অন্যান্য বন্ধুরা থেকে গেল—কাজল থাকল না। আসার সময় মার শরীরটা খারাপ দেখে এসেছে। সে একজন ডাক্তার—মা, ছোট বোন রেখা ও বিধবা ফুপুকে নিয়ে তার সংসার। এখনও বিয়ে করেনি। ফুপু ও রেখাকে কী ওষুধ, কখন খাওয়াতে হবে মাকে—সব বুঝিয়ে এসেছে, তবু নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। মাকে সে অসম্ভব ভালবাসে। বাবা মারা যাওয়ার পর অনেক কষ্টে মা তাদের দুই ভাইবোনকে বড় করেছেন—মাকে ব্যথা দেবার কথা চিন্তাও করতে পারে না সে।

বিয়েতে আসতে চায়নি কাজল—মা-ই জোর করে পাঠিয়েছেন। আর বন্ধুর পীড়াপীড়ি তো ছিলই। সকালেই একটা অপারেশন আছে—দক্ষ সার্জেন হিসাবে তার খ্যাতি অসাধারণ। কাজের ক্ষেত্রে সে অসম্ভব নিয়ম নিষ্ঠা মেনে চলে। সব শেষ হতে আর একটুও অপেক্ষা করল না—বন্ধুদের অনুরোধ উপেক্ষা করে ঢাকার উদ্দেশ্যে গাড়ি ছুটাল।

দ্রুত ধাবমান ট্রাক ছাড়া অত রাতে আর বিশেষ কোনও যানবাহন ছিল না রাস্তায় তাই গতি বাড়িয়ে দিল—তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছাতে হবে। নীরব, গভীর রাতের অন্য রকম একটি মাদকতা আছে—ভয়ঙ্কর অথচ উপভোগ্য একটি সৌন্দর্য—তবে একা থাকলে ঠিক জমে না—রাতের নীরবতা তখন বড় বেশি পীড়া দেয়—অস্বস্তির, বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়। মায়ের প্রতি মন পড়ে আছে তাই আলাদা কোনও অনুভূতি বোধ করল না সে।

একটা ট্রাককে পাশ কাটিয়ে যেতে দিল কাজল, আর ঠিক তখনই চোখে পড়ল, বেশ অনেকটা দূরে কেউ একজন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং হাত নেড়ে থামবার ইঙ্গিত করছে। গাড়ি চালাবার সময় যথেষ্ট সতর্ক থাকে সে, তাই ভুল দেখার প্রশ্ন নেই—এত রাতে অচেনা কারও ইশারায় গাড়ি থামানো খুবই বোকামি—তবু, মানুষের উপকার করা যার পেশা—নিজের বিপদ হতে পারে জেনে সে কি এড়িয়ে যেতে পারে?

গতি কমিয়ে একেবারে মানুষটার কাছাকাছি চলে এল কাজল এবং বিস্মিত হয়ে দেখল যে, একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বয়স বা চেহারা আধো অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না, তবে মেয়েটি বেশ লম্বা—সাধারণ বাঙালী মেয়ের তুলনায় দীঘল ছিপছিপে গঠন। জানালার কাঁচ নামিয়ে জিজ্ঞেস করল কাজল—কী সাহায্য সে করতে পারে।

কাঁপা কাঁপা ভেজা সুরে উত্তর এল, 'আপনি ঢাকায় যাচ্ছেন, আমাকে একটু দয়া করে পৌঁছে দেবেন?'

খুবই অবাক হলো কাজল। চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। ওর নীরবতায় ভীত

গলায়, আকুল কণ্ঠে আবার বলে উঠল মেয়েটি, 'দেখুন, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। দু'একজন যারা গেল, কেউ থামেনি। আপনিও যদি চলে যান। আমি তা হলে এরপর মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকব—কত ট্রাক আসা যাওয়া করছে, তার একটার নীচেও যদি পড়ি কোনও আফসোস্ হবে না আমার।' কাঁদছে মেয়েটি।

চমকে উঠল কাজল। ব্যাপার কী? দ্রুত ভাবল একবার। পাগল নয়তো মেয়েটি? তা হলেও, ওর একটা দায়িত্ব থেকেই যাচ্ছে। সত্যিই যদি কথামত মেয়েটি তাই করে, ছোট হয়ে থাকবে সে নিজের কাছে সারা জীবন—বিবেকের দংশনে জ্বলবে। দেখাই তো যাচ্ছে যে, ছুরি, পিস্তলধারী কোনও সন্ত্রাসী নয় এ। মনস্থির করে ফেলল সে। যা হয় হোক—মেয়েটিকে এভাবে ফেলে রেখে যেতে পারবে না সে।

সামান্য ইতস্তত করে পাশের আসনের দরজা খুলে দিল কাজল। এত নিঃশব্দে হালকা ভাবে বসল মেয়েটি যে, আশ্চর্য হলো সে—গাড়িতে কেউ উঠলে সামান্য দুলে ওঠে, এ তো টেরই পাওয়া গেল না।

যাক, চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে কাজল—কথা সে কমই বলে—গাড়ি চালাবার সময় তো একদম নয়।

মেয়েটি কাঁদছে, বুঝতে পারল ও। আর চুপ করে থাকলে কেমন দেখায়—অন্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করল, 'ঢাকায় কে আছে? মানে, কার কাছে যাবেন? ইয়ে, মানে—এত রাতে, আপনি একা—' বোকার মত হয়ে গেল কথাটা। ঢাকায় কেউ না থাকলে যেতে চাইবে কেন ওখানে? আর কী বলবে, ভেবে পেল না। পরমুহূর্তেই আরও বোকা হয়ে গেল সে। মেয়েটি এবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বেচারা কাজল নিজের মা, বোন ছাড়া অন্য কোনও মেয়ের সংস্পর্শে আসেনি। আগ্রহই বোধ করেনি—নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনায় মগ্ন ছিল। এখন ক্রন্দনরতা মেয়েটিকে সে কীভাবে সান্ত্বনা দেবে? নামও জানে না, সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি মেয়েকে এই পরিস্থিতিতে শান্ত তাকেই করতে হবে ভেবে সে ঘেমে উঠল।

এই অবস্থায় গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। ঢাকার কাছাকাছি প্রায় এসে গেছে, সুবিধা মত একটা জায়গা দেখে এক পাশে দাঁড় করাল গাড়ি এবং ঘুরে মেয়েটির দিকে চেয়েই মুগ্ধ হয়ে গেল।

আলো থাকায় মেয়েটিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গায়ের রং কালো, কিন্তু এত মিষ্টি চেহারা, পদ্ম পলাশ চোখ থেকে মুক্তোর মত অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে মসৃণ ত্বকে। কালো, জগতের আলো—কথাটা মনে পড়ে গেল ওর। সত্যিই যেন মিষ্টি মুখটি থেকে আলো বের হচ্ছে। অনেক রূপসী মেয়েও এর কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে।

দূর, কী সব ভাবছে—নিজেকে সংযত করে জানতে চাইল কাজল, 'কী হয়েছে, যদি আপত্তি না থাকে তা হলে বলতে পারেন।'

আপত্তি হলো না, কান্নার ফাঁকে ফাঁকে বলে গেল মেয়েটি। ওর নাম কামিনী। চাচা-চাচী ছাড়া আর কেউ নেই জগতে। ভয়ঙ্কর বদমেজাজী চাচীর অত্যাচার সইতে না পেরে অবশেষে আজ পালিয়েছে। ভাল মানুষ চাচা, যমের চাইতেও বেশি ভয় পান স্ত্রীকে—তিনিই এক ফাঁকে কিছু গয়না, যা তার মায়ের ছিল দিয়েছেন কামিনীকে। সেগুলো নিয়ে এক কাপড়ে চলে এসেছে কামিনী। ঢাকায়

কাউকেই সে চেনে না। নির্দিষ্ট কোনও জায়গা তার যাওয়ার নেই।

দুঃখের কাহিনি শুনে দুঃখিত সুরে জানতে চাইল কাজল—কাউকেই যখন সে চেনে না তবে ঢাকায় যাচ্ছে কেন? জবাব পেল—রাজধানী শহর—অত বড় শহরে তার কোথাও একটু জায়গা হবে না? গয়না বিক্রি করে প্রথমে কোনও হোটেলে উঠবে, তারপর একটা ব্যবস্থা করে নেবে। তারপরও, কিছু না হলে, আত্মহত্যার প্ল্যানটা তো রইলই।

এমন ভয়াবহ কথা জীবনে শোনেনি কাজল। স্তম্ভিত বিস্ময়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। প্রথমত, গয়না সহ মেয়েটি কোনও বদ লোকের পাল্লায় পড়লে কী হত ভাবতে যেয়ে ঝিমঝিম করে উঠল ওর শরীর। দ্বিতীয়ত, এত রাতে ঢাকায় পৌঁছে, গয়না বিক্রি করে তারপর থাকার ব্যবস্থা করবে এমন দুঃসাহসিক কাজ সাধারণ কোনও পুরুষও করবে না—মাস্তানরাও দুইবার চিন্তা করবে এই প্ল্যান কার্যকরী করতে—আর এ তো অবলা, অসহায় নারী—কোথাও পৌঁছাবার আগে ওর রক্ত মাংসের কণাও খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

কাজলকে চুপ করে থাকতে দেখে কান্না ভেজা কণ্ঠে কামিনী বলল, 'বুঝতে পারছি, আপনাকে বিপদে ফেলে দিলাম। ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি।'

শান্ত স্বরে, 'জায়গা মত চুপ করে বসে থাকুন,' বলেই গাড়ি ছেড়ে দিল কাজল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে তার।

কলিং বেল টিপতেই রেখা দরজা খুলে দিল—পিছনে ফুপুও এসে দাঁড়ালেন। 'এত রাত করলি, বাবা...'

'হ্যাঁ, ফুপু একটু দেরি হয়ে গেল। মা কেমন আছেন?' ভাল এবং ঘুমাচ্ছেন শুনে কাজল বসার ঘরের সোফায় বসল—ফুপু, রেখাকেও ইঙ্গিতে বসতে বলল—তারপর পুরো ঘটনা খুলে বলল কাজল।

ফুপু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'এনেছিস যখন, আজ রাতটা থাকুক, তারপর দেখা যাবে কী করা যায়।'

'মেয়েটির কোথাও কেউ নেই, কালই বা কী ব্যবস্থা হবে,' রেখা বলল।

চিন্তিত স্বরে ফুপু বললেন, 'তাই তো। আচ্ছা, আজ রাতটা তো কাটুক। কই, কোথায় মেয়েটি?'

কাজল বাইরে দাঁড় করিয়ে এসেছিল কামিনীকে। মা, ফুপুরা যথেষ্ট সংবেদনশীল, মায়াদয়ার মনের মানুষ। তবু, এই অর্ধেক রাতে অচেনা আস্ত একটি মেয়েকে পট করে ঘরে আনবে, তাই কি হয়?

ভেতরে ঢুকে কামিনী জড়সড় হয়ে দাঁড়াল। পরিচয় পর্ব শেষ হতে কামিনী ফুপুর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

'আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না, ফুপু আম্মা, আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।'

ফুপু বিব্রত হয়ে গেলেন, কালো কামিনীর আলোময় সৌন্দর্যে আগেই মুগ্ধ হয়েছিলেন, এখন একেবারে আবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

যাই হোক, এভাবেই কামিনী এসেছিল কাজলদের বাড়িতে। পরে মা তো সব

শুনে কেঁদেই ফেলেছিলেন। কেউ আর তাকে কোথাও যেতে দেয়নি—কামিনী এখন ওদেরই পরিবারের একজন।

খুব শান্ত, লক্ষ্মী মেয়েটি—নিজের আচার ব্যবহারে সবাইকে মুগ্ধ করে ফেলল। রেখার তো কথাই নেই—প্রায় সমবয়সী কামিনী ওর প্রিয় বান্ধবী।

আর কাজল?

তার মনের কথা বোঝা কষ্টকর—ব্যস্ত মানুষ, বাসায় থাকেই কম। কামিনীর সাথে দেখা বা কথা হয় আরও কম। রেখা টের পেয়েছে তার মনের দুর্বলতা, বাসার টুকটাক কাজ কামিনী জোর করেই করে সানন্দে—তেমনি কাজলের সব প্রয়োজনীয় কাজ করে। বাসায় থাকলে কাজল-কামিনীর মুখে যে কমনীয় লাবণ্য ফুটে ওঠে, তা রেখার নজর এড়ায়নি। মাঝে মাঝে দুষ্টুমি করে রেখা বলে, 'আমার ভাই তো ফর্সা, কালো মেয়ে সে পছন্দই করবে না!'

লজ্জা রাঙা হাসিতে মিষ্টি মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কামিনীর। কোনও কথা বলে না।

অন্যান্য কাজ সেধে করলেও কামিনী কিন্তু কখনও রান্নাঘরের কোনও কাজে আগ্রহ দেখায়নি, এ ছাড়া আর কোনও ব্যাপারে তার জুড়ি মেলা ভার। মা, ফুপু তো তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রায়ই তাঁরা আলাপ করেন কাজল-কামিনীর সম্পর্কে। বিয়ে হলে ভালই হত—এমন লক্ষ্মী শ্রী মেয়ে। আবার ভাবেন, বংশ পরিচয়হীন মেয়ে—কোনও অভিভাবক নেই—যেটুকু কামিনীর মুখে শুনেছেন সেটুকুই জানেন কেবল—কেউই কোনও খোঁজ খবর করেননি। সব মায়েরই সন্তানের বিয়ে নিয়ে সাধ আহ্লাদ থাকে, কুটুম নিয়ে আনন্দ করা ইত্যাদি। তাই বিয়ের আলোচনাটা খুব বেশি দূর এগোয় না।

রেখা খুব চঞ্চল হাসিখুশি মেয়ে, কিন্তু অসম্ভব বুদ্ধিমতীও। কামিনীকে কেন্দ্র করে আবেগ, আমোদের প্রাথমিক পর্ব শেষ হয়েছে—রেখার চোখে ধীরে ধীরে নানারকম অসংগতি ধরা পড়তে লাগল। যেমন, কামিনী ভাত, তরকারী খায় খুব কম, রান্না করা খাবারে তার প্রচণ্ড অনীহা, বরং দুধটাই খায় সে খুব শখ করে, সানন্দে—দুধ দিয়ে রান্না সেমাই বা ফিরনীও পছন্দ করে—আগে এক লিটার দুধেই হয়ে যেত কিন্তু এখন দুই লিটারেও কুলোয় না। হয়তো এসবের কোনও গুরুত্বই নেই, মানুষের খাবার রুচি এক নয়, কিন্তু কথা হলো, অত্যাচারী চাচী কি আদর করে এত এত দুধ খাইয়েছেন প্রতিদিন? তবে? তা ছাড়া এত কম খেয়ে ওর শরীর এতটা সুস্থ, তাজা থাকে কী করে? এসবের সন্তোষজনক কোনও জবাব বা ব্যাখ্যা ওর জানা নেই।

একদিন রেখা শুনল, মা রান্নাঘরে রাগারাগি করছেন বুয়ার সঙ্গে—ফ্রিজে রাখা কাঁচা মাছ, মাংস কম, মাত্র সেদিনই বাজার করিয়েছেন—এর মধ্যে এতটা কমে যাবার কথা নয়, এতদিনের পুরোনো মানুষ সে—যদিও সারাদিন থেকে রাতে চলে যায় সে—ছেলে মেয়ে আছে। বাসা কাছেই—তবুও এতটা ভাবতে পারেন না যে লুকিয়ে বুয়াই জিনিসগুলো নিয়ে যায়—অবিশ্বাস করেন না ঠিকই, কিন্তু তা হলে মাছ, মাংসই বা কমে কেমন করে? খায় কে?

বুয়া তো কান্নাকাটি করে অস্থির।

চুপ করে সব শুনল রেখা—নীরবে এসে বসল বারান্দায়—অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে রইল দূর আকাশের পানে—কেন যেন মনে হচ্ছে কিছু একটা ব্যাপার, তাদের কারও চোখেই ধরা পড়ছে না—অনুভব করতে পারলেও, ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না এবং ব্যাপারটি অবশ্যই শুভ নয়।

কামিনী একদিন প্রশ্ন করে, 'কী হয়েছে, রেখা? আজকাল বেশ চুপচাপ হয়ে গেছ। ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না, প্রেমে পড়েছ?'

সামান্য হেসে রেখা বলে, 'হ্যাঁ, পড়েছি প্রেমে। তবে তোমার।'

হেসে লুটিয়ে পড়ে কামিনী। 'আরে কী জ্বালা—আমি পুরুষ মানুষ?'

স্থির চোখে চেয়ে থেকে রেখা মনে মনে বলে, তুমি যে কী সেটাই তো বোঝার চেষ্টা করছি।

বুয়া দেশে যাবে, কী দরকার আছে, তিন চারদিন লাগবে; ওর বড় মেয়েটাকে রেখে গেল কাজলদের বাসায়। পনেরো ষোলো বছরের মেয়ে, সব কাজই করতে পারবে, রাতেও থাকবে। খাবার ঘরের একপাশে বিছানা করে রাতে শোয় মেয়েটা। এক সকালে দেখা গেল, মেয়েটা মরে পড়ে আছে। সারা শরীর কালো হয়ে গেছে। খোলা চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত। সাপের কামড়ে মারা গেছে সে। কাজল তবু হাসপাতালে নিয়ে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু লাভ হয়নি কোনও। মাঝরাতের কোনও এক সময় মারা গেছে—এতক্ষণ কি আর বেঁচে থাকে! সাপের ছোবল খেয়ে? পোস্ট মর্টেম করে জানা গেল, সাংঘাতিক বিষধর সাপ কামড়েছে—সোজাসুজি মাথায়।

শহরের জমজমাট কোলাহলে—পরিষ্কার বাড়িতে সাপ এল কেমন করে? পোকা মাকড়, কেঁচো থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু বিষাক্ত সাপ? বুয়া তো এসে মাতম শুরু করে দিল—ওকে সান্ত্বনা দেবে কী—নিজেরাই সবাই পাথর হয়ে গেছে এই অবিশ্বাস্য ঘটনায়।

কাজল বোঝাল, যা হওয়ার হয়ে গেছে, ভেবে আর কী হবে। একবার যখন সাপের উৎপাত শুরু হয়েছে, তখন সতর্ক থাকাই ভাল। হাসপাতাল থেকে এক বোতল কার্বলিক অ্যাসিড এনে দিল। আগের বুয়া চলে গেছে, আর থাকতে রাজি হয়নি। নতুন বুয়াকে বলা হলো, সবখানে একটু একটু করে ছিটিয়ে দিতে। তাই করতে গেল সে, কিন্তু বোতলের মুখ খোলার আগেই পিছন থেকে শীতল একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'এদিকে শুনে যাও।' বুয়া থতমত খেয়ে ঘুরে দেখল কামিনী দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বোতল নিয়ে বেকুবের মত দাঁড়িয়ে রইল সে। ইশারায় কাছে ডেকে বুয়ার হাতে কতগুলো টাকা গুজে দিয়ে ফিসফিস করে কামিনী নির্দেশ দিল, বোতলটা দূরে কোথাও ফেলে দিতে। 'সাবধান কেউ যেন জানতে না পারে—এখানে সাপ নেই, শুধু শুধু ওষুধ দিয়ে কী হবে? কাউকে কিছু বোলো না—আরও টাকা দেব।'

লোভী বুয়া তাই করল—কাউকে কিছু না বলে দূরের ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এল অ্যাসিডের বোতল।

ফুপু সেদিন তাঁর ভাসুরের বাসায় গেলেন, কদিন থাকবেন। রেখা মার কাছে শুলো রাতে। মাঝরাতে পিপাসায় ঘুম ভেঙে গেল রেখার, মা অঘোরে ঘুমাচ্ছেন,

আস্তে উঠে খাবার ঘরে এল সে। বাতি জ্বালল না। আবছা আঁধারে আন্দাজে ফ্রিজের দিকে এগোল কিন্তু মাঝ পথেই থমকে গেল সে। ফ্রিজের ঠিক সামনেই অনেকটা অন্ধকার যেন স্তূপ হয়ে আছে। ভাল করে খেয়াল করতেই সভয়ে দেখল সে, কুণ্ডলী পাকিয়ে মস্ত ফণা তুলে আছে এক সাপ। কালো কুটকুটে, ওর দিকে চেয়ে অল্প অল্প দুলছে। মূর্তিমান বিভীষিকা চোখের সামনে দেখে রক্ত হিম করা চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল রেখা।

সব শুনে চিন্তায় কাজলের বুক হিম হয়ে গেল। সবখানে খুঁজেও সাপের ছায়াও দেখা গেল না। বুয়াকে ডেকে ধমকালো সবাই। ওষুধ দিয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করায় বিড়বিড় করে কী বলল বোঝা গেল না। আবার অ্যাসিড এনে দিল কাজল এবং যথারীতি বুয়াকে ঘুষ দিয়ে সেটাও ফেলে দেয়ার ব্যবস্থা করল কামিনী।

ফুপু ফিরে এসেছেন। ঘটনা শুনে সন্দেহ করলেন যে এটা সত্যিকারের সাপ নয়, হয়তো কোনও দুষ্টু জিনের কারবার। তিনি দোয়াদরুদ পড়া বাড়িয়ে দিলেন। সেদিন দুপুরে, খেয়েদেয়ে যার যার ঘরে বিশ্রাম করছে সবাই—কাজলও আছে। হঠাৎ রান্নাঘর থেকে ফুপুর আর্তচিৎকারে সবাই দৌড়ে এল, দেখল, রান্নাঘরের দরজার কাছে বুয়া অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, আর ফুপু মেঝেতে পড়ে ছটফট করছেন, মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে। কাজলই নিজেকে সংবরণ করল আগে। রেখাকে হাসপাতালে ফোন করতে বলে দ্রুত ফুপুকে এসে ধরল। কাজলের দিকে চেয়ে ফুপু প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন কিছু বলার জন্য, পারলেন না।

ফুপুকে বাঁচানো গেল না। পথেই শেষ। সমস্ত শরীর কালো হয়ে গেছে সাপের কামড়ে। বুয়ার জ্ঞান ফেরেনি—তাকে আলাদা কেবিনে বিশেষ কেয়ারে রাখা হলো। সবাই ভেঙে পড়ল। এমন অদ্ভুত, অপ্রত্যাশিত ব্যাপার কেউ যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। মাকে সামলানো মুস্কিল হলো। আর কামিনীর শোক যেন সবাইকে ছাড়িয়ে গেল। সবার জন্য প্রাণপণ করল সে। কিন্তু কী জানি কেন, রেখা আর সহ্য করতে পারে না কামিনীকে। এই অপয়া মেয়েটা আসার পর থেকেই যত অশুভ কাণ্ড ঘটে চলেছে। রেখা কাজলের সাথে কথা বলে মাকে মামার কাছে রেখে এল। সবার মাঝে থাকলে ভাল থাকবেন—রেখার নিজের অবস্থাও ভাল নয়—মাকে ঠিকমত যত্ন করতে পারবে না। কামিনী মাকে যেতে দিতে চায়নি, কিন্তু রেখা, ওর কথায় কর্ণপাত করেনি। আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল তার—বুয়ার জ্ঞান ফেরার অপেক্ষায় আছে—তাকে শুনতেই হবে, কী দেখে সে জ্ঞান হারিয়েছিল এবং ফুপুরই বা কি হয়েছিল। বুয়ার বিছানার কাছে চেয়ার পেতে বসে রইল—কাজলকেও সে বাড়িতে যেতে দিল না। অপেক্ষা করতে করতে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল রেখা, বুয়ার চিৎকারে ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে জেগে দেখে বিশাল এক সাপ জানালা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে।

বুয়ার মাত্র জ্ঞান ফিরছিল, এই সময়ই ছোবল খেয়েছে সে। লাফিয়ে এসে বুয়ার ওপর ঝুঁকে পড়ল রেখা। দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে বুয়ার জীবনীশক্তি। কোনওমতে হাঁপাতে হাঁপাতে সে কিছু কথা বলল রেখাকে, তারপরই ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে।

নির্বাক রেখা বসে রইল বুয়ার পাশে।

কাজল এসে সযত্নে বোনকে ধরে ধরে নিয়ে এল নিজের অফিস ঘরে। ঠাণ্ডা পানি খাওয়াল, তারপর চুপ করে বোনের হাত ধরে নিস্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকল।

কিছুক্ষণ পরে বিস্ময়ের সুরে বলে উঠল কাজল, 'আশ্চর্য, সবাই সাপের কামড়ে মারা যাচ্ছে! সাপটা আসছে কোথা থেকে? একটাই না অনেকগুলো? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

কেঁপে উঠল রেখা—তারপর শান্ত, ঠাণ্ডা সুরে বলল, 'অনেকগুলো নয়—একটাই—এবং সেটাকে তুমিই বয়ে এনেছ।'

কাজলের বিস্মিত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থেকে রেখা বলল, 'হ্যাঁ, ভাইয়া, ওই মিষ্টি, লক্ষ্মী মেয়ে কামিনীই সাপ—বিষাক্ত ভয়াল এক হিংস্র নাগিনী। ইচ্ছা মত যে মানুষের রূপ ধরে, নিজের অজান্তেই এই আজরাইলকে সাথে করে নিয়ে এসেছ।'

কী যেন বলতে গেল কাজল, বাধা দিয়ে রেখা বলল, 'সবটা শোনো আগে। আমিও এসব কিছু বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু এমন সব প্রমাণ আমি জেনেছি যে, তুমিও আর অবিশ্বাস করবে না। প্রথম বুয়ার মেয়ে দেখে ফেলেছিল ওর আসল রূপ, তাই তাকে মরতে হয়েছিল। মারা যাওয়ার আগে এই বুয়া আমাকে কিছু বলে গেছে—যাতে আরও নিঃসন্দেহ হয়েছি আমি।'

কাজল বিষণ্ন মলিন চেহারায় বসে শুনল। রেখার কথা অবিশ্বাস করার প্রশ্নই আসে না।

রেখা বলে গেল কী শুনেছিল সে।

'সেদিন দুপুরে কোনও এক কাজে রান্নাঘরে যেয়ে ফুপু দেখেন, কামিনী দুধের হাঁড়ি থেকে দুধ খাচ্ছে। বুক পর্যন্ত কামিনীই ছিল সে, কিন্তু গলা থেকে মাথা পর্যন্ত মস্ত এক সাপের। ফণা নামিয়ে হাঁড়ি থেকে চুকচুক করে দুধ খাচ্ছে। ফুপু চিৎকার করতেই কামিনী ফুপুকে দেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোবল দেয়। সবটা ব্যাপারই বুয়া দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখে অজ্ঞান হয়ে যায়। ওকেও তখনি মেরে ফেলত কিন্তু আমরা সবাই চলে আসাতে সুযোগ পায়নি। জ্ঞান ফিরে পেলে বুয়া সব বলে দেবে এইজন্য আজ এখানে ওকে মেরে রেখে গেল।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল কাজল—অবাস্তব এক রূপকথা যেন।

'জানো, ভাইয়া, আমি তো ওর কাছেই শুতাম, কেমন যেন বোটকা, আঁশটে একটা গন্ধ পেতাম ওর শরীর থেকে, আর অসম্ভব ঠাণ্ডা ছিল ওর শরীর। স্পর্শ করলেই টের পেতাম বরফের মত হয়ে থাকত দেহ। খটকা লেগেছিল আমার প্রথম ওর খাওয়া দেখে। রান্না করা খাবার কখনোই খেতে পছন্দ করত না। দুধই খেত বেশির ভাগ আর লুকিয়ে খেত রাতে, ফ্রিজের কাঁচা মাছ মাংস, যেটা দেখেছিল বুয়ার মেয়ে। আর আমি? ওইদিন রাতে ফ্রিজের কাছে ওই শয়তানীকেই দেখেছিলাম। অনেক কিছু নিজের কাছেই পরিষ্কার ছিল না। তাই আগে কিছুই বলিনি।'

অনেকক্ষণ কথা বলে ক্লান্ত হয়ে চুপ করল রেখা। কী বলবে কাজল? এতকিছু

শোনার পর অস্বীকার করবে কীভাবে? মনে পড়ল, মিষ্টি মুখটির দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়েছিল প্রথমদিন—নিজের অজান্তেই দুর্বল হয়ে পড়ছিল সে কালো কন্যার প্রতি। দুধকলা দিয়ে কাল সাপ পুষেছিল তারা এতদিন। অতি দুঃখেও হাসি পেল তার এই কথাটি মনে করে।

এখন এই জীবন্ত বিভীষিকার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় কী? ভাগ্যিস মাকে মামার কাছে রেখে এসেছিল। কী ভয়াবহ বিপদের মধ্যে আছে ওরা সবাই। যদি কামিনী জানতে পারে যে সব জানাজানি হয়ে গেছে, তা হলে কারোই রেহাই নেই। চিন্তিত কাজল বলল, 'কী করা যায় এখন? কাউকে তো কিছু বলতেও পারব না—যা করার নিজেদেরই করতে হবে, যে ভাবেই হোক কাল নাগিনীকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।'

মাথা নেড়ে সায় দিল রেখা, আর একটা কথা মনে পড়ল রেখার। বুয়াকে টাকার লোভ দেখিয়ে অ্যাসিডের শিশি ফেলে দেওয়াতো কামিনী। শুনে আফসোস করল কাজল। তখন যদি বলত বুয়া! তার লোভের মূল্য সে একা নয় আরও দুজন দিল। ফুপুর কথা মনে হতে বুকের মধ্যে হাহাকার করে উঠল। আগুন, কার্বলিক অ্যাসিড ইত্যাদি দারুণ ভয় করে সাপেরা। পিস্তল দিয়েও গুলি করে মারা যায়, কিন্তু অস্ত্র পাবে কোথায়?

ভেবে ভেবে বুদ্ধি একটা ঠিক করল ওরা। বাসায় ফোন করল রেখা। কামিনী তখন খালি বাড়ি পেয়ে মনের আনন্দে কাঁচা মাছ, মাংস খেয়ে চলেছে আর হাসছে—মানুষগুলো কী বোকা—দিব্যি ওর বানানো কাহিনি বিশ্বাস করে একদম নিজেদের বুকে আশ্রয় দিল! ক্রূর হাসল নাগিনী—এক এক করে বাকিগুলোর বুকেও ছোবল বসাবে—শেষ করবে সব কটাকে—বাড়িতে কেউ নেই তাই স্বরূপেই অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

এমন সময় ফোন বাজল—বিরক্ত হয়ে লেজটা দিয়ে রিসিভার পেঁচিয়ে নিয়ে আগে উপরের অংশটুকু কামিনীতে পরিণত করল, নইলে কানে শুনতে পাবে না—কানের কাছে রিসিভার নিতেই রেখার গলা ভেসে এল : 'হ্যালো? কে, কামিনী? এখনি একবার হাসপাতালে আসতে পারবে? মায়ের শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে যাওয়াতে ভর্তি করতে হয়েছে। তুমি থাকতে পারবে না কিছুক্ষণ? আমি বাসায় এসে গোসল করে একটু ফ্রেশ হয়ে নিতাম?

'আসছ? আচ্ছা, ঠিক আছে, রাখছি এখন।'

মনের আনন্দে লকলকে চেরা জিভ বের করে ভয়াল হাসি হাসল কামিনী। ভালই হয়েছে, হাসপাতালে যেয়ে আগে বুড়িটাকে মারবে, তারপর এসে রেখাকে ধরতে হবে। ভাল হতো এ-পরিবারে থেকে যেতে পারলে, কিন্তু মানুষ নামের চিরশত্রুদের যে খুন তার না করলেই নয়। স্বভাব যায় না মরলে। তারপর কাজল, আহা ওকে মারতে একটু কষ্টই লাগবে তার। মনে হচ্ছে ভালবেসে ফেলেছে? খিলখিল করে হেসে ফেলল কামিনী। সাপেদের ভালবাসা আর শিয়ালের মুরগী পোষা একই জিনিস। হায়, সাপ থেকে মানুষ হতে পারি আমি, কিন্তু মানুষকে তো সাপ বানাবার বিদ্যা আমার জানা নেই! তা হলে বেশ হত—কাজলও সাপ হয়ে যেত—কামিনী কাজল—কাজল কামিনী—ঈস নামেও কি সুন্দর ছন্দ এসে যাচ্ছে!

নাচতে নাচতে কামিনী এল হাসপাতালে।

কেবিনের বাইরে মুখ শুকনো করে বসে আছে রেখা। কামিনীকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল, 'কোথায় মা?' এটুকুই বলতে পারল কামিনী।

দরজার আড়ালে হাতে মোটা গ্লাভস পরে তৈরিই ছিল কাজল, কামিনী ঢুকতেই শরীরের সব শক্তি দিয়ে ক্ষিপ্র হাতে অপারেশন করার বড় ধারাল ছুরিটার কোপে কামিনীর গলা কেটে ফেলল। দক্ষ সার্জেন সে, এক পোঁচেই নিখুঁত ভাবে কাজটা সারতে পারল। তারপর ছুরিটা ফেলে দিয়েই দ্রুত অ্যাসিডের বোতল খুলে কামিনীর শরীরে পুরোটা ঢেলে দিল।

মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে তখন কামিনী। না, কামিনী নয়, মানুষের শরীর মিলিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে সাপের রূপ নিচ্ছে। পাগলের মত অ্যাসিডের পর অ্যাসিড ঢেলে যাচ্ছে কাজল। বিশাল ফণাটার ওপর আর দীর্ঘ কালো ছিপছিপে শরীরটার ওপর।

ধীরে ধীরে ঝলসে, পুড়ে, কুঁচকে গেল পুরো সাপটা। ভাইবোন দুজনে দুজনকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে দম আটকে বীভৎস দৃশ্যটা দেখল। ভয়ঙ্কর নাগিনীর মৃত্যুর সাথে সাথেই যেন এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন মিলিয়ে গেল। তারপর রেখার আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরতেই রেখা দেখল, হাসি মুখে কাজল বসে আছে ওর পাশে। বোনের চোখের পানি সযত্নে মুছিয়ে দিয়ে আবার হাসল কাজল। রেখাও হাসল। পরম নিশ্চিন্তের নির্মল হাসি। আর কোনও ভয় নেই। বিপদমুক্ত এখন ওরা।

নাজনীন রহমান

দুঃস্বপ্নের রাত

আমরা তখন থাকতাম লুডলো নামের এক জায়গায়। দাদু, মানে রেজিনাল্ড ইস্টনও তখন আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। যে বাড়িতে আমরা থাকতাম সেটার নাম ছিল ডিনহ্যাম হল। সে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের কথা। যতোদূর মনে পড়ে আঠারোশো নব্বুই সাল তখন।

দাদু আমার পাশের ঘরেই থাকতেন। ঘর দুটোর মাঝখানে একটা দরজা ছিল। ইচ্ছে করলে বারান্দা হয়ে না ঢুকেও পাশের ঘরে যাওয়া যেত।

একদিন 'আর্থার! আর্থার!' ডাক শুনে রাতে ঘুম ভেঙে গেল। দাদুর গলা চিনতে পারলাম। বুড়ো মানুষ, ভাবলাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন কিনা।

পাশের ঘরে ছুটে গেলাম। দাদু বিছানায় উঠে বসে আছেন। ফ্যাকাসে চেহারা, দেহ কাঁপছে মৃদু মৃদু। অত্যন্ত বিচলিত মনে হচ্ছে তাঁকে।

উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে, দাদু?'

'ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল,' কাঁপা গলায় জানালেন দাদু।

'কি স্বপ্ন দেখেছেন?'

'থাক, বাদ দে ওকথা,' চেপে যেতে চাইলেন দাদু।

আমিও তাঁকে চেপেই ধরলাম। 'না; বলো না, দাদু।'

আমার কৌতূহল তীব্র দেখে দাদু তাঁর কাহিনি শুরু করলেন।

'স্বপ্নে দেখলাম আমি স্ট্যাফোর্ডশায়ারের এক বাড়িতে আছি পুরোনো এক বন্ধুর সঙ্গে। বাড়িটার নাম ব্রীড হল। রোদ ঝলমলে এক সকালে ঘুরতে বেরিয়েছি, সবুজ মনোরম পার্কের ভেতর দিয়ে চলেছি গ্রামের প্রাচীন গির্জাটার দিকে। একসময় গির্জার এলাকায় প্রবেশ করলাম। চারধারে সমাধিস্তম্ভ আর সমাধিপ্রস্তর ফলক। ওগুলোর মাঝ দিয়ে যাওয়া পথ ধরে আমি এগিয়ে চললাম, পথ শেষে উঠে পড়লাম গির্জার পুরোনো বারান্দায়। ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময়ে গির্জার ঘণ্টী বেজে উঠল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এ তো মানুষ মারা যাবার কথা জানানোর ঘণ্টা। দেখলাম বড়সড় একদল লোক এগিয়ে আসছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজ সারতে আসছে লোকগুলো। গির্জার ভেতরে আর ঢুকলাম না আমি, ভাবলাম আনুষ্ঠানিকতা যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ আমি বরং সমাধিপ্রস্তরগুলোই দেখি না বরং। বিরক্তিকর অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার ইচ্ছে হলো না। সমাধিপ্রস্তরের নাম, মৃত্যুর তারিখ আর বয়স দেখতে দেখতেই কেটে যাবে সময়টুকু।

'কাছে চলে এসেছে ততক্ষণে শবযাত্রীরা। পুরোনো বারান্দার দিকেই আসছে। পৌঁছে গেছে প্রায়। কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস না করে পারলাম না একজনকে। "মারা গিয়েছেন কে?"

'না থেমেই জবাব দিল শোকার্ত লোকটা, "মিস্টার মঙ্কটন।"

'এবার তাকে থামতে হলো। নামটা পরিচিত মনে হওয়ায় আমি আবার জিজ্ঞেস করেছি, "বলুন তো কোথায় থাকতেন তিনি?"

"সামারফোর্ড হলে," বলে পা বাড়াল লোকটা।

'মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সামারফোর্ড হলের মঙ্কটন তো আমার বন্ধু! এখান থেকে বেশি দূরে নয় ওর বাড়ি। খারাপ হয়ে গেল মনটা। স্বাভাবিক। হওয়ারই কথা। মঙ্কটন ছিল আমার আশৈশব বন্ধু।

'ঠিক করলাম এভাবে খামোকা ঘোরাঘুরি বাদ দিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেব। শবযাত্রীদের সঙ্গে গির্জায় প্রবেশ করলাম, বসলাম পেছনের একটা খালি আসনে।

'গির্জার পুবদিকে চ্যান্সেল, স্বাভাবিক ভাবেই তার ওপর কফিনটা রাখা হলো। আচার অনুষ্ঠান বেশিরভাগ দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল। এবার আত্মার মুক্তির জন্যে প্রার্থনা শেষে কফিন কবরের দিকে রওনা হবে। গির্জার বেঁটে মতো এক কর্মচারী এসময়ে এগিয়ে এলো আমার দিকে। বুড়ো লোক। চেহারাটা এমনই যে গা ঘিনঘিন করে ওঠে। কি যেন একটা অস্বাভাবিকতা আছে তার মধ্যে। বলল, "যতদূর জানি আপনি মিস্টার মঙ্কটনের সবচেয়ে পুরোনো বন্ধু। আপনারই উচিত শবযাত্রার অগ্রভাগে থাকা। শোক মিছিল গির্জার তলার সমাধিক্ষেত্রে যাবে। আপনি রাজি থাকলে আপনাকেই শোক মিছিলের নেতা করা হবে। আপনি রাজি তো?"

'কথাগুলো এমন ভাবে বলা হলো যে মানা করতে পারলাম না।

'মৃতের আত্মিক মুক্তির প্রার্থনা শেষ হয়ে গেল। যাজকের চেহারা দেখে আমার মনে হলো একটা শুকনো আপেলের মুখে প্রার্থনা শুনলাম। সে যাই হোক, এবার শুরু হলো অন্তিমযাত্রা। চারজন লোক কফিনটা কাঁধে তুলে নিল। ওরাই লাশ কবরস্থানে নিয়ে যাবে।

'গির্জার সেই বুড়ো লোকটা আবার এগিয়ে এলো আমার দিকে, আমাকে পথ দেখাল। সামনে সামনে যেতে হবে আমাকে।

'কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নামতেই মাথা নিচু করতে হলো আমাকে, ছাদটা খুবই নিচু। অস্বস্তিকর। কবরস্থানের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় শরীর আরও বাঁকাতে হলো। ঢুকে পড়লাম কষ্টেসৃষ্টে।

'ভূগর্ভস্থ সমাধির ভেতরে এক জায়গায় উঁচু একটা প্ল্যাটফর্ম। সেটার ওপরই কিছু বিশেষ কফিন রাখা হয়। ওই প্ল্যাটফর্মে মঙ্কটনের পূর্বসুরিদের কফিনও আছে। কোন কোন কফিনের তক্তা বয়সের ভারে খুলে গেছে, ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কঙ্কালের অংশ বিশেষ।

'কফিনটা নামিয়ে রাখার পর সবাই বেরিয়ে যেতে শুরু করল। আগে আমি ছিলাম দলের সামনে, এবার দলের শেষে। পা বাড়ালাম দরজাটার দিকে। গির্জার সেই বেঁটে কর্মচারী আমার পাশে চলে এলো। হঠাৎ করে আমাকে ধাক্কা মারল শয়তানটা। শবযাত্রী দলের প্রধান হওয়ায় আমাকে যে টর্চটা দেয়া হয়েছিল সেটা ছিটকে কাদাময় ভেজা মাটিতে পড়ে নিভে গেল, কোনমতে তাল সামলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম।

'এক ছুটে চলে গেল বদমাশটা। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল সমাধিক্ষেত্র থেকে বের হওয়ার দরজা। ক্লিক করে একটা আওয়াজ হলো। তালা লাগিয়ে আমাকে এখানে আটকে ফেলেছে হারামিটা! আমার অবস্থা তখন সঙ্গীন। ভয়ে আতঙ্কে আমি অস্থির। কঙ্কাল আর লাশগুলোর সঙ্গে আমি এখানে একদম একা! অন্ধকারে দরজা লক্ষ্য করে ছুটে গেলাম। ঠকাশ করে মাথাটা ঠুকে গেল দরজার পাল্লায়। দরজায় ধাক্কা দিলাম, চিৎকার করতে শুরু করলাম, সাহায্য চেয়ে। "দরজাটা খুলুন! দরজা খুলুন! আমি ভেতরে আটকা পড়ে গিয়েছি!"

'সাড়া দিল না কেউ।

'হতাশ হয়ে ধাক্কাধাক্কি বন্ধ করে দিলাম। এক ঘণ্টা কেটে গেল সেই গোরস্থানে। অন্ধকার! কি ভীষণ অন্ধকার সেখানে! মনে হলো এক যুগ হলো এখানে আটকা পড়ে আছি। আস্তে আস্তে চোখে আঁধার সয়ে এলো, দেখতে শুরু করলাম। অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পেলাম প্ল্যাটফর্মটা। ওটার ওপর কফিনগুলোও দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ একটা আওয়াজে কান ফেটে যাওয়ার জোগাড় হলো এই নীরবতায়। চমকে উঠলাম। কি যেন ভেঙে যাচ্ছে! ফেটে বেরোচ্ছে কি যেন! নাকি কোন দরজা খোলা হচ্ছে?

'স্বস্তির পরশ পেলাম বুকে। যাক, শেষ পর্যন্ত কেউ বুঝেছে যে আমি এখানে আটকা পড়েছি। এবার মুক্তি মিলবে।

'কিন্তু আমার স্বস্তি বেশিক্ষণ থাকল না। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, দরজা খুলছে না, আওয়াজটা আসছে এই মাত্র রেখে যাওয়া কফিনের ভেতর থেকে। ফেটে যাচ্ছে ওটা, তক্তাগুলো খুলে খুলে আসছে!

'তীক্ষ্ণ চোখে কফিনটার দিকে তাকালাম, মাথার চুল সব দাঁড়িয়ে গেছে আমার তখন। ঠিকই ধরেছি। ওই কফিনটাই! তক্তা ফেটে ফাঁক বড় হচ্ছে! সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করল বুড়ো মঙ্কটনের লাশ! পুরো দেহ, পচা, গলিত, দুর্গন্ধযুক্ত, বেরিয়ে আসছে!

'বেরিয়ে এসে কফিনটার পাশে দাঁড়াল মুহূর্ত খানেকের জন্যে, তারপর পা বাড়াল আমার দিকে। টলোমলো পায়ে আসছে! আমাকে ধরবে!

'পাগলের মতো ছুটোছুটি শুরু করলাম, কিছুতেই জীবন্ত ওই মৃতদেহের হাতে মরতে পারব না। বারবার লাশটাকে ফাঁকি দিলাম। কিন্তু কতক্ষণ দম থাকে? এক সময় আমার নাগাল পেয়ে গেল মঙ্কটনের লাশ।

'আতঙ্কে মাটিতে পড়ে গেলাম আমি। লাশটাও হুড়মুড় করে আমার গায়ের ওপর পড়ল। আমার দু'গালে নখ বসাচ্ছে লাশটা। গাল টেনে ছিঁড়ে ফেলছে। ব্যথায় চিৎকার করতে চাইলাম, কিন্তু আতঙ্কে তখন রুদ্ধ হয়ে গেছে আমার গলা, কোন আওয়াজ বের হলো না।

'ছাড়া পাবার জন্যে ঝটকাঝটকি করে বুঝলাম কোন লাভ নেই। জীবন্ত সমাধি তো আগেই হয়েছে, এবার প্রেতের হাতে মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ নেই।

'বুক চিরে হঠাৎ বেরিয়ে এলো বিকট আর্তনাদ। আর সেই আর্তনাদেই ঘুম ভেঙে গেল আমার।

'ঘুম থেকে উঠে দেখি কবরস্থানের ভেতর নয়, নিজের বিছানায় শুয়ে আছি।

সারা শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছে। শেষ রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে ঘাম শুকিয়েছে। ভয় লাগছিল একা একা, তাই তোকে ডাক দিলাম, যদি সঙ্গে থাকিস তো ভয় কম লাগবে।' একটু আফসোস করেই দাদু বললেন, 'আমার জন্যে তোর ঘুম হলো না।'

আমি মাথা নাড়লাম। যে দারুণ গল্প শুনতে পেলাম তার কাছে ঘুম তো সে তুলনায় কিছুই না।

পরদিন দাদুর কাছে খবর এলো, তাঁর বাল্য বন্ধু মিস্টার মঙ্কটন মারা গিয়েছেন। রাতে দাদু যখন দুঃস্বপ্নটা দেখেন তখনই মারা গেছেন মঙ্কটন! খবর এলো সেই স্বপ্নে দেখা গির্জাতেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন হয়েছে। দাদুকে করা হয়েছে শোক মিছিলের নেতা।

স্বপ্ন আবার সত্যি হবে না তো!

মূল: লর্ড হ্যালিফ্যাক্স
রূপান্তর: কাজী মায়মুর হোসেন

নতুন অতিথি

শরৎ আবার ফিরে এসেছে। মার্টিন বিছানায়। অসুস্থ। টরি, তার প্রিয় কুকুর, এইমাত্র তার রুমে ঢুকেছে। টরির শরীরে শরতের ঘ্রাণ। তার শরীরের এখানে-ওখানে লেগে আছে মচমচে শুকনো ঝরাপাতা। তাই মার্টিন জেনে গেছে যে, শরৎ এসেছে।

মার্টিন বিছানা থেকে উঠল। মলিন একটা হাত বাড়িয়ে দিল টরির দিকে। টরি সেটা চাটতে লাগল, যেন মার্টিনের হাতটা একটা ললিপপ। টরি লাফ দিয়ে বিছানায় উঠল।

'নীচে নাম,' বলল মার্টিন। 'মা দেখলে আর বলতে হবে না।' টরি মার্টিনের কান চাটতে লাগল। তখন মার্টিন বলল, 'ঠিক আছে। তবে অল্প সময়ের জন্য।' টরির গরম শরীর মার্টিনের শরীরটাকেও গরম করে তুলল। মার্টিন বুঝতে পারল, টরির শরীরটা যেন ঝরাপাতার মত পরিষ্কার। কুকুরটার যেন নবজন্ম হয়েছে। মনে হচ্ছে, টরি শরতের পেটের ভিতর থেকে বের হয়ে এসেছে। মার্টিন তার মা'র বকুনির কথা ভুলে গেল।

'বাইরের অবস্থা কেমন, টরি?'

শুয়ে শুয়ে টরি সব বলল। শুয়ে শুয়ে মার্টিন সব শুনল। শুনল মানে অনুভব করল। আগের শরতে সে সুস্থ ছিল। তাই এবার টরির মাধ্যমে সে সব জানতে পারল। বাইরের সাথে যোগাযোগের একমাত্র সূত্র হচ্ছে টরি। কারণ সে তো আর বাইরে যেতে পারে না।

'আজ কোথায় গিয়েছিলি, টরি?' টরিকে মুখ খুলে কিছু বলতে হয় না। সেটা সে পারেও না। কিন্তু মার্টিন সব জানতে পারল। পাহাড়ের পাদদেশে যেখানে পড়ে থাকে ঝরাপাতা আর যার উপর দিয়ে শহরের দুষ্ট ছেলেরা সাইকেল চালিয়ে যায়, সেখানে গিয়েছিল টরি। তারপর শহরে যেখানে ধোয়াসে অন্ধকারের মত বৃষ্টি পড়েছিল, সেখানেও গিয়েছিল টরি।

আর টরি যেখানে যায়, মার্টিনও সেখানে যায়। কারণ টরি ফিরে এলে, অনুভবে, স্পর্শে আর ভালবাসায় সব জানতে পারে মার্টিন। টরি যেন এখন মার্টিনের স্বর্গদূত। তাকে এনে দেয় সব খবর।

মায়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল নীচ থেকে। রেগে আছেন তিনি—উপরে উঠে আসছেন। সিঁড়িতে তাঁর পায়ের শব্দ। সাথে সাথে টরি লুকাল বিছানার নীচে। দরজা খুলে প্রবেশ করলেন মার্টিনের মা। হাতে একটা ট্রে। ট্রেতে রয়েছে কেক, ফলের রস আর সালাদ। ট্রেটা বিছানার উপর রেখে এদিক-ওদিক তাকালেন তিনি।

'টরি কি এখানে এসেছিল?' জানতে চাইলেন তিনি। 'কুকুরটা ইদানীং বেশ ঝামেলা শুরু করেছে।'

মার্টিনের গলা শুকিয়ে গেল। বিছানার নীচে টরি লেজ নাড়া বন্ধ করল।

'সব সময় জিনিসপত্র ওলট-পালট করছে। মানুষের বাগানে গর্ত খুঁড়ছে। আজ সকালে সে গিয়েছিল মিস টারকিনের বাগানে। সেখানে একটা বিরাট গর্ত খুঁড়ে এসেছে। মিস টারকিন তো প্রায় পাগলের মত হয়ে আছেন। টরিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমার সোজা কথা, সে যদি কারও বাগানে আবার গর্ত খুঁড়ে, তা হলে তাকে আমি বাড়িতে ঢুকতে দেব না। এ আমার শেষ কথা।' বলে চলে গেলেন তিনি।

টরি লাফ দিয়ে আবার বিছানায় উঠল। মার্টিন টরির গলার পশমে হাত বুলিয়ে আদর করল। তারপর একটা চারকোনা কাগজ তার গলার কলারে ঝুলিয়ে দিল। সেখানে লেখা আছে: 'আমার নাম টরি। আমার মনিব অসুস্থ। আপনারা কি তাকে একবার দেখতে যাবেন? গেলে আমাকে অনুসরণ করুন।'

এতে কাজ হয়। প্রতিদিন এই কাগজটা নিয়ে বের হয় টরি। কিছু ভালমানুষ এখনও আছেন। কারণ এর আগে মার্টিনকে দেখতে বেশ কয়েকজন এসেছিল।

কান পাতলে শোনা যাবে টরি ছুটছে রাস্তা দিয়ে। সন্ধান করছে মার্টিনের জন্য অতিথি। মার্টিনের গায়ে জ্বর, তবুও সে উঠে বসল। তার মন চলে গেছে টরির কাছে। গতকাল মিস হলওয়ে এসেছিলেন মার্টিনকে দেখার জন্য। সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন মার্টিনের জন্য একটা গল্পের বই। আগের দিন টরি বসেছিল মি. জেকবের সামনে। মি. জেকব চোখে কম দেখেন। তাই তিনি বসে কাগজের লেখাটা পড়েছিলেন। টরিকে অনুসরণ করে এসেছিলেন মার্টিনের সাথে দেখা করার জন্য। সাথে নিয়ে এসেছিলেন অনেকগুলো খেলনা।

এখন ঝাপসা দুপুর। মার্টিন শুনতে পেল টরির ছোটার শব্দ। ঘেউ ঘেউ করছে আর দৌড়াচ্ছে। সেই সাথে কানে এল আরেকজনের পায়ের আওয়াজ। কেউ একজন বাড়ির বেলটা টিপল। মার্টিনের মা দরজাটা খুলে দিলেন। শোনা গেল কণ্ঠস্বর। টরি ছুটে এসে মার্টিনের বিছানায় উঠল। মার্টিনের চেহারা খুশিতে ঝলমল করছে। কারণ টরি আজ তার জন্য আরেকজন অতিথি নিয়ে এসেছে।

অতিথি তার মা'র সাথে কথা বলতে বলতে উপরে উঠে আসছেন। এবারের অতিথি একজন মহিলা, বয়স কম। কথা বলার সময় বার বার হাসছেন, মার্টিনের মা-ও হাসছেন। দরজা খুলে প্রবেশ করলেন তার মা ও অতিথি।

চতুর্থ দিন টরি নিয়ে এল মিস হাইটকে। মহিলার চুল সোনালী এবং উজ্জ্বল। কথা বলেন আস্তে আস্তে। থাকেন পার্ক স্ট্রীটের বড় দালানটায়। এ নিয়ে তিনি মোট তিনবার মার্টিনকে দেখতে এলেন। এখন তিনি মার্টিনের পরিবারের একজন বন্ধু হয়ে গেছেন। এখন মার্টিনের খোঁজ-খবর নিয়ে তার মা'র সাথেই বেশি গল্প করেন। এতে মার্টিনের কোন আপত্তি নেই।

এক সপ্তাহ পর মার্টিনের মা জানালেন, মিস হাইট গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। কথাটা শুনে মার্টিন টরিকে জড়িয়ে ধরল। মনে পড়ে গেল মিস হাইটের সোনালী চুল, তাঁর সুন্দর হাসি, তাঁর বলা মানুষের অসংখ্য গল্প। তিনি মারা গেছেন। তিনি আর আসবেন না। ব্যাপারটা কেমন জানি ধাঁধার মত মনে হলো

মার্টিনের কাছে। তার মেজাজটাও খারাপ হয়ে গেল।

'মানুষ মারা গেলে, কবরে কী করে, মা?'

'কিছুই করে না,' তার মা উত্তর দিলেন।

'কিছুই করে না!' মার্টিনের চোখেমুখে বিস্ময়।

'শুয়ে থাকে।'

'শুধুই শুয়ে থাকে?'

'হ্যাঁ।'

'শুধু শুধু শুয়ে থাকে কেন মা? শুয়ে থাকার মাঝে কোন মজা নেই।'

'মানুষ কবরে মজা করার জন্য যায় না।'

'তারা কবর থেকে বের হয়ে আসতে পারে না?'

এবার মায়ের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'অনেক হয়েছে, এবার থাম।'

'মা, আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম,' বলল মার্টিন।

'অনেক হয়েছে। আর জানার দরকার নেই।'

'আমার মনে হয় সৃষ্টিকর্তা খুব খারাপ।'

'মার্টিন!' ধমক লাগালেন তিনি।

মার্টিন চুপ করল কিন্তু বিষণ্ণতায় ভরে গেল মন। মানুষ যদি একবার জন্ম নেয়, তা হলে তাকে মারার কী দরকার? সৃষ্টিকর্তার এই হেঁয়ালি মার্টিন বুঝতে পারল না।

এরপর সবকিছু যেন বদলে গেল। যুদ্ধ এসে গেল। ব্যস্ত হয়ে পড়ল মানুষ। একটা কুকুরের কাকুতি-মিনতি কেউ শুনল না, দেখল না। ঘটনা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে মার্টিনেরও তেমন ভাবনা ছিল না। টরিও বদলে গেল। তার চোখে এখন উদাসীন দৃষ্টি। এই পৃথিবীর প্রতি তার যেন কোন আগ্রহ নেই। মার্টিন ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। টরি কি তা হলে অসুস্থ? টরি এখন বাইরে গেলে সাথে করে নিয়ে আসে না কোনও অতিথি। দরকার নেই আর কোনও অতিথির। টরি ঠিক থাকলে সব ঠিক। ভাবল মার্টিন।

তারপর ঘটল সেই অচিন্তনীয় ঘটনা। টরি আর ফিরে এল না। প্রথম মার্টিন অপেক্ষা করল শান্তভাবে, তারপর অস্থিরভাবে। শেষমেশ তার দুশ্চিন্তার কোন সীমা থাকল না। দুপুরের খাবারের সময় তার বাবা-মা টরিকে বেশ কয়েকবার ডাকলেন। কিন্তু টরি এল না। টরি চলে গেছে—হয়তো চিরকালের জন্য।

জানালার পাশ দিয়ে ঝরাপাতা পড়তে লাগল। মার্টিন তার বালিশের মাঝে ডুবে গেল। বুকের মাঝখানে জমা হতে লাগল গভীর এক দীর্ঘশ্বাস। পৃথিবী মরে গেছে। শরৎও আর নেই। পৃথিবী আর শরতের খবর আনার জন্য স্বর্গদূত টরি আর নেই। তাই মার্টিনের কাছে সব থেকেও নেই। শীত আসবে না, কারণ টরির পায়ে লেগে থাকবে না বরফ। সভ্যতার কষাঘাতে হারিয়ে গেছে মার্টিনের টরি, হয়তো সে গাড়িতে চাপা পড়েছে, হয়তো কেউ তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। অথবা কোন নিষ্ঠুর মানুষ তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে। তাই টরি আর ফিরে

আসবে না। মার্টিন এই বিশাল পৃথিবীতে একা হয়ে গেল।

নভেম্বর মাসের টানা তিনদিন মার্টিন সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে সময় কাটাল। সেখানে পরিবর্তন ঘটল আলো আর ছায়ার। দিন ছোট হয়ে আসছে। এখন অল্পতেই অন্ধকার নামে। মার্টিন জানালার বাইরে তাকিয়ে এ সব বুঝতে পারে। গাছের পাতা ঝরতে লাগল। শরতের বাতাস, মেজাজ আর তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটতে লাগল। কিন্তু মার্টিন ভুলতে পারছে না টরির কথা।

শুক্রবার রাতে মার্টিনের বাবা-মা সিনেমা দেখার জন্য বাইরে গেলেন। মার্টিনকে দেখাশুনার জন্য রেখে গেলেন মিস টারকিনকে, কারণ তাঁরা রাত এগারোটার আগে ফিরবেন না। মিস টারকিন কিছুক্ষণ বসে থাকল। তারপর মার্টিন জানাল তার ঘুম পাচ্ছে। ফলে মিস টারকিন বিদায় নিল।

নীরবতা। আকাশে নক্ষত্রের মেলা। চাঁদের ভরাট আলো চারদিক। মার্টিন শুয়ে আছে বিছানায়। তার ঘুম আসছে না—কান খাড়া করে রেখেছে সে। যদি কিছু শোনা যায়।

হয়তো তখন নয়টা বাজে। হয়তো এর বেশি। মার্টিন কম্বল সরিয়ে উঠে বসল। তার শরীর হালকাভাবে কাঁপছে—চোখে নক্ষত্রের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। কিছু যেন সে শুনতে পেল। বাতাসে সুইয়ের খোঁচার মত খুব হালকা শব্দ যা শুনতে পাবার কথা নয়। কিন্তু মার্টিন শুনতে পেল। সাত-সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে ছুটে আসছে শব্দটা। স্বপ্নীল শব্দ—কুকুরের ঘেউ ঘেউ। মাঠ, অন্ধকারাচ্ছন্ন অলি-গলি পার হয়ে ছুটে আসছে শব্দটা। হালকা ঘেউ ঘেউ টানা পাঁচ মিনিট শুনল সে। তারপর শব্দটা বাড়তে লাগল।

'টরি! বাড়ি আয়! কোথায় ছিলি? এখন বাড়ি আয়!' মিনতি করল মার্টিন।

আরও পাঁচ মিনিট পার হলো। শব্দটার তীক্ষ্ণতা বাড়ছে ক্রমশ। টরির নাম ধরে মার্টিন ডাকতে লাগল। খারাপ কুকুর, তাকে না জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। অভিমান হলো মার্টিনের। ভাল কুকুর—আবার বাড়ি ফিরে এসেছে। খুশি হলো মার্টিন। শব্দটা আরও এগিয়ে আসছে। আরও। এবার সেটা রাস্তার পাশে। এবার বাড়ির সামনে।

মার্টিনের শরীর আবার কেঁপে উঠল। সে কি এখন নীচে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে আসবে, না কি তার বাবা-মা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? যদি এর মাঝে টরি চলে যায়? তা হলে তো কষ্টের সীমা থাকবে না। না, না, সে নিজেই গিয়ে দরজা খুলবে। বিছানা থেকে নামতে যাবে, এমন সময় দরজা খোলার শব্দ কানে ভেসে এল। হয়তো কোন দয়ালু মানুষ দরজাটা খুলে দিয়েছে। দরজা খোলা পেয়েই টরি সোজা মার্টিনের ঘরে চলে এল। তারপর বিছানায় লাফ দিয়ে উঠল। জিভ দিয়ে চাটতে লাগল মার্টিনের চোখ-মুখ। মার্টিন হাসছে। আবার কাঁদছে। আবার হাসছে, আবার কাঁদছে।

তারপর হঠাৎ করে মার্টিনের হাসি-কান্না বন্ধ হয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে তাকাল টরির দিকে। টরির শরীর থেকে যে গন্ধটা আসছে সেটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। গন্ধটা মাটির। মরা মাটির। ছয় ফুট নীচের কবরের পচা মাটির। টরির গলায় ঝুলছে চারকোনা কী জানি একটা। একটা পচা চামড়া! মানুষের!

টরি খারাপ কুকুর ছিল। কারণ সে মানুষের বাগানে শুধু গর্ত খুঁড়ত। টরি ভাল কুকুর ছিল। কারণ সে মানুষের সাথে সহজেই বন্ধুত্ব পাতাতে পারত। আর মার্টিনের জন্য নিয়ে আসত অতিথি। মার্টিনের মাথায় কথাগুলো যেন আঘাত করতে লাগল।

এবং এখন নতুন অতিথি সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আসছেন খুব ধীরে ধীরে। তাঁর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হয় অনেক দিন তিনি হাঁটেননি। টেনে টেনে হাঁটছেন তিনি।

'টরি, টরি, তুই কোথায় গিয়েছিলি? কাকে নিয়ে এসেছিস?' মার্টিন চিৎকার করতে লাগল।

মার্টিনের রুমের দরজাটা খোলাই ছিল।

সেখানে এসে দাঁড়ালেন মার্টিনের নতুন অতিথি।

মূলঃ রে ব্র্যাডবেরি
রূপান্তরঃ সরোয়ার হোসেন

প্রেত

দুর্ধর্ষ এক জাপানী যোদ্ধা—সামুরাই—নাম তার কোয়াই রিয়ো। এলাকার শাসকের পক্ষে অনেক বড় বড় যুদ্ধে অংশ নিয়েছে সে।

কিন্তু মনিব মারা যাওয়ার পর, কোয়াই রিয়ো সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করল। চুল-টুল কেটে, টাকা-পয়সা সব বিলিয়ে দিল। তামাম দেশ ঘুরে বেড়িয়ে, বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে মন দিল। মানুষটা সে ভাল, পথে নেমে অনেক লোকের অনেক উপকার করল।

মাঝে সাঝে, সুযোগ পেলে, একাকী লড়াই অনুশীলন করে কোয়াই রিয়ো। পুরানো দিনের কথা চাইলেই কি এত সহজে ভোলা যায়? বিপদ-আপদ এলে নিজেকে তো বটেই, অন্যদেরও যাতে বাঁচাতে পারে—এই তার ইচ্ছে। কাউকে ভয় পায় না সে। এমনকী পরোয়া করে না ভূত-প্রেত আর অপদেবতাদেরও।

একদিন, এক জংলা পাহাড়ী এলাকা দিয়ে যাচ্ছে কোয়াই রিয়ো; আশপাশে জনমনিষ্যির চিহ্নমাত্র নেই। ক্রমেই আঁধার ঘনিয়ে আসছে। রাতের জন্যে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই দরকার তার।

আগুন জ্বালতে পারে এমনি এক জায়গা খুঁজতে লাগল সে। রান্না-বান্না করে খেয়ে শুয়ে পড়বে।

শীঘ্রিই মনের মত জায়গা পেয়ে গেল কোয়াই রিয়ো। এক গাছের কাছে খানিকটা ঘাস জমি। ছোট করে আগুন জ্বেলে রান্না সেরে নিল কোয়াই রিয়ো।

হঠাৎ এক লোককে এদিকে হেঁটে আসতে দেখল সে। হাতে তার ইয়া বড় এক কুঠার—লোকটা একজন কাঠুরে।

বৌদ্ধ ভিক্ষু কোয়াই রিয়োকে অভিবাদন জানাল সে।

'গুরুজী, আমি এক গরীব কাঠুরে। এই বনে কাঠ কাটি। একটা কথা বলি, এখানে রাত কাটানো কিন্তু মোটেই নিরাপদ নয়।'

লোকটার কথা হেসে উড়িয়ে দিল কোয়াই রিয়ো।

'কেউ আমার ক্ষতি করবে না, বন্ধু,' বলল সে। 'আমি সামান্য এক ভিক্ষু। আমার আছেটা কী যে নেবে। আমি প্রভু বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করি, তিনিই আমাকে দেখবেন। তা ছাড়া আমি নিজেকে রক্ষা করতে জানি। কোনও মানুষ আমার ক্ষতি করতে পারবে না।'

'গুরুজী, আপনি সাহসী মানুষ,' বলল কাঠুরে। 'কিন্তু আপনার বোধহয় জানা নেই, এ জঙ্গলে প্রেত আছে। কাউকে একা পেলে আর রক্ষা নেই—মেরে খেয়ে ফেলে। গুরুজী, কাছেই আমার বাড়ি। রাতটা ওখানেই কাটাবেন, চলুন।'

'ধন্যবাদ, বন্ধু,' বলল কোয়াই রিয়ো। 'তুমি দয়ালু লোক। বেশ, চলো তবে তোমার বাড়িতে। আমি ওখানে প্রার্থনা করব। প্রভু বুদ্ধ তোমাকে আর তোমার

পরিবারকে রক্ষা করবেন।'

কোয়াই রিয়ো উঠে দাঁড়িয়ে কাঠুরের সঙ্গ নিল। বনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে, শীঘ্রিই এক কুটিরের কাছে চলে এল। ছোট্ট এক ঝর্ণার পাশে কুটিরটা। ঝর্ণার পানি গভীর এক গিরিখাতে পড়ছে—পাথুরে মাটিতে সুবিশাল এক গহ্বর ওটা।

অতিথিকে নিয়ে কাঠুরে নিজের কুটিরে ঢুকল। ঘর মাত্র দুটো, একটা বেশ বড়সড় আর আরেকটা ছোট।

বড় ঘরটায় চারজন মানুষ, খুদে অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে রয়েছে। দু'জন নারী, আর দু'জন পুরুষ। উঠে দাঁড়িয়ে তারা কোয়াই রিয়োকে সসম্মানে অভিবাদন জানাল।

'গুরুজী আজ রাতে আমাদের এখানে থাকবেন,' বলল কাঠুরে। 'অপদেবতারা তা হলে তাঁর ক্ষতি করতে পারবে না।'

মহিলাদের একজন চা তৈরি করে কোয়াই রিয়োকে পরিবেশন করল। চা-পানের পর, কাঠুরে ভিক্ষুকে নিয়ে ছোট ঘরটায় এল। ছোট একটি বিছানা আছে এ ঘরে।

'আপনি এখানে ঘুমান, গুরুজী,' বলল লোকটা। 'আমরা ও ঘরে শোব।'

কোয়াই রিয়ো তার ঘরে দরজা দিল। কিন্তু শীঘ্রি ঘুম এল না। জানালা খুলে বাইরে চাইল সে। বড় মনোরম আজকের রাতটা। চাঁদের আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে ছোট বাড়িটা। ঝর্ণার কলধ্বনি মধুর সঙ্গীত হয়ে বাজছে কানে। কোয়াই রিয়ো প্রার্থনায় বসল। একটানা দু'ঘণ্টা ধ্যান করল সে।

প্রার্থনা শেষে ভারী তেষ্টা পেল তার। ভাবল ঝর্ণাটা থেকে পানি পান করে আসবে। ঘরের দরজা খুলে বড় কামরাটায় যেই বেরিয়ে এসেছে, অমনি থমকে দাঁড়াতে হলো।

ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে পাঁচটা দেহ। আশ্রয়দাতা কাঠুরে আর তার পরিবারের সদস্যদের। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার, দেহগুলোর কোনওটারই মাথা নেই!

'দুষ্ট লোক এসে এদের খুন করে গেছে,' ভাবল কোয়াই রিয়ো। মনটা খারাপ হয়ে গেল তার। 'কাঠুরে লোকটা তা হলে ঠিকই বলেছিল। এ জঙ্গল ভীষণ বিপজ্জনক। আমি ধ্যান করলে কী হবে, এ বাড়িতে শান্তি আনতে ব্যর্থ হয়েছি।'

আবারও ভাল করে চাইল সে। আরে, রক্ত কোথায়? কোয়াই রিয়ো জীবনে বহু যুদ্ধ করেছে, কিন্তু কারও মাথা কাটা গেছে অথচ রক্ত ঝরেনি, এমন দৃশ্য সে আগে কখনও দেখেনি।

'উঁহু,' মনে মনে বলল সে, 'এগুলো মরা মানুষের দেহ হতে পারে না। এরা আদতে মানুষই নয়, প্রেত!'

কোয়াই রিয়োর মনে পড়ে গেল এক মন্দিরের কথা, সে কিছুদিন থেকেছিল ওখানে। মন্দিরের মোহান্ত ওকে মানুষখেকো প্রেতের কথা বলেছিলেন। এসব অপদেবতাদের মুণ্ডু নাকি ধড় ছেড়ে উড়ে যায়। তখন তারা ইচ্ছে করলেই মানুষকে হত্যা করে কাঁচা খেয়ে নিতে পারে।

কোয়াই রিয়ো বুঝতে পারল, প্রেতগুলো তাকে সাবাড় করে দিতে চেয়েছিল,

এ যাত্রা রক্ষা করেছেন স্বয়ং বুদ্ধ।

এবার কোয়াই রিয়োর অন্য এক কথা মনে পড়ল। মোহান্ত বলেছিলেন, 'একটা কায়দা কাজে লাগিয়ে তুমি ওদেরকে খতম করতে পারবে। ওদের মাথা যদি ধড় খুঁজে না পায়, তা হলে ওরা শক্তি হারিয়ে ফেলে। মুণ্ডুগুলো উড়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে। তারপর শরীরগুলো চট করে লুকিয়ে ফেলবে। এমন জায়গায় রাখবে যাতে মাথা আর দেহের খোঁজ না পায়।'

কোয়াই রিয়ো কাঠুরের ধড়টা তুলে নিল। এবার কুটির ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, শশব্যস্তে গিরিখাতের উদ্দেশে হাঁটা দিল। কাঠুরের দেহটা সে ফেলে দিল খাদের অতলে।

একটু পরই, কোয়াই রিয়ো একাধিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। ত্বরিত একটা গাছের আড়াল নিল সে। প্রেত পাঁচটার উড়ন্ত মাথা ফিরে এসেছে বাড়িতে। বীভৎস তাদের রূপ। মুখ হাঁ, দাঁত রক্তে মাখামাখি। এক মহিলার মাথা উড়তে উড়তে ঘরে ঢুকল। পরমুহূর্তে বেরিয়ে এল, তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

'ভিক্ষু পালিয়েছে।' চিৎকার ছাড়ল ওটা। 'আমাদের কর্তার দেহ নিয়ে গেছে। ওকে খুন করব! কোথায় ও?'

এবার আরেক মুণ্ডুর নজর পড়ল কোয়াই রিয়োর ওপর। 'ওই যে ওখানে, মারো ওকে!' গর্জন ছাড়ল ওটা।

এতটুকু ঘাবড়ায়নি ভিক্ষু। হাজার হলেও এক কালে সামুরাই ছিল সে। ঝটপট প্রার্থনাটা সেরে নিল। তারপর মাটি থেকে একটানে একটা গাছ উপড়ে নিল। ধেয়ে গেল এবার মুণ্ডুগুলোর উদ্দেশে।

গাছটা সজোরে আছড়াল ভিক্ষু প্রেতগুলোর মাথা লক্ষ্য করে। চারটে মাথা পালিয়ে বাঁচল। কিন্তু কাঠুরের মুণ্ডুটা উড়ে এল কোয়াই রিয়োর উদ্দেশে। ধারাল দাঁত দিয়ে তাকে কামড়ে দেয়ার চেষ্টা করল। ওকে ঘিরে পাক খেতে লাগল মাথাটা, আর রক্ত হিম করা চিৎকার ছাড়তে লাগল। কিন্তু শক্তি ক্রমেই ক্ষয়ে আসছে ওটার। নিজের দেহ কোথায় জানে না সে। ভিক্ষুর আলখাল্লায় কামড় বসাতে চাইছে। তবে একটু পরেই, মাটিতে পড়ে গেল মাথাটা। কোয়াই রিয়ো নিপাত করেছে ওটাকে।

ভিক্ষু এবার প্রেতের মাথাটা তুলে নিল। ওটার লম্বা চুল ধরে ঝুলিয়ে কুটিরে এসে ঢুকল। অন্য চারটে মাথা তখন যার যার দেহে জোড়া লেগেছে। কিন্তু কোয়াই রিয়োর হাতে তাদের কর্তার মুণ্ডু লক্ষ্য করে, দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে গেল জঙ্গলে। ওগুলোকে এরপর আর কোনওদিন দেখা যায়নি।

কোয়াই রিয়ো খানিক বাদে বাইরে গিয়ে, মাটিতে পুঁতে দিল কাঠুরের মাথাটা। তারপর পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রবেশ করল কুটিরে। ছোট ঘরটায় ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল ভিক্ষু। পরম শান্তিতে ঘুম দিল সে। পরদিন সকালে, কোয়াই রিয়ো কাছের শহরটার উদ্দেশে রওনা দিল।

কাজী শাহনূর হোসেন

ভয়

এক

আগের দিনে গ্রামে যাদের টাকা পয়সা বেশি ছিল বা হত, তারা হজ্জে যেত। এখন অবস্থা বদলেছে। এখন গ্রামের টাকাওয়ালা লোক হজ্জে না যেয়ে সেই টাকায় ছেলেমেয়েদের শহরের বেসরকারী ভার্সিটি বা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করায়। ধর্মের চেয়ে মানুষ শিক্ষাটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

আমার বাবা অবশ্য দুটোই করেছেন। তাঁর টাকা পয়সার অভাব নেই। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তিনি। তা ছাড়া, তিনশো বিঘের লীজ-ঘের আছে আমাদের। কাজেই দশ-বারো লাখ টাকা দিয়ে ছেলেকে বেসরকারী মেডিকেলে ভর্তি করানো এবং মাকে নিয়ে হজ্জে যাওয়া বাবার কাছে কোনও ব্যাপারই না।

বাবা হজ্জ থেকে আসার পরে আমাদের গ্রামের একটু পরিবর্তন হয়েছে। লঞ্চঘাটের ভাড়ার ভিসিআর দেখানোর ছোট ছোট হলগুলো উঠে গেছে। সেই সাথে বন্ধ হয়েছে খুপরির মত দোকানের পিছনে ফেন্সিডিল এবং গাঁজার পুরিয়া বেচা। যে কারণে ফেন্সিডিলের দামও উঠে গেছে প্রায় দ্বিগুণ। আগে যারা দোকানের পিছনে এসব বিক্রি করত এখন তারা বলতে গেলে বাড়ি বাড়ি ফেরি করেই ডাইল, গাঁজা এসব বিক্রি করে। আমার অবশ্য সমস্যা নেই। আমার সাপ্লাই সময়মতই আসে। চেয়ারম্যানের ছেলে হওয়ায় অনেক সুবিধে। প্রদীপের নীচেই অন্ধকার।

আর কদিন পরেই বেসরকারী মেডিকেলে পড়তে ঢাকায় চলে যাব বলে যা খাওয়ার খেয়ে নিচ্ছি। মানে ডাইল, গাঁজা এসব। ঢাকায় ওসবের জোগান কীভাবে পাব আল্লাই জানে। ব্যবস্থা নিশ্চয় একটা হয়ে যাবে। টাকা থাকলে এবং আন্তরিক ভাবে চাইলে কী না পাওয়া যায়! তবুও হাতের কাছে যা সহজভাবে পাচ্ছি তাই কায়দা মত গলাধঃকরণ করি।

ডাইল খাওয়ার জন্য সন্ধ্যের পরপর ঘেরের সবচেয়ে দূরের কুঁড়ে ঘরে চলে এসেছি। পানির উপরে টঙঘরের মত এই ঘরে বসে বাবার কর্মচারীরা 'হোয়াটগোল্ড' চিংড়িমাছ পাহারা দেয়। কর্মচারীরা প্রায় সবাই আমার বয়সী ডাইলখোর হওয়ায়, এবং আমাকে ছোটকর্তা হিসাবে মানে বলে ওদের এখানে এসে সবচেয়ে নিরাপদে ডাইল সেবন করা যায়। তবে ডাইল কেনার পয়সা আমাকেই দিতে হয়। আজ বিকালে ওদের একজনকে 'হোণ্ডা'র পিছনে বসিয়ে সেই সীমান্ত এলাকা থেকে বোতল নিয়ে এসেছি।

চারদিকে অন্ধকার নেমে যেতেই ডাইল সেবন শুরু করলাম। বোতলের মুখ খুলে ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে দিলেই হলো। ধীরে ধীরে দুনিয়া অন্যরকম হতে থাকে। অনেকে অবশ্য নেশা আরও বাড়াতে জুতোর কালি শোঁকে। চাষাড়ে টাইপের লোকে গোবর শোঁকে। ওতে নাকি অন্যরকম ফিলিংস হয়! আমি পরীক্ষা

করে দেখিনি। ডাইলখোর হলেও অতটা নীচে নামিনি। তা ছাড়া, আমি ছাত্রও খারাপ না। বেসরকারী মেডিকেলে ভর্তি হতে সর্বনিম্ন যে মার্কস লাগে সেটা আমার আছে। আর তার সাথে আছে বাপের টাকা। আমাকে ভর্তি করাতে ডোনেশনও দিতে হয়েছে মনে হয়।

নেশা হলে গায়ের জামাকাপড় খুলে ফেলতে হয়। শরীরে গরম ঢুকে যায়। হাঁসফাঁস লাগে। সবাই গায়ের জামা খুলে বসেছি। আমরা চারজন। একজন প্রায় বন্ধুস্থানীয়। সব কাজে আমার সাথে ছায়ার মত থাকে। বাবুল। বাকি দুজন ঘেরের পাহারাদার। ওরা রাতে এই কুঁড়ে ঘরেই থাকে।

ডাইলের বড় উপকারিতা মদের মত তা মাতাল করে না। স্বাভাবিক থাকা যায়। শুধু ঝিম মেরে বসে থাকতে হয়। আমরা চারজনই ঝিম মেরে বসে আছি। কেউ কোনও কথা বলছি না। বৈশাখ মাস। হু হু করে বাতাস বইছে। ঘেরের খোলা বাতাস শরীরের ভেতরটা ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে।

ঝিম ধরা অবস্থায় হঠাৎ একটা জিনিস মনে পড়ল। জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আমি মাথা তুলে কারও দিকে না তাকিয়েই বললাম, 'আমার একটা লাশ দরকার।'

বাবুল চমকে উঠে বলল, 'লাশ?'

তার চমকানোর কারণ ছিল। আমার বড় ভাই, এলাকার সবচেয়ে উচ্ছৃংখল ছেলেটা, কিছুদিন আগে একজনের বউয়ের পেটে গরু জবাইয়ের ছুরি বসিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে। সে এখন ফেরারী আসামী। সেই বউয়ের সাথে ভাইয়ের পরকীয়া ছিল। কিন্তু বউ ভাইয়ের সাথে পালিয়ে যেতে রাজি না হওয়ায় আমার ভাই বউটাকে শেষ করে দিয়ে নিজেই পালায়। কাজেই তার ছোট ভাই লাশ চাইলে একটু অবাক হওয়ারই কথা!

ঘেরের পাহারাদার, পেটানো শরীরের কালো ষাঁড় হামিদ খসখসে গলায় বলে ওঠে, 'ছোটভাই, কন কার লাশ ফেলে দিতে হবে। আপনি বললে যে-কারও লাশ ফেলে দিতে পারি। শুধু আপনি একটু পিছনে থাকলেই হবে।'

আমি নিজেও কেমন যেন ধন্ধে পড়ে গেছি। 'নির্দিষ্ট কারোর লাশ নয়। যে কোনও লাশ হলেই হবে।'

ইয়াছিন বলে উঠল, 'ছোট ভাই, যে কোনও লাশ দিয়ে কী করবেন? কারোর উপর রাগ থাকলে বলেন, লাশ ফেলে দেই।'

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'মানে, ব্যাপারটা তা না। আমার যে কোনও মরা লাশ হলেই হবে। লাশ পড়তে হবে। ডাক্তারি পড়তে লাশ লাগে। লাগে লাশের হাড়গোড়।'

বাবুল আবার চমকে উঠল। 'মরা লাশ! পড়তে!'

'হুঁ। আমাদের সারেরা বলে দিয়েছে, ফার্স্ট ইয়ারে লাশের হাড়গোড় পড়তে হয়। তাই ভাবলাম, কই না কই পাব, যদি গ্রাম থেকে নেয়া যায় তো ভাল। শুনেছি হাড়গোড়ের বেশ দাম। ঢাকা শহরে দশ-বারো হাজার টাকা লাগে হাড় পেতে।'

হামিদ ভাই আগের মত খসখসে গলায় বলল, 'ছোটভাই কী কন? লাশের

হাড়ের দাম দশ হাজার টাকা? তা হলে তো প্রত্যেকদিন একটা করে লাশ নিয়ে ঢাকায় যেয়ে বেচে দিতে হয়। শুধু টাকা আর টাকা।'

'যেরকম সহজ ভাবছ ওরকম সহজ না। ঝামেলা আছে। তা ছাড়া অত লাশ তুমি পাবা কই?'

হামিদ বুদ্ধিশুদ্ধি কম বলেই মাথা চুলকে বুদ্ধি বের করার চেষ্টা করে বলল, 'তা ঠিক। গ্রামের লোক সহজে মরেও না।'

ইয়াছিনের মাথা মোটামুটি ঠাণ্ডা, সে ভেবে বলল, 'ছোটভাই, মরা লাশের কথা বলছিলেন। কবর দেয়া লাশ হলে চলবে?'

'কতদিন আগে কবর দেয়া? শুনেছি বেশি আগের কবর দেয়া হলে হাড়গোড়ের গায়ে মাটির দাগ হয়ে যায়। ওই হাড় আর পড়া যায় না।'

ইয়াছিন হাতে কর গুনে বলল, 'দুইদিন আগের। আজ বুধবার। লাশ মাটিতে পুঁতে ফেলেছে সোমবারে।'

'হুঁ। তা হলে হবে। শুনেছি তিনদিনের আগে হলে কাজ চালানো যায়। লাশে তেমন পচন ধরে না। হাড়গুলো ফ্রেশ থাকে।'

'ফ্রেশ থাকতে পারে। বেশ ভাল লাশ। যুবতী বৌ তো। আর এনড্রিন খাওয়া। বিষ খাওয়া লাশ সহজে পচে না।'

হামিদ ওপাশ থেকে বলল, 'ইয়াছিন ভাই, কার কথা বলছ?'

'কেন, বাগদী পাড়ার সন্ন্যাসীর বউ। এনড্রিন খেয়ে আত্মহত্যা করে মরল। তারপর সেই লাশ মাটিতে পুঁতে ফেলেছে না!'

আমি একটু অবাক গলায় বললাম, 'বাগদীরা পোড়ায় না নাকি?'

ইয়াছিন বলল, 'মনে হয় না। পোড়াতে অনেক খরচ। ওরা এত টাকা পাবে কই? সব দিন আনে দিন খায়। তারপর বিষ খাওয়া, অপঘাতে মরা লাশ। পা ভেঙে সোজা করে মাটিতে পুঁতে ফেলে।'

বাবুলও দেখলাম ওই বাগদী বৌয়ের মরার কথা জানে। বলল, 'ওই লাশে ঝামেলা আছে কিন্তু। বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে ভেবে পুলিশ টুলিশও এসেছিল। চেয়ারম্যান চাচাই তো পুলিশদের ঠাণ্ডা করে রেখেছে। পুলিশ মনে হয় এখনও গ্রামেই আছে।'

হামিদ হাত দিয়ে উড়িয়ে দেয়ার মত করে বলল, 'দূর দূর। পুলিশ কি আর এখন পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে নাকি? রাত দুপুরে মাটি খুঁড়ে লাশ তুলে আনলে পুলিশের চোদ্দ গুষ্টিও জানবে না। ছোটভাই, আপনার লাশ কবে লাগবে?'

'বাগদীর বউয়ের হলে আজ রাতেই তুলে ফেলা ভাল। না হলে তিনদিন হয়ে গেলে আমার আর কোনও কাজে আসবে না। আর নতুন লাশ হলে দু'একদিন পরে হলেও চলবে।'

ইয়াছিন বলল, 'নতুন লাশ তো বললেই পাওয়া যাবে না। কারোর মরার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। না হলে নিজেরাই কাউকে লাশ বানিয়ে ফেলতে হবে। তারচেয়ে বাগদী বৌতে যদি কাজ হয় তো চলেন, আজ রাতে লাশ তুলে ফেলি।'

আমিও ঘাড় নেড়ে বললাম, 'সেটা করাই ভাল। দেরি হলে লাশ নষ্ট হয়ে যাবে। তা ছাড়া মাংস খসিয়ে হাড়গোড় বের করতে বেশ সময় লেগে যাবে।'

বাবুল বলল, 'তুই কি রাতে থাকবি নাকি এখানে?'

'হুঁ। আমি না থাকলে লাশের মাংস ছাড়িয়ে হাড় বের করার সময় খেয়াল রাখবে কে? একটু এদিক ওদিক হলে হাড় নষ্ট হয়ে যাবে। আর আমার সঙ্গে তুই থাকবি। কোনও অসুবিধে আছে?'

'নাহ। আমার আর কী অসুবিধে? দু'চারদিন বাড়িতে না ফিরলেও কেউ খোঁজ নেবে না। সৎ মা থাকার সুবিধে অনেক।'

'কিন্তু আমার বাড়িতে একটু খবর দিয়ে আসতে হবে। আর খাওয়া দাওয়ার কী ব্যবস্থা হবে?'

হামিদ এক গাল হেসে বলল, 'ও নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আপনি খাবেন। রাজ হাঁস কেটে রান্না চড়িয়ে দেব এখানেই। শুধু বাড়ি থেকে চাল আনতে হবে। আর সব আছে এখানে। আপনার কথা বললেই দেবে। বলব পিকনিক করছি।'

'ওই চিন্তা বাদ দাও, হামিদ ভাই। লাশ টাশ ঘাঁটাঘাঁটির রাতে ওসব না করাই ভাল। লাশের মাংস ছাড়িয়ে কেউ গোশ দিয়ে ভাত খেতে পারবে না। সব বমি হয়ে যাবে। তা ছাড়া, কাজও অনেক। পিকনিকের পিছনে সময় নষ্ট করা যাবে না। ওর চেয়ে তুমি আমাদের কথা বলে বাড়ি থেকে ভাত নিয়ে এসো। ইয়াছিন ভাই, কয়টার দিকে বেরুলে ভাল হয়?'

'সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রাত একটু বাড়লে বের হই। আজ রাতটা বেশ ভাল। ঘুটঘুটি অন্ধকার চারদিকে। কাজ সারতে সুবিধে হবে।'

বাবুল চিন্তিত স্বরে বলল, 'আকাশে কিন্তু কালো মেঘ আছে। বৃষ্টি না এসে যায়!'

হামিদ ধমকের স্বরে বলল, 'একটা লাশ তুলতে আর কতক্ষণ লাগবে? বৃষ্টি পড়ার আগেই কাজ সেরে ফেলতে পারব।'

যোগাড় যন্ত্র চলতে থাকে। ডাইলের এখনও কটা ফুল বোতল আছে। ও কয়টা পরে কাজে লাগবে। হামিদ চলে গেল আমাদের জন্য বাড়ি থেকে ভাত নিয়ে আসতে। এশার আজান হয়ে গেছে। গ্রামের দিকে কেরোসিনের তেল পোড়ানোর ভয়ে লোকজন সন্ধ্যের পরপরই খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কাজেই আমরাও খেয়ে দেয়ে লাশ তুলতে বেরিয়ে পড়তে পারব।

ঘেরের মধ্যেই প্রায় সবকিছু ম্যানেজ হয়ে যায়। কোদাল, শাবল সবই এখানে আছে। ঘেরের কাজেই লাগে ওগুলো। লাশ বয়ে আনতে বস্তাও জোগাড় হয়ে গেল একটা। চিংড়ি মাছের খাবার আনা হয় ওই বস্তায়। আনা হয় চুন।

চুনের বস্তা দেখেই ব্যাপারটা মাথায় খেলে গেল আমার। ইয়াছিন ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, 'চুন আছে নাকি, ইয়াছিন ভাই?'

'কতটুকু?'

'এই বস্তাখানিক।'

'তা হবে। কিন্তু কী করবেন?'

'চুনগোলা পানিতে লাশ ফেলে পানি ফুটালে হাড়ের গা থেকে সহজে মাংস ছাড়িয়ে যায় শুনেছি। মেডিকেলের মামারা নাকি ওভাবেই হাড়ের গা থেকে মাংস

ছাড়ায়।'

বাবুল বলে উঠল, 'গন্ধ হবে না?'

'তা হয়তো হবে একটু। কিন্তু ঘেরের এই ফাঁকা জায়গায় গন্ধ হলেও তা শুধু আমাদের ছাড়া আর কারও লাগবে না। এই একশো বিঘের মধ্যে কারও ঘরবাড়ি নেই।'

হামিদের ভাত নিয়ে ঘেরে ফিরতে ফিরতে রাত দশটা বেজে গেল। এত জনের ভাত বলে নতুন করে রান্না করে নিয়ে আসতে হয়েছে। খেয়ে গুছিয়ে উঠতে এগারোটা। তারপর ঘেরের আ'ল ধরে বিশাল ঘের ছাড়িয়ে গ্রামে ঢুকে গ্রামের শেষ মাথায় বাগদী পাড়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে রাত বারোটা বেজে গেল। এদিকে আবার ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে। যে কোনও মুহূর্তে কালবোশেখী আক্রমণ করতে পারে। তা না করলেও বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে।

আমরা তিনজন এসেছি। ঘের পাহারা দিতে হবে বলে হামিদ আসেনি। তবে সে ঘেরে নিষ্কর্মা বসে থাকবে না। বস্তার চুন বড় পাত্রে ঢেলে সেটা পানি দিয়ে ফুটাতে থাকবে। যাতে আমরা ফিরে এসেই ওর মধ্যে লাশ ছেড়ে দিতে পারি।

ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে। আলকাতরা অন্ধকারে গাছের পাতাগুলো কালো ভূতের মত দুলছে। তিন ব্যাটারির টর্চের আলো ফেলে পথ চলছি। ঘের থেকে বাগদী পাড়া কম দূর নয়। ওরা অস্পৃশ্য বলে বোধ হয় গ্রামের শেষ মাথায়, নদীর ধারটাতেই পাড়াটা গড়ে উঠেছে।

বাগদী পাড়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে রাত বারোটা ছাড়িয়ে গেল। আমার আলো জ্বলা ঘড়িতে দেখে নিয়েছি। ছোট ছোট ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হঠাৎ হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে চারদিক আলোকিত করে দিচ্ছে। তারপর কবরের অন্ধকার।

আমি একটু উষ্ণ গলায় বললাম, 'ইয়াছিন ভাই, বাগদীদের কবর খানাটানা কোন্ দিকে? তাড়াতাড়ি চলো সেদিকে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি এসে গেলে কিন্তু কাকভেজা হয়ে যাব।'

অন্ধকারে ইয়াছিন ভাইয়ের গলা ভেসে আসে, 'ঘেরেই পড়ে থাকি ছোটভাই। বাগদী পাড়ার কোন্ জায়গায় কী ঠিক মনে নেই। অনেক আগে এসেছি তো!'

পাশ থেকে বাবুল বলে ওঠে, 'টর্চটা আমার কাছে দেন, ইয়াছিন ভাই, দেখি আমি খুঁজে পাই কি না। ওদের তেমন বাঁধা ধরা কোনও কবর খানাটানা নেই। নদীর ধারে পুঁতে রাখে শুনেছি। চিহ্নটিহ্ন আছে কি না খুঁজে দেখতে হবে।'

এই বৃষ্টির রাতে এখন নদীর ধারে ধারে কবরখানা খুঁজে বেড়াও। মেজাজ খারাপ করতে গিয়েও সামলে নিলাম। এসেই যখন পড়েছি দেখি পাওয়া যায় কি না। গেলে বেশ হবে। আব্বুর কাছ থেকে হাজার দশেক টাকা লাশ কেনা বাবদ ঠিকই আদায় করব। শুধু শুধু লাশটা পেয়ে গেলে টাকাটা ডাইল কেনার কাজে রেখে দিতে পারব। ঢাকায় ডাইলের দাম কেমন কে জানে!

বাবলুর চোখ শকুনের চোখ। সে এই অন্ধকারেও শুধু টর্চের আলোয় ভরসা করে ঠিকই বাগদী বৌয়ের কবর খুঁজে বের করল। পাশাপাশি কয়েকটা কবর আছে বটে, তবে নতুন কবর দেখলেই চেনা যায়। কবরের মাটি এখনও পাশের

মাটির সাথে মিশ খায়নি।

নদীর তীরে একটা অতিপ্রাকৃত দৃশ্যের অভিনয় হতে থাকে। টিপ টিপ বৃষ্টি এবং নদী থেকে উঠে আসা হু-হু বাতাসের মধ্যে কবরখানায় আমি দাঁড়িয়ে আছি টর্চ জ্বালিয়ে। ইয়াছিন ভাই কোদাল দিয়ে কবরের মাটি তুলছে আর বাবলু হাত দিয়ে সে মাটি সরিয়ে স্তূপ করে রাখছে পাশে।

কবরের মধ্যেও ওটাকে কোনওমতেই কফিন বলা চলে না। চারটে বড়সড় তক্তা দিয়ে কোনওমতে একটা বাক্স মত তৈরি করা হয়েছে। তার মধ্যে কেবল পচন ধরেছে বাগদী বৌয়ের যুবতী লাশ।

আমি ভয়ে লাইটটা ধরে অন্যদিকে তাকিয়ে বললাম, 'ইয়াছিন ভাই, তাড়াতাড়ি লাশটা তুলে বস্তায় পুরে ফেলো। এখন অত দেখার সময় নেই। ঘেরে নিয়ে দেখলেই হবে কী অবস্থা।'

বাবলুর চোখ সত্যিই শকুনের চোখ। এই অন্ধকারেও সে বলে দিল, 'ইয়াছিন ভাই, ব্যস্ত হাত লাগান। ওয়াপদার রাস্তা দিয়ে কেউ এদিকে আসছে মনে হয়।'

শুনে ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেলাম নাকি!

ইয়াছিন ভাই একটু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'এই সময় হামিদটা থাকলে ভাল হত। ওর সাহস খুব। একা আমাদের সাথে লাগতে আসলে আরেকটা লাশ বেশি করে ফেলত। ছোট ভাই এক্কেবারে টাটকা লাশ পেয়ে যেত।'

আমি টর্চ জ্বেলে আছি। ওরা দুজনে মিলে ধরাধরি করে বড়সড় বস্তায় যুবতী বৌয়ের ভারী লাশ পুরে মুখ বন্ধ করে ফেলে।

বস্তা নিয়ে রাস্তায় উঠতেই বাবলুর দেখা সেই রাতের আগন্তুকের সাথে দেখা হয়ে যায়।

ইয়াছিন ভাই গলা সপ্তমে তুলে টর্চ জ্বেলে বলে, 'কে? এত রাতে কে যায়?'

ওপাশে অন্ধকারের লোকটা কাঁচুমাচু কণ্ঠে বলে, 'আমি বাগদী পাড়ার সন্ন্যাসী বাগদী।'

ইয়াছিন ভাইয়ের চোরের মায়ের বড় গলা। 'এই রাত বিরাতে এদিকে কী করছিস রে! কী মতলব?'

'কবরখানার দিকে যাচ্ছিলাম।'

'কবরখানায় কী? তুই কি কবরের পাহারাদার?'

সন্ন্যাসী কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'না, মানে মনে হলো কারা যেন কবরখানায় ঢুকে কবর খুঁড়ছে। তাই এট্টু দেখতে আসলাম। আমার বউডার তো আবার দুদিন হলো কবর দেয়া।'

'যা, দেখে আয়। একা একা ভয় পাসনে যেন। একে তো কবরখানা। তারপর তোর বউ তো এনড্রি খেয়ে মারা গেছে। কষ্ট পেয়ে মরেছে। দেখ কবর ফুঁড়ে উপরে উঠে বসে আছে কি না।'

সন্ন্যাসী যেন একটু সাহস করে বলে ওঠে, 'আপনারা কোন খানতে?'

'আমরা? আমরা তো ঘেরের জন্য চুন আনতে গিয়েছিলাম। জানিসই তো, ঘেরের কাজ। রাত বেরাতের কাজ। এই বস্তা ভর্তি করে চুন নিয়ে যাচ্ছি। যা, যা,

তোর কাজে যা। আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। ঘেরে চুন দিতে হবে।'

যাক একটা ফাঁড়া তো কাটল।

ফাঁড়া যে কাটেনি পরদিন দুপুরে বুঝলাম। রাতে লাশ নিয়ে ফিরে সারারাত জেগে ফুটন্ত চুনের পানিতে লাশ সিদ্ধ করে মাংস ছাড়ানোর মত বীভৎস ব্যাপার স্যাপার। মাংসগুলো রাক্ষুসে আফ্রিকান মাগুরের মুখে ছেড়ে নিশ্চিহ্ন করা। পরিষ্কার ধবধবে সাদা এক মানুষ ফ্রেশ হাড়গোড় নিয়ে বাড়িতে ফিরেছি। আমার সাধাসিধে মা উচ্ছৃংখল ছেলেদের ব্যাপারে নাক গলান না। কাজেই কংকালের বস্তা আমার ব্যাগে ঢুকিয়ে রাতজাগা ঘুম দিলাম।

পুলিশের ডাকে ঘুম ভাঙল। পুলিশের সাথে আব্বাও আছেন। আছে ইয়াছিন, বাবুল ও সন্ন্যাসীও। পুলিশ কী জন্য এসেছে মুহূর্তেই বুঝে গেলাম। চোখ-মুখ ধুয়ে ভাল একটা শার্ট পরে ভদ্র হয়ে ড্রয়িংরুমে এলাম। আব্বা পুলিশের সাথে কথা বলছেন। ইয়াছিন উঠে গেছে ডাব গাছে। ডাব পাড়তে। একজন কে যেন ছুটেছে বাজারে গরম গরম মিষ্টি আনতে।

আব্বা নিজেও এখনও লাশের ব্যাপারটাতে ক্লিয়ার না। ইয়াছিন, বাবুলের কথা কিছুই বোঝেননি। শুধু এটুকু বুঝেছেন, ছোট ছেলেকে বাঁচাতে যা করার তাই করতে হবে। বড়টার মত এটাকেও ফেরারী হতে দেয়া যাবে না।

'পুলিশের সামনে ব্যাপারটা আমি খোলাসা করলাম। ডাক্তারি পড়তে মানুষের হাড়গোড় লাগে, পুলিশও জানে। শুধুমাত্র পড়াশুনার জন্য যে আমি কবর খুঁড়ে লাশ তুলেছি শুনে পুলিশ আমাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। আমি এই ফাঁকে জানিয়ে রাখি যে, ঢাকায় লাশ পাওয়া খুব দুষ্কর। যারা ডাক্তারি পড়ে তারা গ্রাম দেশ থেকে কবর খুঁড়ে লাশ তুলে নিয়ে যায়।'

আমার কথা ওরা বিশ্বাস করল। ইতিমধ্যে গরম গরম ছানার জিলাপী ও ডাবের পানি চলে এসেছে। আব্বার সাথে পুলিশ দুজনের কোনও একটা চুক্তি হয়ে গেছে। সম্ভবত চুক্তি হয়ে গেছে সন্ন্যাসীর সাথেও। সন্ন্যাসী বারান্দায় উবু হয়ে বসে পুলিশের সাথে সাথে একখানা গরম জিলাপী গলাধঃকরণ করল। আর হে হে করে জানাল, 'ছোটকর্তা পড়ার জন্য আমার মরা বউয়ের লাশ তুলেছে জানলে কে আর ছোট কর্তার বিরুদ্ধে কথা বলতে আসে। ছোটকর্তা তার বউয়ের লাশ পড়ে বড় ডাক্তার হয়ে গ্রামের সেবা করুক সেটাই সবাই চায়।'

সন্ন্যাসীর এত হে হে করে চাটুকারিতার কারণ আছে। আব্বার তহবিলের নগদ কিছু ক্যাশ সন্ন্যাসীর পকেটে গেছে। সাথে আশ্বাসও। আবার একটা বাগদী মেয়ে বিয়ের সব খরচখরচা আব্বা দেবে। তা ছাড়া, কোনও একটা ঘেরের কামলার কাজেটাজেও লাগিয়ে দেবে হয়তো। সন্ন্যাসী তো মহাখুশি। যে বউ বেঁচে থাকতে একটা পয়সা ঘরে আসেনি, সেই বউ মরে যাওয়ায় এত টাকা-পয়সা, সুযোগ আসবে কে জানত! মরা বউ বড় পয়া!

দুই

বাদ দেয়া যাক কংকাল নিয়ে আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছাবার ঝামেলা। ঝামেলা বলতে গাড়িতে পুলিশের চেক, জেরা। যখন জানতে পারে কংকাল আমি ব্যবসা করতে নিয়ে যাচ্ছি না, যাচ্ছি পড়তে, তখন পুলিশ আমাকে একটু সমীহের চোখেই দেখে। আমাদের দেশে এখনও শিক্ষিত শ্রেণীর কিছুটা মর্যাদা অবশিষ্ট আছে। পুলিশ সমীহ করলেও প্রাপ্য ছাড়তে ভোলেনি। হাতের ফাঁকে কিছু টাকা গুঁজে দিতে হয়েছে। আর এ বিষয়টা আব্বার দেখাদেখি আমি কিছুটা শিখে নিয়েছি। থ্যাঙ্কস গড ফর করাপশন। আর টাকা এমন এক জিনিস, তা যখন মুখ খোলে, তখন অন্য সবাই চুপ করে থাকে।

ভ্রমণ বৃত্তান্তের মত ঢাকায় বসবাসের কিছুদিনও বোধ হয় এড়িয়ে গেলে আমার গল্পের উনিশ-বিশ হবে না। টাকা-পয়সার সমস্যা না থাকায় বেশ ভাল একটা ফ্লাট ভাড়া নিয়ে উত্তরার দিকেই উঠেছি। আমাদের বেসরকারী মেডিকেল কলেজটা ওখানেই। অবশ্য আমি একা না। আমার মেডিকেলের আরও কয়েকজন বন্ধুর সাথেই। ডাক্তারি এমন পড়া যা একা একা পড়ে ওঠা সম্ভব নয়। সবাই মিলে ডিসকাশন করেই পড়তে হয়।

মেডিকেলে বেশ সময় চলে যাচ্ছে। প্রচুর পড়া। পড়ার চাপে আর ওসব ডাইল, গাঁজা ছাইপাঁশ গেলার সময় পাচ্ছি না। আর এখানে এসে আবিষ্কার করলাম আসলে আমি ড্রাগ অ্যাডিক্ট না। হাতের কাছে পাওয়া যেত বলে গিলতাম। আর এখানে তেমন সঙ্গী-সাথী পাচ্ছি না বলে ওসব খাওয়া হয়ে উঠছে না। তাতে যে আমার সময় খুব একটা খারাপ কাটছে তা নয়। বরং ভালই কাটছে। মি. হাইডের মধ্যেও বোধ হয় ডক্টর জেকিল সুপ্ত থাকে।

মেডিকেলে অস্বাভাবিক তেমন কোনও ঘটনাও ঘটে না। প্রথম প্রথম লাশ কাটতে যেয়ে একটু খারাপ লাগত। মেয়েগুলো, 'ওহ্ শিট, ওহ্ শিট' করত আর ফর্মালিনের ঝাঁঝাল আঁচে চোখ দিয়ে পানি ঝরাত। মাঝে মধ্যে মর্গের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উৎকট গন্ধে বমি করে ফেলত। অবশ্য আমাদের টিচাররা লাশ কাটার প্রথম কয়েক মাসে মাংস জাতীয় কিছু না খাওয়ার পরামর্শ দিতেন। খেলে বমি টমি হতে পারে। আমাদের ব্যাচের অনেক ছেলেই নাকি বমি করেছে।

মেডিকেলের প্রচলিত গল্পটা আমরা এসেও শুনি।

এক বন্ধু আরেক বন্ধুর সাথে বাজি ধরে যে, সে যদি মেডিকেলের মর্গের ভেতর এক রাত কাটাতে পারে, তা হলে পরদিন তাকে শহরের সবচেয়ে ভাল চাইনিজ রেস্টুরেন্টে খাওয়াবে।

শুনে সেই বন্ধু অতি উৎসাহী হয়ে সাহস দেখিয়ে বলল যে, সে শুধু রাতে থাকবে তাই নয়, মর্গের প্রতিটি সাদা চাদরে ঢেকে রাখা শক্ত লাশের ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটের মধ্যে একটা করে চিনির তৈরি বাতাসা রেখে আসবে। যাতে সকালে

এসে সবাই দেখে বুঝতে পারে সে সত্যিই রাতে মর্গে গিয়ে থেকেছিল। ফাঁকি দেয়নি।

কথামত বাজির দিন রাতে সে মর্গে চলে আসে।

গভীর রাতে মর্গের চাবি নিয়ে এসে মর্গের দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে সে।

বুক ঢিব ঢিব করলেও সাহসে ভর করে সে টেবিলের উপরে রাখা সাদা চাদরে ঢাকা হত কুচ্ছিত লাশগুলোর মুখে একে একে বাতাসা গুঁজে দেয়। চারটি লাশের মুখে বাতাসা গুঁজে পাঁচ নম্বরের সাদা চাদর সরিয়ে প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকা লাশের মুখে বাতাসা পুরে দিতেই সে অবাক হয়ে দেখে লাশটি কড়মড় করে বাতাসাটা অতিদ্রুত গলাধঃকরণ করে ফেলেছে। ভয়ে দাঁত কপাটি লেগে যাওয়ার অবস্থা তার।

ঠিক সেই মুহূর্তে লাশটা ভূতের গলায় বলে ওঠে, 'বাঁতাসা কিঁ আঁর এঁকটা হঁবে?'

আর কিছু শুনতে পায় না বন্ধুটি। তার আগেই সে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য লাশের ভেক ধরে থাকা বাতাসা চাওয়া লাশটা ওর বাজি ধরা বন্ধু।

তিন

একদিন এক বন্ধুর বাসা থেকে ফিরছি। ফার্মগেট থেকে বাস চেঞ্জ করে উত্তরার বাসে উঠতে হবে। হঠাৎ যেন মনে হলো গাবতলীর বাসে উঠতে আমাদের গ্রামের আমাদের ঘেরের পাহারাদার হামিদ ভাইকে দেখলাম। কিন্তু হামিদ ভাই গ্রাম ছেড়ে ঢাকা শহরে আসবে কেন? আর আমার যেন মনে হলো হামিদ ভাই আমাকে দেখতে পেয়েই তড়িঘড়ি করে বাসে ঠেলে উঠল। কিন্তু তা তো করার কথা নয়। হামিদ ভাইয়ের সাথে আমার যে সম্পর্ক তাতে তো বাস থেকে আগে নেমে পড়া উচিত। তা হলে হয়তো হামিদ ভাইই নয়।

মনের খচখচানি না যাওয়ায় বাড়িতে ফোন করে খবর নিয়ে জানতে পারলাম হামিদ ভাই নাকি ঘেরের কাজ ছেড়ে দিয়েছে। এখন কী যেন ব্যবসা করে। ব্যবসার কাজেই তাকে ঢাকায় আসতে হয়।

হামিদ ভাইয়ের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেছি, এমন সময় হামিদ ভাইকে আবার দেখলাম। তাও আমাদের মেডিকেল কলেজে। এবারে আর আমাকে এড়াতে পারল না। বলতে গেলে হাতে নাতেই ধরে ফেলেছি। হামিদ ভাই এখানকার এক কর্মচারীর কাছে এক সেট তাজা বোন বিক্রি করতে এসেছে। তারই লেনদেন চলছিল।

হামিদ ভাইকে ক্যান্টিনে ডেকে নিয়ে বসিয়ে একটু বিদ্রূপাত্মক স্বরে বললাম, 'ঘেরের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তা হলে এখন লাশের হাড়গোড় এক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসা করছ!'

হামিদ ভাই কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'না, মানে, ছোটভাই, একটা সুযোগ এসে গেল। গরীব মানুষের একটা লাশ পেয়ে গেলাম। তাই কিনে এনে...'

আমি একটু কড়া স্বরে বললাম, 'ওসব ধান্ধাবাজি ছাড়ো, হামিদ ভাই। লাশ কেনাটেনার কথা বাদ দিয়ে আসল কথা বলো। এ ব্যবসা কদ্দিন ধরে করছ? গ্রাম থেকে কবর খুঁড়ে কতগুলো লাশের হাড় এরকম ঢাকায় পাচার করেছ?'

'সত্যি বলছি, ছোট ভাই, এই প্রথম।'

'ফার্মগেটে যে সেবার দেখা হলো। না দেখার ভান করে বাসে উঠে পড়লে। সেবার?'

'আর ওই আরেকবার।'

'হুম। এরকম কত আরেকবার আছে তা আল্লাই জানে। আমার সাথে দেখা হয়নি বলে।'

'না ছোট ভাই, না। এই দুবারই লাশ তুলে হাড় এনেছি।'

'কবর খুঁড়ে?'

'হুঁ।'

'কেউ জানতে পারেনি?'

হামিদ দুদিকে মাথা নাড়ে।

'একেকটা লাশের হাড়ে কত করে পাচ্ছ?'

'সরকারী মেডিকেলগুলো কম দেয়। বেসরকারীতে আটের মত দিয়েছে।'

'ভালই ব্যবসা তো দেখছি। বিনা পুঁজির ব্যবসা। কবর থেকে লাশ তুলে এনে বেচে দিলেই হলো। কবরের বাসিন্দার তো আর প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই।'

'রিস্ক আছে ছোটভাই। পুলিশে ঝামেলা করে।'

'এর মধ্যে করেছে নাকি?'

'সন্দেহ করছে। তবে আমি যে করছি তা তো জানে না। আর আপনার আল্লার দোহাই লাগে, ছোটভাই, বাড়িতে কাউকে জানায়েন না।'

'ঠিক আছে, আমি কাউকে জানাব না। আমার উপরে বিশ্বাস রাখতে পার। কিন্তু তোমারও আল্লার দোহাই লাগে, এই ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু করার চেষ্টা করো। কবরের লাশ নিয়ে ব্যবসা করা ঠিক না। লাশের আত্মার অভিশাপ লাগে।'

হামিদ ভাই কী বুঝল কে জানে! মুখ গম্ভীর করে আমার সামনে থেকে উঠে গেল। অনুরোধ সত্ত্বেও আমার বাসায় যেতে রাজি হলো না। তাকে নাকি আজই গ্রামে ফিরতে হবে। জরুরি কাজ। বোধ হয় কবর খুঁড়ে আজ রাতে আরেকটা লাশ তুলবে।

বাসায় এসে দেখি আরেক কাণ্ড। আমার বন্ধু, ক্লাসমেট কাম রুমমেট হাসান, দেশের বাড়ি থেকে ফিরেছে। তার ছোটমামা এসেছে আমেরিকা থেকে। তার জন্য উন্নত মানের একটা ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে এসেছে। বাসায় এসেই ও সামনে যা পাচ্ছে, যাকে পাচ্ছে তাই ভিডিও করে নিচ্ছে। আমি রুমে ঢুকতেই আমার কর্মকাণ্ড ভিডিও শুরু হয়ে গেল। ওর কাণ্ডকারখানা দেখে বাথরুমে যেতেও ভয়

পাচ্ছি।

মেডিকেলের পড়া একঘেয়ে লাগার কারণেই কি না জানি না, হাসানের দেখাদেখি হাসানের সাথে ফিল্মের একটা কোর্সে ভর্তি হয়ে গেলাম। এপ্রিসিয়েশন কোর্স। হাসানের ভিডিও ক্যামেরাটা থাকায় আমাদের বেশ সুবিধে হয়েছে। বড় ক্যামেরার যে কাজ শিখছি তাই প্রয়োগ করছি ভিডিও ক্যামেরাতে। বত্রিশ, ষোলো না হোক, আট মিলিমিটারে কিছু বানানো তো শিখে নিয়েছি ইতিমধ্যে। তা ছাড়া, থার্ড প্রফেশন্যাল হয়ে যাওয়ায় হাতে কিছুটা বাড়তি সময়ও আছে। বেসরকারী মেডিকেলের সারেরা একটু ছাড় দিয়ে খাতা দেখেন। আর সাপ্লিমেন্টারি তো মেডিকেলের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত।

বাসা চেঞ্জ করেছি। অতবড় বাসায় অন্যদের সাথে বনছিল না বলে হাসান আর আমি বাসা ছেড়ে একটু ভেতরের দিকে, বলতে গেলে গ্রাম এলাকায় বাসা নিয়েছি। বাসাটা নতুন। এখনও কমপ্লিট হয়নি। আমরা দুজনই প্রথম ভাড়াটে। নীচতলার দরজা জানালা কমপ্লিট হলেও আমরা দোতলাটাই নিলাম। দোতলার প্লাস্টারের কাজ সহ কিছু কাজ এখনও বাকি। তাতে আমাদের অসুবিধে হচ্ছে না। জানালার গ্রীল দেয়া না থাকলেও কপাট আছে। তাতেই কাজ চলে যাচ্ছে।

ঈদের ছুটিতে বাড়ি যেয়ে ঘটনা জানতে পারলাম। হামিদ ভাই বর্তমানে ফেরারী আসামী। কবর থেকে লাশ চুরির ঘটনার পেছনে যে হামিদ ভাই জড়িত, পুলিশ জেনে ফেলেছে। কিছুদিন আগে মিত্র বাড়ির যতীন খুঁড়োর আকস্মিক উধাও হয়ে যাওয়ায় পুলিশ ধারণা করছে হামিদই খুঁড়োকে গুম করে খুঁড়োর লাশের কংকাল ঢাকায় পাচার করেছে। যতীন খুঁড়োকে এখনও পাওয়া যায়নি।

আমার একটু খারাপ লাগতে লাগল। কবর খুঁড়ে লাশ তোলার ব্যাপারে আমিই প্রথম পথ দেখাই। আর তার ফলেই হামিদ ভাই এই জঘন্য ঘৃণিত ব্যবসায় নেমে পড়ে। আমি পথ না দেখালে হয়তো তার এই অধঃপতন হত না।

ঢাকায় ফিরে মনে মনে হামিদ ভাইকে খুঁজতে থাকি। ফেরারী আসামীর লুকিয়ে থাকার জন্য ঢাকা আদর্শ স্থান। এত মানুষের ভিড়ে হারানো খুব সোজা।

আমাদের কলেজের কর্মচারী মামার কাছেও খোঁজ নিলাম, তারপরে আর কোনও লাশের কংকাল টংকাল বেচতে এসেছিল কিনা। নেগেটিভ উত্তর পেয়ে হামিদ ভাইকে খোঁজাই ছেড়ে দিয়েছি।

কালচারাল সেন্টার থেকে ফরাসী আর্ট ফিল্ম দেখে বাসায় ফিরলাম। হাসান যায়নি। বাসায় এসে দেখি আমার রুমের বিছানার উপরে হামিদ ভাই বসা। যারপর নাই বিস্মিত হলাম। আমার পরিচয় দেয়ায় হাসান তাকে আমার জন্য অপেক্ষা করতে বলেছে।

হামিদ ভাইকে কেমন যেন বিধ্বস্ত উস্কোখুস্কো দেখাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলে এতদিন?'

হামিদ ভাই কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'ঢাকাতেই ছিলাম। একটা বস্তিতে। কিন্তু সেখানকার বস্তি তুলে দিয়ে হাসপাতাল বানাচ্ছে।'

'তোমাকে আগেই নিষেধ করেছিলাম, হামিদ ভাই। তা তো শুনলে না। এখন তো শুনলাম মানুষ খুন করে নাকি কংকাল বের করা শুরু করেছ।'

'বিশ্বাস করো, ছোট ভাই। যতীন খুঁড়োকে আমি খুন করিনি। কোনও মানুষ খুন করে কখনও কংকাল নেইনি। যতীন খুঁড়ো যখন হারিয়ে গেছে, তখন আমি গ্রামেই ছিলাম না। শুধু শুধু আমার হয়রানি।'

'তা হলে সে বুড়ো গেল কই?'

'তার আমি কী জানি। গ্রামের কেউ হারিয়ে গেলেই আমার ঘাড়ে দোষ পড়বে নাকি?'

'যে কাজ করেছ তাতে তো পড়বেই। বুড়োকে খুঁজে বের করতে পারলে দোষ থেকে কিছুটা রেহাই পেতে।'

'কোথায় খুঁজে পাব সে বুড়োকে। হয়তো ইণ্ডিয়ায় চলে গেছে। হিন্দু মানুষ তো!'

'এখন ঢাকায় করছটা কী?'

হামিদ ভাই মাথা নিচু করে রইল। তার মাথা নিচু দেখেই বুঝলাম, এখানেও অবৈধ কাজ। যে-কাজের কথা মাথা উঁচু রেখে বলা যায় না।

'কী, হামিদ ভাই, সন্ত্রাসী চাঁদাবাজিটাজিতে জড়িয়ে পড়েছ নাকি? টেরর রাজ্যে কংকাল হামিদ নাম হয়ে গেছে নাকি তোমার?'

হামিদ ভাই জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলে, 'না, না, সেসব কিছু না। তবে কাজটা ভাল না। বস্তিতে ডাইলের ব্যবসা ধরেছিলাম কিছুদিন। বস্তি উঠে যাওয়ায় এখন বেকার। তাই ভাবলাম তোমার সাথে একটু দেখা করি। যদি তুমি কোনও কাজের খোঁজখবর দিতে পার।'

'আমি কাজের কী খোঁজখবর দেব। আমি থাকি নিজের পড়াশুনায়। এক কাজ করো, তোমার যখন কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, তখন আমার এখানে কিছুদিন থেকে কাজটাজ খোঁজ করো। এটুকু সাহায্য করতে পারি তোমায়।'

হামিদ ভাই কিছু বলল না। কিন্তু আমার এখানেই থাকতে লাগল। কাজটাজও তেমন খোঁজ করে না। খায় আর সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমায়। থাকতে বলেছি, কাজেই কিছু বলতে পারি না। কিন্তু এরকম বেকার ঘরে পড়ে থাকলে কে ওকে কাজ দেবে?

এর মধ্যে একদিন সুযোগ এসে গেল। আমাদের নতুন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কিছুটা এক্সটেনশন করা হয়েছে। অনেকগুলো বিভাগ বাড়ানো হয়েছে। এবং তার জন্য বেশ কিছু কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হবে।

আমি হাসান সহ কয়েক বন্ধু মিলে হামিদ ভাইকে কোথাও ঢোকানো যায় কি না সেই চেষ্টা করতে লাগলাম। চেষ্টায় সফলও হলাম।

হামিদ ভাইয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা এত কম যে, রাতের শিফটে মর্গ পাহারা দেয়া ছাড়া আর কোনও ক্যাটাগরিতে তাকে ঢোকানো গেল না। সেই চাকরি পেয়েই হামিদ ভাই কী খুশি!

কবর খুঁড়ে লাশ তোলায় অভ্যস্ত বলে একাকী রাতে মর্গে লাশ পাহারা দেয়ার চাকরি হামিদ ভাইয়ের কাছে ভয়ের কিছু মনে হলো না।

রাতে মর্গে শুরু হলো হামিদ ভাইয়ের পাহারাদারী।

চার

রাতের চাকরির জন্য হামিদ ভাইকে আর কোথাও যেতে দেইনি। আমাদের এখানে দিনে পড়ে পড়ে ঘুমায়। আমরা ক্লাসে থাকি। আবার রাতে হামিদ ভাই চলে যায় মর্গে।

মর্গে, অর্থাৎ লাশ-কাটা ঘরে হামিদ ভাইয়ের তেমন কোনও কাজ নেই। শুধু লাশের ড্রয়ারগুলো নাম্বার মিলিয়ে দেখেশুনে রাখতে হয়। মড়াগুলো থাকে ড্রয়ারের মধ্যে।

নাম্বার মিলিয়ে মড়াগুলো দেখে নেয়ার পরে হামিদ ভাইয়ের তেমন কোনও কাজ থাকে না। মড়ার ঘরে আলো বেশ কম। কম পাওয়ারের বাতি জ্বলে। তাতে হামিদ ভাইয়ের সুবিধেই হয়। কোনও ট্রলিতে উঠে হালকা ঘুম দিয়ে নেয়। অনেক সময় দেখা যায়, এক ঘুমেই রাত কাবার। মর্গে মৃতদেহ আনার জন্য ট্রলিগুলো ব্যবহার করা হয়। সেজন্য ট্রলিগুলোতে চাকা লাগানো। শুয়ে পড়লে এক জায়গায় স্থির থাকে না। বড় নড়াচড়া করে। এজন্য সে ট্রলির চার চাকার পাশে ইঁট দিয়ে রাখে, যাতে নড়েচড়ে ঘুমের ডিস্টার্ব না হয়।

ইঁট দেয়ার পরেও ইদানীং তার ঘুমের ডিস্টার্ব হচ্ছে। রাত একটু ভারী হলে শেষ বারের মত ড্রয়ারের লাশগুলো দেখেশুনে সে লাশের ট্রলিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে।

লাশ-কাটা ঘরে শুলেই কী আর ঘুম আসে? কত আজেবাজে ভয়ঙ্কর চিন্তা মাথায় আসে। কবর খুঁড়ে লাশ-তোলার সময় এত ভয় করত না।

ইদানীং ট্রলিতে শুয়ে একটু চোখ বুজে এলেই তার মনে হয় ড্রয়ারের ভেতরের লাশগুলো নড়াচড়া করছে। ড্রয়ার ঠেলে বেরোনোর চেষ্টা করছে। প্রথম প্রথম এরকম অনুভূতি হওয়ার পর সে উঠে দেখত ব্যাপারটা কী। মড়াগুলো কি জ্যান্ত হয়ে উঠল?

কিন্তু খুলে দেখা যেত সব ঠিকঠাক আছে। কাটাকুটির জন্য রাখা লাশগুলো পড়ে আছে নিস্তেজ হয়ে। যেমনটি থাকার কথা।

সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় ঘুমিয়ে গেলে। মরণঘুম এসে ধরে যেন তাকে। লাশের ট্রলির উপর সে নিজেও চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে লাশের মত। যেন সে একটা মৃতদেহ। ঘুমিয়ে গেলে নিজেকে তার মৃতদেহ মনে হতে থাকে। সামান্যতম নড়াচড়া নেই। যেমন মৃতদেহের থাকে না।

পাঁচ

একদিন ক্লাস শেষে হাসান অ্যাপ্রন খুলতে খুলতে বলল, 'ক্যামেরাটা বেকার পড়ে আছে। কিছু শুটিংটুটিং করতে পারছি না।'

'কী শুটিং করবি? আগে সাবজেক্ট বের কর।'

'ভাবছি আমাদের লাশকাটার দৃশ্য শুটিং করলে কেমন হয়?'

'তুই কি ভৌতিক কিছু বানানোর কথা চিন্তা করছিস?'

'কিছু করে তো হাত পাকানো উচিত। তা ছাড়া, তুইও ভেবে দেখ, শুধু লাশকাটার দৃশ্য ধারণ করতে পারলে একটা নতুন কিছু করা হবে।'

'কিন্তু সারেরা লাশ কাটা ঘরে শুটিং করতে দেবে বলে মনে হয় না।'

'আমিও সেটাই ভাবছি। কী করা যায়? একটা আস্ত তাজা লাশ যদি কোনওভাবে ম্যানেজ করা যেত!'

'লাশ এত সোজা জিনিস ভেবেছিস নাকি! বেওয়ারিশগুলোও আঞ্জুমানে মফিদুলে চলে যায়।'

হাসান হঠাৎ উজ্জ্বল চোখে বলল, 'আচ্ছা, হামিদ ভাই কি একটা ব্যবস্থা করতে পারে না। লাশ-কাটা ঘরে কাজ করে। অনেক লাশ নিয়েই তো কারবার।'

'ওইসব লাশের হিসেবপত্র আছে সে তুই ভাল করেই জানিস।'

'কোনও একটা বেওয়ারিশ লাশে নাম্বারটাম্বার না দিয়ে হাপিস করে দিল।'

'ওর চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।'

'আরে না। তুই যা ভাবছিস অত কঠিন কিছু না। হামিদ ভাই করিৎকর্মা লোক। বললে কোনও না কোনও ভাবে ম্যানেজ করে ফেলবে।'

'তুইই বলে দেখ তা হলে।'

'আমার চেয়ে তোর কথায় কাজ হবে বেশি। হামিদ ভাই তোর জন্য জান পেহেচান। তোর মুখের কথা ওর কাছে ঈশ্বরের আদেশ।'

আমি কৌতূহলের সুরে বললাম, 'কিন্তু লাশ এনে ডিসেকশান করবি কোথায়?'

'সেটা কোনও সমস্যা না। আমাদের রুমেই করব। আর করবি তুই।'

'আমি মানে? ওসবের মধ্যে আমি নেই। তোর প্ল্যান, তুই যা পারিস কর। আমি হামিদ ভাইকে বলে দেখতে পারি। আমি ডিসেকশান করলে তুই নিজে করবিটা কী, শুনি?'

'বোকার মত কথা বলিসনে। আমি তো থাকব ক্যামেরার পিছনে।'

'আমার মেধা তো তুই জানিস। প্রাকটিক্যালেই কোনওদিন ডিসেকশানে ভালমত হাত লাগাইনি। কাটাকুটি ভালমত পারিই না।'

'আরে গাধা, আমরা তো আর মেডিকেলের সিডি বানাচ্ছি না যে ডিসেকশান শেখাব। আমার প্ল্যানটা আগে শোন। তারপর কথা বল। শোন, কোরবানির

ঈদের সময় গরু-ছাগল ছেলা দেখেছিস?'

'তো?'

'তুই লাশটার চামড়া ঠিক ওই ভাবে ধীরে ধীরে ছিলবি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত। গোটা লাশটার চামড়া ছাড়িয়ে ফেলবি। ওই দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করব আমি। চামড়া ছেলা হয়ে গেলে শুরু করব মাংস ছাড়ানো। ঠিক কোরবানির গরুর মাংস পিস পিস করার মত করে পিস পিস করব টোটাল বডি। চোখ, কান, নাক, গলা, মাথা, হাত-পা, আঙুল সব আলাদা আলাদা করবি। আর সেই আলাদা করার দৃশ্য উঠে আসবে ক্যামেরায়।'

'মাথা খারাপ হয়েছে তোর! ধর, সবকিছুই তোর কথা মত করলাম। কিন্তু কোথাও চালাতে পারবি না ও জিনিস। ওই দৃশ্য দেখে কেউ রাতে স্বাভাবিকভাবে ঘুমাতে পারবে না। আর সেন্সর বোর্ড বলে একটা জিনিস আছে। সেখান থেকে কখনোই অনুমতি পাবি না তুই।'

'সেন্সর বোর্ড অনুমতি দেবে না বলে হাত-পা কোলে করে বসে থাকব? কিছু করব না? এমন মহৎ পরিকল্পনা মাঠে মারা যাবে?'

'কী মহৎ পরিকল্পনা তোমার! লাশ কাটার দৃশ্য ধারণ! আমি ওসবের মধ্যে নেই।'

হাসান শীতল গলায় বলল, 'ঠিক আছে। তোকে লাশ কাটতে হবে না। আমি অন্য কাউকে নেব। তুই শুধু দেখ লাশের ব্যবস্থাটা করে দিতে পারিস কি না।'

'দেখি।'

ছয়

হামিদ ভাইকে লাশের কথা বলতেই একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'কবে লাগবে, ছোটভাই?'

হাসান বলে উঠল, 'আমাদের তাড়া নেই। আপনি যখন সুবিধে করতে পারেন, তখন হলেই চলবে।'

'দু'চারদিনের মধ্যে যদি ব্যবস্থা করি? অসুবিধা হবে?'

আমি দুদিকে মাথা নেড়ে বললাম, 'না, না, দেরিতে আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না। তোমার অসুবিধে না হলেই হলো।'

'অসুবিধে আর কী! যারা লাশ বাসায় পৌঁছে দেবে ওদের কিছু টাকা খাওয়াতে হবে।'

হাসান তড়িঘড়ি করে বলে উঠল, 'টাকা নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না, হামিদ ভাই। টাকার ব্যবস্থা করাই আছে। আপনি শুধু লাশ দেন।'

'কেমন লাশ দরকার?'

'দুর্ঘটনায় হাত পা কাটা লাশ হলে চলবে না। টাটকা, তাজা আর অল্পবয়স্ক লাশ হলেই ভাল হয়।'

হাসান আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বলল, 'সবচেয়ে ভাল হয় যুবতী মেয়ের লাশ হলে। শুটিং ও কাটাকুটি দুই সময়েই আরাম পাওয়া যাবে। না কী বলিস!'

হামিদ ভাই বলল, 'মেয়েদের লাশ পাওয়া কঠিন। বেওয়ারিশ তো আরও। মেয়েরা সহজে মরে না।'

আমি বললাম, 'ওর কথা বাদ দাও তো, হামিদ ভাই। পুরুষ লাশই যথেষ্ট। মেয়েদের লাশ কাটা ঝামেলা। স্কিনের নীচে প্রচুর ফ্যাট থাকে। কাটতে তো হবে আমাকেই। চর্বিতে মাখামাখি হয়ে যাব।'

হাসান কৃতজ্ঞ চোখে আমার দিকে তাকাল।

হামিদ ভাই রাতে বেরুনোর আগে বলল, 'লাশ পাঠানোর আগে আমি জানাব। রাতেই পাচার করতে হবে। আপনারা রেডি থাইকেন।'

সাত

তিনদিন হয়ে গেল হামিদ ভাই কোনও রেসপন্স করে না। আমরা পড়াশুনায় লেগে গেছি। হাসান অবশ্য ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত।

পরদিন বিকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে হামিদ ভাই বলল, 'আজ রাতে একটা লাশ আসবে মর্গে। বেওয়ারিশ লাশ। আপনাদের পছন্দমত লাশই। খবর পেয়েছি লাশটা তাজা এবং যুবক। কিন্তু লাশ আনতে গেলে আপনাদের একটু কাজ করতে হবে।'

'কী কাজ?'

'কাজটা হলো মর্গে যে দিনে ডিউটি করে, সালাম ভাই, তাকে বলা আছে, সে লাশটা একটা ট্রলির উপর চাদর দিয়ে ঢেকে রাখবে। নাম্বার না দেয়ায় ওই লাশ ড্রয়ারে ঢোকানো হবে না। একটা কাঠের সস্তা কফিন কিনে নিয়ে মর্গের ট্রলি থেকে ওই লাশটা নিয়ে আসতে হবে।'

'আমাদের? আপনি থাকবেন না?'

'আমি থাকার চেষ্টা করব। যদি না থাকি, তবু ওখানে লাশ নিয়ে আসে এরকম দুজন কর্মচারীকে বলা থাকবে। তারাই লাশ বের করতে কাজে সাহায্য করবে।'

'আপনি মর্গে না থাকলে কই থাকবেন?'

'দেখি, থাকার চেষ্টা তো করবই। না থাকলে ওদের কাছে চাবি দিয়ে যাব। আজ রাতে লাশের খবর জানতে একজায়গায় যাওয়ার কথা আছে। না গেলে হয়তো মর্গে থাকতে পারি। ঠিক বলতে পারছি না। আমি সব বলে রাখব। আপনারা গেলেই ম্যানেজ করে দেবে। আর মেডিকেলের আইডি কার্ড দেখালে রাস্তায় পুলিশি ঝামেলা এড়াতে পারবেন।'

'তবু আপনি স্পটে থেকে আমাদের সাথে সাথে বাসায় ফিরলে ভাল

করতেন।'

'আরে না, না, রাতে যেখানেই থাকি, ফিরে এসে আমাকে লাশকাটা ঘর পাহারা দিতে হবে। জীবিত মানুষের চেয়ে মৃত মানুষের পাহারাটা জরুরি। মৃতের শক্তি বেশি।'

হামিদ ভাইয়ের কথা মত একটু বেশি রাতেই মেডিকেলে গেলাম। কফিনের ভ্যান আগেই ঠিক করে রেখেছি। তা ছাড়া, মেডিকেল থেকে আমাদের বাসার দূরত্ব বেশি নয়। মেঘলা রাতে এটুকু রাস্তা চোখের পলকেই চলে আসতে পারব।

মেডিকেলে এসে হামিদ ভাইয়ের দেখা পেলাম না। অনেক খুঁজে পেতে একজনকে পেলাম, যে লাশের ট্রলি টানে। সে-ও নতুন। কিছুদিন এসেছে। যার সাথে হামিদ ভাইয়ের কথা হয়ে আছে, তার মেয়ের নাকি হঠাৎ জ্বর ওঠায় বাড়িতে গেছে। এর কাছে সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। চাবিও এর কাছে।

নতুন লোকটা দেখি ভয়ে আধমরা। লাশ-কাটা ঘরের ভয়, নাকি অবৈধ কাজ করার ভয় ঠিক বুঝলাম না। কিন্তু নাচতে নেমে আমাদের এখন আর ভয় পেলে চলবে না। তা ছাড়া, বাসায় বসে ভাবার চেয়ে একবার স্পটে চলে আসলে ভয়ডর অনেক কমে যায়। তখন কাজই বড় হয়ে দেখা দেয়। তা ছাড়া, যেখানে রাতের পর রাত হামিদ ভাই পাহারা দিচ্ছে, সেখানে সামান্য সময়ের জন্য ঢুকেই বের হয়ে আসব। এতে ভয়ের কী!

নতুন লোকটা চাবি দিয়ে ভয়ে ভয়ে মর্গের দরজা খুলে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রায়ান্ধকার ঘর। ল্যাশেরা বোধ হয় উজ্জ্বল আলো সহ্য করতে পারে না। প্রায়ান্ধকার ঘরে লাশের সারি সারি ড্রয়ারগুলো দেখতে পাচ্ছি। আর দেখছি ট্রলির উপরে সাদা চাদরে ঢাকা লাশ। বোধ হয় সদ্য আনা।

আমি লোকটার দিকে তাকিয়ে ঝাঁঝাল কণ্ঠে বললাম, 'ব্যাপার কী? বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবা নাকি? ভেতরে এসে কোন্ লাশটা আমাদের দেখাও। ধরে নিয়ে কফিনে ঢোকাও।'

লোকটা ধীর পায়ে মর্গে ঢোকে। ভয়ে ভয়ে কোনও দিকে না তাকিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়।

হাসান ধমক দেয়, 'আমাদের পিছনে হাত-পা গুটিয়ে না দাঁড়িয়ে থেকে দেখাও কোনটা তোমার লাশ। লাশের কাছে যাও। নামাও ট্রলি থেকে।'

লোকটা পায়ে পায়ে হেঁটে একটা ট্রলির পাশে এসে দাঁড়ায়। এই ট্রলিটা একটু অন্যরকম। চাকার কাছে ইঁট দেয়া। নষ্ট ট্রলির ব্যাপার স্যাপার হয়তো! ও নিয়ে মাথা ঘামালাম না।

লোকটা এবার যেন একটু সাহস সঞ্চয় করে সাদা কাপড় ঢাকা লাশটা মুড়িয়ে বেঁধে ফেলে।

হাসান বলে, 'লাশের গায়ে জামাকাপড় ছিল না?'

'জ্বে, ছিল।'

'খুলে নিয়েছ?'

লোকটা উপর নীচ মাথা নাড়ে।

আমরা তিনজনে ধরে আপাদমস্তক মুড়ানো লাশটা বারান্দায় রাখা কফিনে ঢোকাই।

কফিন নিয়ে বাইরে ভ্যানের উপর তুলতে দেখি টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির জোর আরও বাড়ার আগে এই মধ্যরাতে বাসায় পৌঁছাতে হবে।

বাসার কাছে এসে দেখি গোটা এলাকায় ইলেকট্রিসিটি নেই। শহরের একটু বাইরে এই এলাকায় গ্রাম্য ভাব প্রবল। আর সে কারণেই একটু বৃষ্টিবাদলা হলেই লাইন অফ থাকে। ঝড় বৃষ্টি চলে গেলেও সে লাইন আর আসে না। সেজন্য ডজন ধরে মোমবাতি কিনে রাখি।

অন্ধকারের মধ্যে ভ্যানওয়ালা সহ কফিন ধরে দোতলায় তুলি। মোবাইলের আলোয় পথ দেখে প্লাস্টার না করা সিঁড়ি ভাঙছি। আর কোনও ভাড়াটে না থাকায় অহেতুক প্রশ্নের ঝামেলা থেকে বেঁচে গেছি।

ভ্যানওয়ালা এত ধরাধরি করায় চুক্তির চেয়ে আরও বিশটাকা বেশি দেই। লোকটা খুশি হয়ে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ে।

রুমে ঢুকে হাসান মোমবাতি ধরাতে ধরাতে বলে, 'বৃষ্টির যে বেগ সাথে ঝড় বাড়ছে। আজ রাতে আর কারেন্ট আসবে না বোধ হয়। কোথাও ট্র্যান্সফর্মারটার গেছে হয়তো।'

বারান্দায় রাখা কাঠের ভারী কফিনটা একপাশে সরিয়ে বাথরুমে যাওয়ার পথ বের করতে করতে বলি, 'মোমের আলোয় শুটিং করবি নাকি?'

হাসান উত্তেজিত গলায় বলল, 'সেইটাই একসেলেন্ট হবে মনে হচ্ছে। মোমের স্বল্প আলো আঁধারিতে লাশকাটার পরিবেশটা আরও ভয়ের হবে। ভয়ের ছবিতে পরিবেশটাই আসল।'

'ঠিক আছে, কাজে যখন হাত দিয়েছি, তখন সেটা শেষ করাই ভাল।'

'আগে খেয়ে নেই, না কী বলিস?'

'তুই খেতে চাইলে খা। কোনও খাবার এখন আমার মুখে উঠবে না। খিদে নষ্ট হয়ে গেছে।'

'আমারও খাওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই। নতুন কিছু করার উত্তেজনায় খিদে নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তেজনা খিদে নষ্ট করে।'

'তুই তোর ক্যামেরার লেন্সটেন্স সব ঠিকঠাক কর। আমি একটু হাতমুখ ধুয়ে আসি।'

'হাতমুখ ধোয়ার আগে কফিন থেকে লাশটা বের করে নিই। ডিসেকশান টেবিলে তুলে দে। টেবিলে লাশ থাকলে ক্যামেরার এঙ্গেল ঠিক করতে সুবিধে হবে। আর হাতমুখ ধুয়ে করবিটা কী? এখনই তো ছুরিকাঁচি নিয়ে লাশ কাটতে হবে।'

'ঠিক আছে, লাশ ধরছি। শোন, তুই ড্রয়ার ট্রেয়ার থেকে যেখানে যা ডিসেকশানের যন্ত্রপাতি আছে বের কর। আর মাংসের টুকরো যে করবি, কসাইখানা থেকে চাপাতি এনেছিস? নাকি বটি দিয়ে করবি?'

হাসান মৃদু গলায় বলল, 'এনেছি। তোর টেবিলের তলায় খবরের কাগজে

মোড়া আছে। সাবধানে নিস। নতুন জিনিস।'

আমি আর কিছু না বলে কফিন থেকে লাশ বের করার কাজে মনোযোগ দিলাম। সব গুছিয়েই রেখেছে তা হলে? হাসান ভয়ঙ্কর ছবি তৈরি করবেই। আজ রাতেই।

বাথরুম থেকে রুমে ঢুকে দেখি রুম আলো আলো। ক্যামেরার নির্দিষ্টমুখী আলো পড়ে আছে সাদা চাদরের ফাঁক থেকে বের করা কালো সবল দুটি পায়ের পাতার উপর। টেবিলের উপর লাল রঙের মোমবাতি জ্বলছে। বাইরে ঝড় বৃষ্টি। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমক। অদ্ভুত আলোআঁধারি পরিবেশ।

হাসান আমাকে দেখে বলল, 'বাইরের বিদ্যুৎ চমকটা ধরতে পারলে আরও এক্সাইটিং হত। অবশ্য ল্যাবেও করা যাবে। ভাবছি বাইরে ঝড়বৃষ্টির দৃশ্য আর ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎ চমকানি দিয়ে দেব।

আমি কালো পা দুটোর দিকে তাকিয়ে তোয়ালে দিয়ে হাতের পানি মুছতে মুছতে বললাম, 'শুধু পায়ের কাছে খুললি কেন? পুরো চাদরটাই সরিয়ে ফেল।' বলে আমি চাদর ধরে টান দিতে যেতেই হাসান ঘাড়ের উপর ক্যামেরা ধরে রেখেই হাঁ-হাঁ করে আমার হাত থেকে চাদর ছাড়িয়ে নিল।

'কী করছিস কী? এখনই পুরো চাদরটা খুললে আমার প্ল্যান ভেস্তে যাবে। শোন, আমি যেভাবে বলি সেভাবেই কর। আমি এখন ক্যামেরাম্যান কাম পরিচালক। তুই আমার অভিনেতা।'

আমি একটু রাগী গলায় বললাম, 'কী করতে হবে, বল?'

'পুরো লাশেরই ছাল আমরা ছাড়াব, কিন্তু আস্তে আস্তে। পা থেকে ছিলতে ছিলতে মাথা পর্যন্ত উঠব। তা হলে গোটা চামড়া ছাড়ানো শরীর দেখলে দর্শক ভিরমি খাবে। আর পুরোটা খুলে চামড়া ছাড়াতে থাকলে প্রথমে একটু ভয় পেলেও খালি শরীর দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর ভয় পাবে না। চামড়া ছাড়ানো শরীর দেখেও না।'

আমি শক্ত হয়ে যাওয়া খোলা কালো পায়ে হাত দিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে, তুই যেভাবে বলিস। এখন দে স্কালপোলটা। আর টুইজার।'

হাসান আবার হাঁ-হাঁ করে বলে ওঠে, 'এখনই না। তোর পোশাক আশাক ঠিক করতে হবে।'

'মেকাপ নিতে হবে নাকি?'

'কিছুটা। তোর জন্য কালো আলখাল্লা ভাড়া করে এনেছি। আলখাল্লা পরেই কাজ করতে হবে।'

'এই গরমে আলখাল্লা পরতে হবে! কারেন্ট নেই। ফ্যানও চলছে না।'

'গরম দেখলি কোথায়? বাইরে ঝড়বৃষ্টি। ঠাণ্ডা হাওয়া। আমার টেবিলের উপর আছে আলখাল্লাটা। নে, দোস্ত, পরে নে। তাড়াতাড়ি কর। আলখাল্লার সাথে দেখ মাথা সুচালো কালো টুপি আছে। ওটা মাথায় পর। আর মুখে কালো কাপড় বেঁধে নে। শুধু চোখ খোলা থাকবে।'

আমি কথা না বাড়িয়ে ও যা যা করতে বলল করলাম। সব পরে হাত কিছুটা গুটিয়ে ছুরি চিমটি নিয়ে লেগে পড়লাম লাশের চামড়া ছিলতে। সহজ কাজ নয়।

প্রথম প্রথম হাত কাঁপতে লাগল। হাসান বলল, 'এডিটিংয়ের সময় ওসব বাদ ছাদ দিতে হবে।' আমি যেন আমার মত চামড়া ছেলার কাজ করে যাই।

কালো আলখাল্লার মধ্যে ঘামের স্রোত বইয়ে আমি যন্ত্রের মত লাশের চামড়া ছিলি। যখন কষ্ট হয় বসে জিরিয়ে নিই। পানি খাই। হাসান ক্যামেরা বন্ধ করে বারান্দায় একটু হাঁটাহাঁটি করে আসে।

পা থেকে চামড়া ছিলে বুক পর্যন্ত আসতে আসতে রাত তিনটে বেজে গেল। মোমবাতি সব ফুরিয়ে আসছে।

আরও ঘণ্টাখানেক লাগিয়ে বুকের দিকটা আর দুই হাত শেষ করলাম। এবার লাশ উল্টে পিঠের দিকে যাব। সব শেষে মাথা।

ক্যামেরা এবং তার আলো বন্ধ রেখে হাসানও হাত লাগাল লাশের পাশ ফিরিয়ে উল্টে দিতে।

উল্টোনোর সময় অসাবধানে লাশের চাদর পুরোটা খুলে গেল। শুটিং করছি না বলে সাবধানতার প্রয়োজন বোধ করিনি।

মোমবাতির স্বল্প আলোয় মুখ থেকে কাপড় সরে যেতেই লাশের মুখটা খুব চেনা মনে হলো।

হাসানও দেখেছে মুখটা। সে কাঁপা কাঁপা গলায় আমার নাম ধরে ডাকল।

আর ঠিক সেই সময় জানালা দিয়ে আসা বাইরের দমকা বাতাসে মোমবাতি নিভে গেল।

আমরা ডুবে গেলাম অন্ধকার আর ভয়ের রাজ্যে।

হাসান কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'লাশের মুখটা দেখেছিস!'

ধকল সামলে উঠতে আমার সময় লাগল। একটু ধাতস্থ হয়ে বললাম, 'হুঁ।' এর বেশি কথা জোগাল না মুখে।

'কেমন যেন হামিদ ভাইয়ের মত চেহারা। মনে হয় যেন হামিদ ভাই-ই।'

আমি ভয়ার্ত স্বরে বললাম, 'মোমটা জ্বালা। দেখি ব্যাপারটা কী।'

হাসান অনেকক্ষণ অন্ধকারে হাতড়াহাতড়ি করল। মোম পেল না। যেটা জ্বলে শেষ পর্যায়ে এসেছিল সেটা ছাড়া আর কোনও মোম নেই। সেটাও পাওয়া যাচ্ছে না। টেবিলের যেখানে রেখেছিলাম, সেখানটা ফাঁকা। গলা মোম পড়ে আছে। শেষ হয়ে গিয়েছিল নাকি?

আমি ঝাঁঝাল গলায় বলতে চাইলাম, বের হলো চিঁচিঁ স্বর, 'মোম না থাক, লাইটারটা জ্বালাতে পারিস!'

'ওটাও পাচ্ছি না। কোথায় রেখেছিলাম যেন। লাশের টেবিলে মনে হয়। লাশের বুকের তলে পড়ে গেছে।'

'কিছু না পেলে অন্তত তোর ক্যামেরার লাইট জ্বালা। তাতেই দেখি। ভয়ের ছবি করতে এসে দেখি নিজেরাই ভয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। লাশের চেহারা হামিদ ভাইয়ের মত কেন?'

হাসান খাটের উপর থেকে ক্যামেরা নিয়ে অন্ধকারে সুইচ টুইচ টিপছে। এমন সময় বাইরে ঝড়বৃষ্টির সাথে বিদ্যুৎ চমকে ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরের ভেতর যেন এক ঝলক দেখা গেল।

আর সেই এক ঝলক আলোয় দেখলাম ডিসেকশান টেবিল শূন্য। কেউ নেই। সাদা চাদরটা পর্যন্ত।

আমার গলা দিয়ে স্বর ফুটল না।

এর মধ্যে হাসান ক্যামেরার আলো জ্বেলে ফেলেছে। সে আলোয় আগে যা দেখেছিলাম তাই-ই দেখলাম।

ডিসেকশানের লম্বা টেবিলটা শূন্য। শুধু কালচেটে রক্তের দাগ লেগে আছে। আর পড়ে আছে স্কালপোল, টুইজার, চিমটে—এসব।

ঘরের মধ্যে দুজনেই নীরব। হাসান অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ক্যামেরার আলো ঘরের চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে থাকে।

কোথাও কিচ্ছু নেই। কেউ নেই। শুধু গাড়ি বারান্দার ওপরের গ্রীল ছাড়া জানালাটা খোলা। বাইরে ঝড়বৃষ্টির গর্জন।

হাসানের হাতের ক্যামেরার আলো কমে আসছে। বোধহয় ব্যাটারির চার্জ ফুরিয়ে আসছে। কম সময় তো আর কাজ করা হচ্ছে না।

হঠাৎ মনে হলো জানালার কাছে কীসের যেন শব্দ হচ্ছে। শব্দটা ঝড়জলের শব্দ না। প্রচণ্ড ব্যথায় কাতর কেউ গোঙালে যেরকম শব্দ হয় সেরকম।

আমার বলা লাগল না। হাসান ক্যামেরা নিভু নিভু আলোর মুখ ঘুরিয়ে জানালার দিকে নিল।

যে দৃশ্য দেখলাম তাতে তখনই অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ডাক্তারি পড়তে পড়তে বোধহয় নার্ভ শক্ত হয়ে গেছে। তা ছাড়া, আরও একটা ব্যাপার আছে। প্রচণ্ড ভয়াবহ কোনও ঘটনার মুখোমুখি হলে হঠাৎ করে মানুষের ভয় উবে যায়। এক জাতীয় এনজাইম শরীরে চলে আসে। সেই এনজাইম গ্লুকোজ ভাঙতে সাহায্য করে। প্রচুর গ্লুকোজ ভাঙতে শুরু করে। শারীরিক শক্তি চলে আসে। ভয় কমে যায়। অনেকসময় পুরোপুরি চলে যায়।

আমাদের দুজনেরই হঠাৎ করে ভয় চলে গেল। আমরা বেশ স্বাভাবিক ভাবে দেখলাম আমাদের খোলা জানালা গলিয়ে একটা চামড়া ছাড়ানো মৃতদেহ ভেতরে ঢুকছে। মৃতদেহের ছাড়ানো চামড়ার চর্বির স্তরের উপর দিয়ে টপ টপ করে বৃষ্টির পানি ঝরছে।

মৃতদেহের মুখটা হামিদ ভাইয়ের।

চামড়া ছাড়ানো মৃতদেহটা টুপ করে জানালা গলিয়ে ভেতরে লাফিয়ে পড়ল। গলা দিয়ে একটা আর্তনাদ ভেসে এল। আর তখনই ক্যামেরার লাইট পুরোপুরি নিভে গেল।

আমরা ডুবে গেলাম অন্ধকারে। এখন আমাদের দুজনের সাথে ঘরে আছে মুখ পিঠ বাদে বাকি শরীরের চামড়া ছাড়ানো একটা পরিচিত মৃতদেহ। যে মৃতদেহটা এতদিন এই ঘরেই বাস করত।

দুজনের মধ্যে আবার ভয় ফিরে এসেছে। এক খাটের উপর দুজনে জবুথবু হয়ে বসেছি। একজন আরেকজনকে ছুঁয়ে।

ঘরের মধ্যে 'আহ উহ' শব্দ করতে করতে হামিদ ভাই হাঁটাহাঁটি করছে। এই ঘর হামিদ ভাইয়ের পরিচিত। হাঁটতে হাঁটতে মনে হয় বাথরুম বা রান্নাঘরের

দিকে একবার গেল। আবার ফিরেও এল মনে হয় কিছুক্ষণ পর।

হঠাৎ হামিদ ভাইয়ের পরিচিত গলা শোনা গেল, 'বড় যন্ত্রণা। ছোট ভাই, বড় যন্ত্রণা শরীর জুড়ে। বড় তেষ্টা পেয়েছে। একটু পানি খাওয়াতে পারেন?'

আমাদের মুখে কথা সরে না।

'ও হো, বাইরের বাতাস শরীরে লাগলেও জ্বলে যাচ্ছে। পুড়ে যাচ্ছে যেন গোটা শরীর। ওহ্ কী যন্ত্রণা! ওহ্!'

হামিদ ভাইয়ের গলা দিয়ে একজাতীয় জান্তব আওয়াজ বের হতে থাকে।

আমি কিছুটা সাহসে ভর দিয়ে ডাকি, 'হামিদ ভাই?'

ঘরের কোণ থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব আসে, 'বলেন, ছোটভাই। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। ওহ! অসহ্য যন্ত্রণা! চামড়া চাই! চামড়া! দিতে পারেন, ছোটভাই?'

হাসান পাশ থেকে বলে উঠল, 'তুমি হামিদ ভাই নও। তুমি আমাদের চোখের ভুল। তুমি মরা লাশ। মর্গের টেবিল থেকে আমরা তোমাকে তুলে নিয়ে এসেছি। কাজ করতে করতে আমাদের দুজনেরই মাথা আউলা হয়ে গেছে বলে সব ভুল দেখছি। তুমি কিছু না। চোখের হ্যালুসিনেশন।'

ঘরের কোনা থেকে অতিকষ্টে হাসির শব্দ ভেসে আসে। এই শব্দের সাথেও আমি পরিচিত। হামিদ ভাইয়ের হাসি। সব মানুষের কান্নার ধরন এক। হাসি ভিন্ন। একেক মানুষের হাসি একেক রকম।

হামিদ ভাই টেনে টেনে অতিকষ্টে বলে, 'লাশকাটা ঘরের ট্রলির উপরে আমিই ছিলাম। রাতে ওখানেই ঘুমাতাম আমি। ওটার চাকায় ইঁট দিয়ে রেখেছিলাম যাতে না নড়ে।'

হঠাৎ আমার ইঁটের কথা মনে পড়ে গেল। আমি বললাম, 'ইঁটগুলো আমি দেখেছি।'

হাম্মিদ ভাই টেনে টেনে বলে, 'যেখানে লাশ আনতে যাওয়ার কথা, ওখানে লাশ না পেয়ে তাড়াতাড়ি মেডিকেলে ফিরে আসি। এসে মর্গ খোলাই পাই। ভেতরে ঢুকে কিছু করার নেই দেখে আমার ট্রলিতে শুয়ে পড়ি। হালকা আলো চোখে লাগছিল বলে সাদা চাদর মুড়ি দেই। ঘুমিয়ে পড়ি। আর ওই মড়া টানা ট্রলিতে ঘুমিয়ে পড়লে আমার যে কী হয়, ঠিক মরার মত হয়ে যাই আমি। শরীরে মৃতের সব লক্ষণ চলে আসে। সকালে আবার ঠিক হয়ে যায়। ব্যাপারটা ঘটলেও কোনও ক্ষতি হচ্ছে না ভেবে কাউকে জানাইনি। তাতে চাকরি চলে যেতে পারে। ওখানে আমার ঘুমানোর কথা না। আজও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মড়ার ঘুম। তারপর ঘুম ভাঙতেই দেখি আমি এই অন্ধকার ঘরে। শরীরে অসহনীয় যন্ত্রণা। কিছু বুঝে ওঠার আগে জানালা গলিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়লাম। বৃষ্টির ফোঁটা চামড়া ছিলা শরীরে পড়তেই যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেল। আবার ফিরেও এলাম ঘরে। একটু পানি খাব। বড়ই তেষ্টা!'

আমি ঢোক চেপে কোনওমতে বললাম, 'হামিদ ভাই, আমার টেবিলের উপর জগ গ্লাস আছে। নিয়ে খাও।'

অন্ধকারে কিছু সরসর করে সরে যেতে থাকে। পা টেনে টেনে হাঁটার শব্দ হয়। তারপর ঢকঢক করে পানি খাওয়ার শব্দ। পুরো জগই শেষ করে ফেলেছে

বোধ হয়।

পানি খাওয়া শেষ করে তৃপ্তির শ্বাস নিয়ে বলে, 'ছোটভাই, আমার চামড়াটা আমারে দিয়ে দেন। চামড়া ছাড়া বড় কষ্ট।'

তারপর অন্ধকারে ছায়ামূর্তিটা কিছু যেন হাতড়াতে থাকে। এঘর ওঘর রান্নাঘর করতে থাকে।

একসময় বৃষ্টি থামে। আর বিদ্যুৎ চমকের আলোয় আমরা দেখি চামড়াবিহীন মূর্তিটা জানালা দিয়ে 'বড় কষ্ট' বলে লাফ দেয়। তার হাতে কী যেন ধরা।

এই সময় ফজরের আজান পড়ে।

ঝড় থামায় ইলেকট্রিসিটি চলে আসে।

ঘরের মধ্যে তাকিয়ে দেখি গোটা ঘর বিধ্বস্ত। তন্নতন্ন করে কিছু খুঁজেছে কেউ। এখানে ওখানে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ।

আমি উঠে যেখানে ছাড়ানো চামড়া রেখেছিলাম সেই বাস্কেটের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখি। কিছু নেই। কেউ সব কুড়িয়ে নিয়ে গেছে।

হাসান উঠে ক্যামেরার ব্যাটারি চার্জে দিয়ে তার ভিডিওকৃত অংশ দেখে।

পুরো রিল ফাঁকা। কিছুই ওঠেনি তাতে।

এরপর থেকে আর হামিদ ভাইকে কখনও দেখেনি কেউ।

প্রিন্স আশরাফ

ঘড়ি

আমার আর তালুকদারের সম্পর্কটা বেশ ভালই ছিল। বন্ধুত্বের। চাকরি করতাম একই অফিসে। থাকতামও একই জায়গায়, একই ঘরে, অর্ধেক অর্ধেক ভাড়ায়।

তালুকদার বিপত্নীক, আমি তখনও বিয়ে করিনি। মিল সেখানেও—দুজনেই ঝাড়া হাত-পা। সামান্য যা রাঁধা-বাড়া নিজেরাই করতাম। দুপুরে অফিসের ক্যান্টিনে খেতাম। রাতের বেলা যা একটু ঝামেলা, তাও মাঝে মধ্যে হোটেলেই খেয়ে নিতাম। খুব একটা অসুবিধা হত না। আমাদের সেই নির্ঝঞ্ঝাট সুখের জীবনে যে গোল বাধাল সে আমাদের অফিসের বস নয়। বাড়িঅলা বা পাড়ার দোকানদারও নয়। সামান্য একটা ঘড়ি। একদিন দেখলাম তালুকদার পুরনো একটা ঘড়ি পরে আছে। ভাবলাম কম দামে কিনেছে কোথাও থেকে। আমাকে না জানিয়ে ঘড়ি কিনেছে বলে বেশ অভিমানই হলো। কিন্তু কিছু বললাম না।

ঘড়ির ডায়ালটা বেশ বড়। চার কোনা। নামটা ঝাপসা হয়ে গেছে, পড়া যায় না। পুরনো হলেও অদ্ভুত তার সময় দান। ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ড রেডিওর সাথে স্বস্তিকর মিল। গোলমালটা শুধু তারিখে। ক্যালেণ্ডারে যেদিন ৩ (তিন) ঘড়িতে হয়তো ৫-৭ কিংবা ১০। মোট কথা কোনও মিল দেখা যায় না। তালুকদার ঘড়িটা মেকারের কাছে নিয়ে গেছে, লাভ হয়নি।

ঘড়ি পাওয়ার পর থেকে তালুকদার কেমন যেন বদলে গেল। আগের মত মন খুলে কথাবার্তাও বলে না। সবসময় কী যেন ভাবত। চরম বাস্তববাদী তালুকদার যা দু একটা কথা বলত তাও কেমন যেন আধিভৌতিক। আমাকে চমকে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। ঘড়ি পাওয়ার কয়েকদিন পরে আমাকে বলল, 'ফরহাদ, আমার এ ঘড়িটার আশ্চর্য কিছু শক্তি আছে। সেটা শুভ না অশুভ ঠিক বুঝতে পারছি না।' ব্যাপারটা আমিও দেখছিলাম। সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে ঘড়িটায় চোখ বুলিয়েই ও যেন কেমন হয়ে যেত।

কোনওদিন ওর মুখে দেখতাম খুশির ঝিলিক, কোনওদিন দেখতাম বিষাদের ঘনঘটা। ব্যাপারটা কী বুঝতাম না কেননা ওই ঘড়িটার ব্যাপারস্যাপার কিছুই আমি জানি না। না জানাটাই ভাল ছিল।

কৌতূহলে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'তালুকদার, অমন প্যাঁচার মত মুখ করে না থেকে আমাকে সব খুলে বলো, ভাল মন্দ যাহোক একটা কিছু তো করতে পারি।' উত্তরে যা শুনলাম তাতে আমার আক্কেলগুড়ুম!

গত মাসে শহরে যে মেলা হয়ে গেল তাতে জুয়া খেলে ঘড়িটা ও পেয়েছে। ঘড়ি হাতে পরার পর থেকে মনের মধ্যে কে যেন কথা বলে উঠেছে, 'এ ভাল হলো না, এ অভিশপ্ত ঘড়ি, সর্বনাশ করে ছাড়বে।' দেখা গেল, ঘড়িতে যেদিন জোড় সংখ্যা অর্থাৎ ২, ৪, ৬, ৮, ১০, প্রভৃতি দেখা যাবে সেদিনগুলো ভাল যাবে। যত বড় সংখ্যা উঠবে ততো ভাল। বিজোড় সংখ্যা উঠলেই বিপদ। যত বড় সংখ্যা

উঠবে ততই খারাপ হবে। ৩১ তারিখ হবে চরম বিপদ সংকেত। তালুকদার মনের ভেতর থেকে আরেকটা কথা শুনতে পেল, ঘড়িটা ফেলে দিলে, কাউকে দিয়ে দিলে, বা ইচ্ছাকৃত যে কোনও ভাবে নষ্ট করলে সঙ্গে সঙ্গে মরতে হবে।

তালুকদার ব্যাপারটা যাচাই করে ভড়কে গেছে। যেদিন সকালে দেখেছে ১০, ১৬ বা ২০ অর্থাৎ জোর সংখ্যা, দিনগুলো খুবই ভাল গেছে। অফিসের পিওন করিমের কাছে সে যে ১৪০/= টাকা পেত, সে টাকাটা হয়তো আদায় হয়ে গেল। যে টাকার আশা তালুকদার মাস চারেক আগেই ছেড়ে দিয়েছিল। অথবা কোনও শুভ দিনে (অবশ্য ঘড়িটার হিসাবে) কোনও হোটেলে দশ টাকা খেয়ে দশ টাকার নোট দিল। ম্যানেজার ভুল করে হয়তো ৯০ টাকা ফেরত দিল। তালুকদার টাকাটা নিশ্চিন্ত মনে পকেটে পুরে বেরিয়ে এল। সদাকৃপণ তালুকদার হয়তো আমাকে সেকেণ্ড শো সিনেমাও দেখিয়ে দিল। কেননা দিনটা তার শুভ, আনন্দের দিন। ডি ডে। কিন্তু গোল বাধে অশুভ দিনগুলোতে। হয়তো দেখল মানি ব্যাগে রাখা ৩০০/= টাকার মধ্যে দুখানা পঞ্চাশ টাকার নোট উধাও। মাসের বিশদিন বাকি। কিংবা খেলা দেখতে গিয়ে মাথায় ঢিল খেয়ে ঘণ্টা দুই ইমারজেন্সিতে কাটিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ঘরে ফিরতে গিয়ে রিকশা অ্যাক্সিডেন্টে ফের মেডিক্যাল। এমনই আরও কত কী। আমাকেও এসব অবস্থায় হয়রান হতে হয়। এ সমস্ত ঘটনা দু'জনেই চেপে যেতাম। আর বলবই বা কাকে? শহরে আমাদের তো তেমন কেউ ছিল না।

সেদিন ক্যালেণ্ডারে ৬, ঘড়িতে ২৫। দুজনের কেউই অফিসে গেলাম না। বন্ধুত্বের খাতিরে দুরু দুরু বুকে তালুকদারের পাহারায় বসে আছি। বেলা বারোটা বাজে, রান্নার আয়োজন করা দরকার। তালুকদারকে কথাটা বলতেই অবাক করে দিয়ে তিরিশটা টাকা বের করে দিল খাবার কিনে আনতে। হোটেল থেকে খাবার কিনে মিনিট পনেরো পরে ফিরে এলাম। ঘরে পা রাখতেই হাতের বাসনকোসন ছিটকে পড়ে গেল। তালুকদার যে চেয়ারটায় বসে ছিল সেটাতে হাস্যকরভাবে শোবার চেষ্টা করছে। গলা দিয়ে কেমন যেন ঘড় ঘড় শব্দ বেরুচ্ছে। বোর্ড থেকে বেরিয়ে আসা টেবিলের সামনের দেয়াল পর্যন্ত লম্বা ঝুলন্ত গজ তিনেক ফ্লেক্সিবল তারের মাঝের জয়েন্টটা তালুকদারের ঘাড়ে লেপ্টে আছে। লাফ দিয়ে গিয়ে সুইচটা অফ করে দিলাম। ও ধপ করে মেঝেতে পড়ে গেল। পাঁজাকোলা করে বিছানায় নিয়ে গিয়ে আচ্ছামত বডি ম্যাসাজ করতে লাগলাম। বাড়িঅলার ছেলেকে দিয়ে রিকশা ডেকে মেডিক্যালে নিয়ে গেলাম। বেঁচে গেল তালুকদার। ঘরে ফিরে তারটা চেক করলাম। গত পরশু তালুকদার বোর্ড থেকে তারটা টেবিল পর্যন্ত নিয়ে গেছিল। পড়ার সুবিধার জন্য তার কম পড়ায় মাঝখানে জোড়া দিতে হয়েছিল। ঘরে কোনও টেপ ছিল না, তাই জয়েন্টটা অরক্ষিত ও অনাবৃতই থেকে যায়। যে কাঁটায় তারটা আটকানো ছিল সেটা উপড়ে গিয়েই বিপদটা ঘটেছে। সব মিললেও একটা ব্যাপার মিলাতে পারলাম না। সুইচ তো অফ ছিল। গত রাতে তালুকদার ওই বাতি জ্বালেনি, এমনকী টেবিলেই বসেনি। মাথাব্যথার জন্য তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে ছিল। হোল্ডার থেকে বালবটাও টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিল। সুইচ অন করল কে? উত্তর আজও পাইনি।

দিন কয়েক পরে তালুকদারকে বললাম ঘড়িটা কাউকে দিয়ে দিতে, না হয়

ফেলে দিতে। শুকনো মুখে ও বলল, 'এ ঘড়ি কাউকে দেয়া যাবে না। স্বপ্নে দেখেছি ফেলে দিলেও মরণ।' কেমন করে জানি বুঝে ফেললাম সহজে এ ঘড়ির হাত থেকে নিস্তার নেই আমাদের কারও। কী করা যায় তাই নিয়ে সলা পরামর্শ করে চার পাঁচ দিন পার করে দিলাম। ফল হলো না। বিকালে অফিস থেকে ফেরার পথে ওকে বললাম ঘড়িটা কোনও মেকারের দোকানে রেখে দিতে। এর মধ্যে যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। তালুকদার রাজি হলো না। বলল, 'মেকারের কাছে থাকলেও তো ঘড়িটা আমারই থাকবে। বরং হাতে থাকলে বোঝা যাবে সামনে কী আসছে, ভাল না খারাপ।' কেউই কোনও বুদ্ধি বের করতে পারছিলাম না। ঘরে ফিরে এলাম। দিন পনেরো আমাদের ভালমন্দ এক রকম কেটে গেল।

আবার শুরু হলো ঘড়িটার খেলা। তালুকদার বিছানাগত। ডাক্তার রোগ ধরতে পারছেন না। আসেন, হাত দেখেন, বডির টেম্পারেচার দেখেন, গম্ভীর মুখে চলে যান। আমরা দেখি ঘড়ি। যদি জোড় সংখ্যা দেখা যায়। সেই যে পাঁচ দিন আগে থেকে বিজোড় শুরু হয়েছে তো তার আর শেষ নেই। এক, তিন, পাঁচ, সাত, নয় একটার পর একটা চলছে তো চলছেই। এই সব ঘটনা কাউকে যে বলব, কারও কাছে যে পরামর্শ চাইব, কে বিশ্বাস করবে এসব আজগুবি কথা। জিন ভূত হলে না হয় ওঝা ডাকা যেত, কিন্তু ঘড়ির কবল থেকে মুক্ত হই কী করে। একদিন যা থাকে কপালে ভেবে তালুকদারের প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করে ঘড়িটা এক মেকারের দোকানে রেখে এলাম। মনে মনে ঠিক করলাম আর আনব না, যা হয় হোক। দিনকয়েক পরেই তালুকদার প্রলাপ বকতে শুরু করল। হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। কাছে পিঠে ওর কোনও আত্মীয় স্বজন না থাকায় আমাকেই দু'বেলা দেখে আসতে হয় প্রতিদিন। রোজই তালুকদার ঘড়িটা নিয়ে যেতে বলে, এটা সেটা বলে কাটিয়ে দিই। দিনকে দিন তালুকদার কেমন যেন হয়ে যেতে লাগল। কেমন ফ্যালফ্যালে ফ্যাকাসে চোখে আমাকে দেখত। ডাক্তার বললেন, আর বাঁচবে না। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

সেদিন ছিল সোমবার, ফেব্রুয়ারির ছয় তারিখ। সকাল থেকেই তালুকদার ঘড়িটা দেখার জন্য ছট্‌ফট্ করতে লাগল। আমি কাছে যেতেই বলল, 'ঘড়িটা একবার দেখাও ভাই, আর পারছি না। কী আর করি, ঘড়িটা নিয়ে আবার হাসপাতালে গেলাম। ততক্ষণে সব শেষ। তালুকদার মারা গেছে। ঘড়িটা আর দেখা হলো না বেচারা তালুকদারের। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি একত্রিশ তারিখ, চরম বিপদ সংকেত। লাশ হাসপাতাল থেকে মেসে আনলাম। তালুকদারের বাড়িতে যে খবর দেব, বাড়ির ঠিকানাও জানি না। পাড়ার মসজিদের ইমাম সাহেব জানাজা পড়িয়ে লাশ মাটি দিয়ে চলে গেলেন।

বুকে স্বজন হারানোর একরাশ ব্যথা নিয়ে গোরস্থান থেকে ফিরে এলাম ছোট ঘরটায়। চৌকিতে বসে অতীতের কথাগুলো ভাবতে লাগলাম। নেহাত মন্দ লোক ছিল না তালুকদার। দুজনে একসাথে কত সিনেমা দেখেছি, কত ঘুরেছি রাস্তায় রাস্তায়। কখনও ফালতু রাগ করে কথা বন্ধ করে দিয়েছি। তালুকদারও, আমিও। সেই এক মাত্র বন্ধু তালুকদারের এই করুণ পরিণতির কথা ভাবতেই চোখে পানি এসে গেল। পকেট থেকে রুমাল বের করতে গিয়ে ঘড়িটা বেরিয়ে এল। ভীষণ

চমকে উঠলাম। তাইতো! এ ঘড়িটা তো এখন আমার হয়ে গেল। দুদিন পরে আমাকেও ওর মত ভুগে ভুগে মরে যেতে হবে। তালুকদার আর আমার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখলাম না। তালুকদার মারা যাওয়ার সমস্ত শোক মন থেকে উবে গেল। মনে হলো এই ঘড়িটার হাত থেকে কিছুতেই আর নিস্তার নেই আমার। খাওয়াদাওয়া আরাম-বিরাম শিকেয় উঠল। শুধু ভাবি কী করা যায়! কী করে এই সর্বনাশা ঘড়িটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

দশ-পনেরো দিন ভেবে কোনও কূল কিনারা করতে পারলাম না। আমার অবস্থা দাঁড়াল হিটলার-এর সহযোগী রুডলফ হেসের চাইতেও করুণ। একদিন আমার প্রিয় সিটিজেন ঘড়িটা হারিয়ে ফেললাম। বাড়ি থেকে খবর এল ছোট্ট ভাই-এর অসুখ। না বাঁচা অবস্থা। অফিসে বস আর আগের মত সুনজরে দেখেন না। বুঝলাম ঘড়িটা আমাকে কূটনৈতিক মার মারছে। এর পরই শুরু হবে আসল খেলা। পাগলের মত হয়ে গেলাম। কী করি? মনে কেবল এই একটাই প্রশ্ন।

দিন কয়েক পরে বুদ্ধি করে ঘড়িটা মানিব্যাগে পুরে বাসে বাদুর ঝোলা হয়ে ঘণ্টা তিনেক ঝুল্লু খেলাম। যদি পকেট মার ঘড়িটা নিয়ে যায়। লাভ হলো না। আমার পাশের ভদ্রলোকের মানিব্যাগ খোয়া গেল, তিনিও ঝুলছিলেন। ঘড়িটা আমার যথাস্থানেই থাকল। পকেট মারদের চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করতে করতে ঘরটায় ফিরে এলাম। না, এভাবে কাজ হবে না।

শহরের দিনকাল ভাল না। দিনে দুপুরে রাস্তাঘাটে রাহাজানি ছিনতাই হচ্ছে। সুযোগটা নিলাম। চার পাঁচ দিন মরিয়া হয়ে কুখ্যাত গলিগুলোতে রাতের বেলায় হানা দিলাম। কোনও হাইজ্যাকারের দেখা পেলাম না। সামনে পিছুনে বেশ কয়েকজন লোক ঘড়ি আংটি টাকা পয়সা প্রভৃতি হাইজ্যাকারদের দিয়ে হালকা হয়ে ফিরে গেলেন। আমার পকেটে ঘড়িটা কিন্তু দশমণি পাথর হয়ে চেপে বসেই রইল। ঘড়িটার অস্তিত্ব আর সহ্য হচ্ছিল না। ঘড়িটা যে ফেলে দেব বা নষ্ট করব অত সাহস আমার নেই। মেকারের কাছে নিয়ে গেলাম। 'ইয়ার্কি পাইছেননি সাব' বলে খেদিয়ে দিল। কারণ সহজ। রাগ দুঃখ ভয় সব মিলে মনের অবস্থা অবর্ণনীয়।

বাড়ি থেকে খবর এল ছোট ভাইটা মারা গেছে। বাড়ি যেতে মন চাইল না। নিজেকে বড় স্বার্থপর মনে হলো। এই মৃত্যুর জন্যে তো আমিই দায়ী। ঘড়িটা ধ্বংস করে দিয়ে নিজে মরে যাওয়াই অনেক ভাল ছিল। অফিসে কী একটা গণ্ডগোলে জড়িয়ে গিয়ে সাসপেণ্ড হয়ে গেলাম। বাড়ি ভাড়া বাকি পড়তে লাগল। বাড়িঅলাও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। শহরে কোনও আত্মীয় না থাকায় পথে পথে ঘুরতে লাগলাম। তালুকদার ব্যাটা নিজে মরে আমাকে ফাঁসিয়ে দিল।

পকেটে ঘড়িটা ছাড়া একটাও পয়সা নেই। অনাহারে অনিদ্রায় কাতর হয়ে পড়লাম। একে ওকে ঘড়িটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, 'দেখুন তো ভাই, ঘড়িটা কি আপনার?' কিংবা 'ভাই আপনার কি কোনও ঘড়ি হারিয়েছে?' প্রথম প্রথম কেউ কেউ কৌতূহলবশত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলত, 'না ভাই, আমার না।' কেউবা কোনও কথাই বলত না, যেন খুব ব্যস্ত। কেউ কেউ আবার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সবজান্তার মত মাথা দুলিয়ে চলে যেত। আমি যেন একটা পাগল। বেটাদের উপরে ভীষণ রাগ হত। কয়েকটা মাস এভাবেই কেটে

গেল। বাড়ি থেকে কোনও খোঁজখবর এল না, অন্তত আমি জানলাম না। বুঝলাম এভাবেই মরতে হবে। না, ব্যাটা তালুকদার আমার চেয়ে ভাগ্যবান। আমার মত কষ্ট অন্তত তাকে পেতে হলো না।

সে দিন কী মনে হতে ঘড়িটা বাঁ হাতে পরলাম। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে রেললাইনের ধারে এসে পড়েছি টের পাইনি। তখনও জানি না যে এই সর্বনাশা ঘড়িটার অসহ্য যাতনাময় সান্নিধ্য থেকে মুক্তি আমার আসন্ন।

লাইন বরাবর স্লিপারের উপর দিয়ে আপন মনে হাঁটছি। দূরে ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল। হাত তুলে ঘড়ির তারিখের ঘরে তাকালাম। একত্রিশ তারিখ। বুঝলাম চরম বিপদ আসন্ন। চমকে পিছন ফিরে দেখলাম ট্রেনটা খুব একটা দূরে নেই। তাড়াতাড়ি লাইন থেকে নেমে পড়তে চাইলাম, পারলাম না। স্লিপারে পা বেধে পড়ে গেলাম। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। দুনিয়াটা দুলে উঠল। তারপর সব অন্ধকার।

চোখ মেলেই নার্সের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। বুঝলাম হাসপাতালে আছি। বাঁ হাতের কব্জিতে চাপধরা একটা ব্যথা অনুভূত হলো। ঘাড় ফিরাতে দেখলাম বাঁ হাতটা উঁচু করে স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে ঝুলানো। আঙুলগুলো সহ কব্জিটুকু উধাও। ডাক্তার এলেন, বললেন, 'কেমন লাগছে? বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছেন। নির্ঘাত মারা পড়তেন, ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছেন। হাতের জন্য মন খারাপ করবেন না, আর একটা তো থাকলই।' শশব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার ঘড়িটা কি তবে নষ্ট হয়ে গেছে, ডাক্তার?' ডাক্তার হাসতে লাগলেন। বললেন, 'লোক বটে আপনি একজন, হাত হারিয়ে ঘড়ির খোঁজ। ট্রেনের চাকা তো আপনার রিস্টের উপর দিয়ে গেছে। ঘড়ি যখন ছিল, তখন ঘড়ি কী আর আস্ত আছে।'

অনাবিল আনন্দে ভরে গেল বুক। হাত হারানোর ব্যথা আর অবশিষ্ট রইল না এতটুকু। জানলাম ঘড়িটা চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে। আমার বা কারও কোনও ক্ষতি করার কোনও ক্ষমতাই ঘড়িটার নেই। মরবে না আর কোনও তালুকদার, ভেঙে পড়বে না আর কোনও সংসার, অকালে ঝরে যাবে না কোনও কচি প্রাণ। আমাকেও আর চাকরি হারিয়ে পাগলের মত ঘুরতে হবে না রাস্তায় রাস্তায়। অফিসের বড় সাহেব এসে দেখা করে গেলেন। এল আর সব সহকর্মীরা। সাসপেনসন উইথড্র করা হয়েছে, সুস্থ হয়েই জয়েন করতে বললেন বড় সাহেব। সর্বনাশা ঘড়িটার কাহিনি শেষ।

এখন আমি নিয়মিত অফিস করছি। বিয়ে করে বউ নিয়ে শহরেই এক বাসায় ভাড়া আছি। দেশে মা-বোনেরা ভালই আছে। দিন কয়েক আগে আমার প্রমোশন হয়েছে। ভালই যাচ্ছে দিনকাল। বাঁ হাতের জন্য খুব একটা অসুবিধা হয় না। মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছি। একটা ঘড়ি কিনেছি। বেশ কয়েকদিন হলো। বড় ডায়াল, অনেকটা তালুকদারের ঘড়িটার মত দেখতে। ডান হাতে পরি। তালুকদারের স্মৃতিটা বেশ ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। শুধু ঘড়িতে যেদিন একত্রিশ তারিখ ওঠে, আজ, এই চার বছর পরেও অহেতুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে বুকের ভেতরটা, অমঙ্গল আশঙ্কায়। মানসপটে ভেসে ওঠে একটি মুখ। সে মুখ তালুকদারের।

পল্লব

দুঃস্বপ্ন

ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলাম আমি। কী হয়েছে হঠাৎ করে বুঝে উঠতে পারলাম না। আচমকা ঘুম ভাঙলে মাথা তো একটু দেরিতে কাজ করেই। পরক্ষণে ডিমলাইটের আলোয় অবাক হয়ে দেখলাম, আমার পাশে শোয়া প্রিয়াংকা প্রচণ্ড আক্ষেপে ছটফট করছে, মুখ দিয়ে দুর্বোধ্য শব্দ বেরিয়ে আসছে, কেউ যেন ওর মুখ চেপে ধরে আছে। তাড়াহুড়ো করে আলো জ্বাললাম। ওর দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে থাকলাম। 'প্রিয়া, কী হয়েছে? এমন করছ কেন? অ্যাই!'

ভয়ে বিস্ফারিত ওর চোখজোড়া বুজে এল, কেমন যেন নেতিয়ে পড়ল। কপালে, গলায় এই শীতের রাতেও চিক্‌চিক্ করছে ঘাম। যত্ন করে মুছিয়ে দিলাম। নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন দেখেছে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ডাইনিংরুম থেকে এক গ্লাস পানি নিয়ে এলাম, সুইচবোর্ডটা কোন দিকে মনে না থাকায় আলো জ্বালবার ঝামেলা করলাম না। প্রিয়াংকা অল্প একটু পানি খেল। তারপর ধীরে ধীরে চোখ মেলল, সুস্পষ্ট ভয়ের ছাপ সেখানে। 'শাকিল, ওই লোকটা এখনও এ ঘরেই আছে। উঃ! মাগো!' ভয়ে কুঁকড়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল প্রিয়াংকা, টের পেলাম থরথর করে কাঁপছে।

'কী বলছ, প্রিয়া? কোন্ লোক? এ ঘরে আমি ছাড়া তো আর কেউ নেই। স্বপ্ন দেখেছ তুমি। এত ভয় পাওয়ার কী আছে? আমি আছি না?'

'না না শাকিল, তুমি বুঝতে পারছ না! একটা লোক... একটা লোক আমাকে... উঃ!'

আমি হাসতে থাকলাম। 'দূর বোকা, কোন্ লোক! হয়তো ঘুমের ঘোরে আমিই...'

'না না, ঠাট্টা নয়, তুমি বুঝতে পারছ না। লোকটা আমাকে...' প্রিয়াংকা হাঁপাতে শুরু করল।

বুঝলাম সকাল হবার আগে ওকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না যে এটা স্বপ্ন। ওকে কাছে টেনে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতে থাকলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরপরই ও চমকে উঠতে থাকল। সকালের আগে আর ঘুমাল না।

সকালে প্রিয়াংকাকে ঘুমে রেখেই অফিসে চলে এলাম। কালুর মাকে বলে এসেছি খেয়াল রাখতে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ছোট্ট এই শহর মংলাছড়িতে মাত্র গতকালই আমরা এসেছি। আমি সরকারি চাকুরে, বদলি সূত্রেই এখানে আসা। প্রিয়াংকাকে বিয়ে করেছি মাত্র পাঁচ মাস আগে। তাই সবুজ পাহাড়ের কোলে নির্জন এই জায়গায় এসে ভালই লাগছে—বেশ মধুচন্দ্রিমা আবেশ। থাকার জন্যে যে বাসাটা আমাকে দেয়া হয়েছে, সেটা এক কথায় 'থ্রিলিং'। লাল রঙের সেকেলে একতলা মস্ত কুঠিবাড়ি—বয়স কমপক্ষে একশো বছর। বিরাট বিরাট দরজা-জানালা, সবুজ রঙের সেকেলে খড়খড়ি। বাড়িটার চারপাশে বিরাট বিরাট সব

গাছ—যার জন্যে বিকেলবেলাতেই ঘরে সন্ধ্যে নেমে আসে। বাড়ির পিছনের আঙিনায় একটা শুকনো কুয়ো আছে। সবকিছু মিলে রোমাঞ্চকর। প্রিয়াংকারও খুব পছন্দ হয়েছে বাড়িটা। আমার পিয়ন কমর আলি স্থানীয় লোক। সে-ই পুরো বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাল। পেছন দিকে কাঠের একটা নড়বড়ে সিঁড়ি ছাদে উঠে গেছে, মনে হচ্ছে ওখানে চিলেকোঠা টাইপের কিছু আছে। প্রিয়াংকা কিছুতেই আমাকে ওই পচা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে দিল না। করম আলি বলল, চিলেকোঠায় বহু পুরনো ভাঙা কিছু আসবাবপত্র রয়েছে বলে ওর ধারণা। কারণ বিশ বছরের চাকুরি জীবনে সে ওই কামরা কাউকে খুলতে দেখেনি, চাবি কার কাছে তাও জানে না। আমি কৌতূহলী হয়ে উঠতে জানাল, বৃটিশ আমলে এই বাড়ি ছিল ডেভিড সাহেবের, সে প্রায় সত্তর কি আশি বছর আগের কথা। একদিন সকালে এই চিলেকোঠাতেই তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখা যায়। আত্মহত্যার কারণ অজ্ঞাত। এর কিছুদিন পরেই তাঁর স্ত্রী ও পুত্র বৃটেনে ফিরে যায়। যে-সব আসবাবপত্র তারা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি, সেগুলো রয়ে গেছে চিলেকোঠায়। এই গল্প শুনে প্রিয়াংকা কেমন যেন থমকে গিয়েছিল। আমার হাত চেপে ধরে বলেছিল, 'শাকিল, আমার কেমন যেন ভয় লাগছে।' মনে হয় এ কারণেই রাতে সে অমন বাজে স্বপ্ন দেখেছে। নাহ্! বয়স বাড়লেও মেয়েদের ভূতের ভয় কখনও যায় না!

বিকেলে বাসায় ফিরে প্রিয়াংকাকে স্বাভাবিক মনে হলো। মনোযোগ দিয়ে ঘরের জিনিসপত্র গুছাচ্ছে। আমিও সাধ্যমত সাহায্য করলাম। কিন্তু রাতে ঘুমোবার সময় বড় আলোটা নিভিয়ে ডিমলাইট জ্বালাতে যেতেই বাধা দিল সে, ওর নাকি ভয় করছে। আমার বুকে মুখ গুঁজে কুণ্ডুলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। ও ঘুমিয়ে পড়তেই আমিও আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু একটু পরেই জেগে উঠতে হলো। প্রিয়াংকা ঠিক গতকালের মত ছটফট করছে, গোঙাচ্ছে। যেন অদৃশ্য কারও সাথে যুদ্ধ করছে। ঘড়ি দেখলাম, বারোটা বেজে দশ মিনিট। গতরাতের মত উঠে এসে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম, বোঝাতে লাগলাম ঘরে আমি ছাড়া অন্য কোনও পুরুষ নেই। কিন্তু ও কিছুতেই শান্ত হলো না। সকালের আগে ঘুমালও না।

পরদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে শুনলাম, সারাদিন প্রিয়াংকা কালুর মাকে এক মিনিটের জন্যেও কাছছাড়া করেনি। ওর চোখের কোলে কালি, কেমন যেন উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি। আমি বাসায় ফিরতেই আমার কাছে ছুটে এল। 'শাকিল, দেখো এগুলো কি!' ও মুখ উঁচু করে ধরল। দেখলাম, ওর ঠোঁটে, গালে, ঘাড়ে কামড়ের দাগ। আমি হাসলাম। 'এই অপরাধের জন্যে তুমি কি আমাকে শাস্তি দেবে?'

প্রিয়াংকার অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল, 'তুমি বুঝতে পারছ না, এ কাজ সেই লোকটার। শাকিল, তুমি আমাকে বাঁচাও, ওই লোকটা আমার সর্বনাশ করবে।' প্রিয়াংকা কান্নায় ভেঙে পড়ল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। ও কি সত্যিই ভাবছে প্রতিরাতে ওকে কেউ ধর্ষণ করার চেষ্টা করছে! আমি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও কিছুতেই বুঝতে রাজি নয়।

সে রাতেও একই ঘটনা ঘটল।

এমনকী তার পরের রাতেও।

প্রতি রাতেই একই ঘটনা ঘটতে থাকল। আমি বিরক্ত হয়ে উঠলাম। কত রাত আর না ঘুমিয়ে কাটানো যায়! আমার সন্দেহ হচ্ছে প্রিয়াংকা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওকে ভাল ডাক্তার দেখানো দরকার। ভাবছি দু'দিন ছুটি নিয়ে চট্টগ্রাম গিয়ে ওকে ডাক্তার দেখিয়ে আনব।

ঠিক এমনি সময় প্রিয়াংকা ভাল হয়ে উঠল। ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখে আর ভয় পায় না। নির্বিঘ্নে ঘুমাতে থাকল। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে কী বিপদেই না পড়েছিলাম! স্বপ্নের কথা বলে আমি এখন প্রিয়াংকাকে ক্ষ্যাপাই—আর সে লজ্জা পায়। আমাদের সংসারটা আবার আগের নিয়মে চলতে শুরু করেছে। মংলাছড়িতে এসে প্রায় মাসখানেক পরে আমরা স্বাভাবিক জীবন-যাপন শুরু করেছি। দেখতে দেখতে মাস দু'য়েক কেটে গেল। এর মধ্যেই আমরা টের পেলাম, আমাদের ঘরে সন্তান আসছে। দু'জনেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম। আমরা দু'জনেই ছেলে চাই। এবং আমি জানি, ছেলেই হবে।

সত্যিই ছেলে হলো। দুধের মত সাদা, মাখনের মত নরম, চুলে সোনালি আভা। নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী লোক বলে মনে হলো। প্রথম সন্তানের আবির্ভাবে সকলেরই নিশ্চয়ই একই অনুভূতি হয়। হাসপাতালের সাদা বিছানায় শুয়ে প্রিয়াংকা ফ্যাকাসে ঠোঁটে হাসল। 'খুশি হয়েছ?'

আমি ওর কপালে চুমু খেলাম। 'হব না মানে!'

প্রিয়াংকা হাত বাড়িয়ে পাশ থেকে আমাদের বাবুকে কোলে তুলে নিল। 'দেখো, কী সুন্দর সোনালি চুল! দেখতে কিন্তু তোমার মত।'

আমি মনোযোগ দিয়ে দেখলাম। 'আমার চোখ বুঝি অমন নীল? আসলে দেখতে ও তোমারই মত। তবে গায়ের রং আমাদের দু'জনের থেকেই অনেক বেশি ফর্সা, তাই না?'

প্রিয়াংকা বাবুকে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি সাবধানে ওকে কোলে নিলাম। সাথে সাথে তীক্ষ্ণ সাইরেনের সুরে চিৎকার করে উঠল বাবু। প্রিয়াংকা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। 'তোমাকে ওর পছন্দ হয়নি।' ও কোলে নিতেই কান্না থেমে গেল।

আমাদের বাবু ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে শুরু করল। সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, নজরকাড়া চেহারা। বাঙালী বাচ্চা বলে মনেই হয় না। বাবু যখন সারা ঘরে হামা দিয়ে বেড়ায়, তখন মনে হয় এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য। তবে কেন যেন বাবু আমার কাছে আসতে চায় না। জোর করে কোলে তুলে নিলে চিৎকার করে কাঁদে, আঁচড়ে দেয়। মনে হয় মাকেই ওর বেশি পছন্দ। হয়তো সারাদিন অফিসে থাকি বলে আমাকে ঠিকমত চিনে উঠতে পারেনি।

সেদিন বিকেলে আমি আর প্রিয়াংকা সামনের লনে বসে চা খাচ্ছিলাম। কালুর মা বাবুকে নিয়ে বারান্দায় খেলছে। প্রিয়াংকা মাঝে মাঝে মাথা তুলে ওদেরকে দেখার চেষ্টা করছে। কারণ মাটি থেকে বারান্দাটা প্রায় ৬/৭ ফিট উঁচু। বর্ষার দিনে পাহাড়ী ঢলের আশঙ্কাতেই সম্ভবত এই ব্যবস্থা। চা শেষ করে আমি বারান্দার নীচে সদ্য লাগানো ফুলের বেডের আগাছা বাছতে শুরু করলাম। হঠাৎ

প্রিয়াংকার চিৎকারে চমকে উঠে ওপরে চাইলাম—বারান্দায় রাখা ফুলের গাছসহ বিরাট টবটা আমার মাথার ওপর নেমে আসছে। শেষ মুহূর্তে আমি গড়িয়ে একপাশে সরে যেতে পারলাম। এমনি সময় বাবু চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। প্রিয়াংকা দৌড়ে ওকে ধরতে গেল। কালুর মা হট্টগোল শুনে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। বাবুকে একা বারান্দায় রেখে যাবার জন্যে প্রিয়াংকা ওকে ধমকাতে লাগল। কিন্তু আমরা কিছুতেই বুঝতে পারলাম না অত বড় ফুলের টবটা কেমন করে পড়ে গেল!

বাবুর বয়স এখন চার বছর। যত দিন যাচ্ছে, সন্দেহের কালো মেঘ আমার মনটাকে আচ্ছন্ন করে তুলছে। এর মধ্যে বেশ ক'বারই আমি মরতে মরতে বেঁচে গেছি। অস্বস্তির কারণ হলো—প্রতিবারই বাবু আমার কাছাকাছি ছিল। একদিন দুপুরে ঘুম ভেঙে দেখি আমার বিছানায়, গায়ের চাদরে আগুন লেগে গেছে। আমাকে জাগতে দেখে বাবু ওই রুম থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। আমি স্পষ্ট দেখেছি ওর হাতে আমার লাইটারটা ছিল। আরেকদিন নষ্ট বাল্ব বদলাতে গিয়ে মরতে বসেছিলাম, বাবু হঠাৎ করে সুইচ অন করে দিয়েছিল। প্রিয়াংকাকে বললে ও হেসেই উড়িয়ে দেয়, বলে, ছেলেমানুষ, খেলার ছলে করেছে। কিন্তু কেন যেন আমার মনে হয়, আমার দিকে চাইলে বাবুর চোখজোড়া জ্বলে ওঠে, আমাকে বোধহয় ও ঘৃণা করে। কেন, তা জানি না। একদিন পিছনের বাগানে বেড়াতে গিয়ে কী আকর্ষণে কুয়োটার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম। কিনারায় দাঁড়িয়ে ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করলাম ভেতরটা। এমনি সময় আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় চেঁচিয়ে উঠল, 'বিপদ!' আমি ঝট্ করে পিছনে ফিরে চাইলাম। দেখলাম বাবু আমাকে ধাক্কা মারার জন্যে হাত উঁচু করেছে। আমি ঝট্কা মেরে ওকে ঘাসের ওপর ফেলে দিলাম। ও চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। বিশ্বাস করবে না বলে প্রিয়াংকাকে বললাম না। উহ্! কী অসহ্য যন্ত্রণা!

সেদিন রাতে আমি প্রচণ্ড অস্থিরতায় ভুগতে থাকলাম। কী এক অদৃশ্য শক্তি কোথায় যেন আমাকে নিয়ে যেতে চাইছে। রাত যত বাড়ছে, ততই অস্থিরতা বাড়ছে। অবশেষে সাড়ে বারোটার দিকে প্রিয়াংকা ও বাবুকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে একটা মোমবাতি জ্বেলে কী এক ঘোরের মধ্যে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমার মনে হলো যেন নেশা করেছি! পায়ে পায়ে উপস্থিত হলাম ভাঙা কাঠের সেই পচন ধরা সিঁড়ির নীচে। কেন যেন মনে হলো, আমাকে ওপরে চিলেকোঠায় যেতে হবে। কোনও দুর্ঘটনা না ঘটিয়েই ওপরে উঠে যেতে পারলাম। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম চিলেকোঠার দরজা খোলা। অথচ কমর আলি বলেছিল অন্তত বিশ বছর এ ঘরের দরজা খোলা হয়নি। ঘরে ঢুকতেই ভ্যাপসা দুর্গন্ধ নাকে এল। ঘরময় ধূলিধূসরিত মূল্যবান কাঠের তৈরি খাট, আলমারি, রাজকীয় চেয়ার—সবকিছুরই ভগ্নদশা। আমি সোজা গিয়ে বড় আলমারির দেরাজ খুললাম—যেন জানতাম কী করতে হবে। মলিন, পোকায় কাটা একটা হলুদ রঙের এনভেলাপ বেরিয়ে এল, ভেতরে একতাড়া কাগজপত্র, কিছু চিঠি, আর... আর কিছু ছবি। মোমবাতির আলোয় একটা ছবি দেখলাম, সুদর্শন এক সাহেব, সোনালি চুল, নীল চোখ। কেন

যেন খুব পরিচিত মনে হলো তাকে। ছবির উল্টোদিকের লুপ্তপ্রায় লেখাটুকু কষ্ট করে পড়লাম। ইংরেজিতে লেখা—মিস্টার ডেভিড বেকার, ১৯১০! ছবি এনভেলাপে ভরে রাখতে গিয়ে আর একটা ছবি বেরিয়ে এল। এটা একটা বাচ্চা ছেলের ছবি। আলোর নীচে ভাল করে দেখতেই চমকে উঠলাম! একী! বাবুর ছবি এখানে এল কেমন করে! উল্টোপিঠে চোখ বুলিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, ইংরেজিতে লেখা রয়েছে—ডেভিড, ১৯৮৭। প্রচণ্ড আতঙ্কে শিউরে উঠলাম! আমি জানি! এখন আমি জানি বাবু আসলে কে! প্রিয়াংকার দুঃস্বপ্ন দেখার রহস্য এতদিন পরে উদঘাটিত হলো। কিন্তু হায়! আমি এখন আর ওকে কোনও সাহায্য করতে পারব না। আমি ধীরে-ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকালাম। বাবু দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। মোমবাতির লালচে আলোয় ওর চোখজোড়া ধক ধক জ্বলছে, শিশুসুলভ সমস্ত লাবণ্য অন্তর্হিত হয়েছে সমস্ত অবয়ব থেকে। ক্রুর হাসি ওর মুখে, দৃষ্টিতে চরম ঘৃণা। আমার চোখের সামনে ডেভিড ধীরে ধীরে পিছিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। আমি কিছুই করতে পারলাম না। আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেছে। খট করে তালা বন্ধ করার শব্দটাও স্পষ্ট শুনতে পেলাম। আমি জানি, সারা পৃথিবী খুঁজে ফেললেও প্রিয়াংকা আমাকে চিলেকোঠায় খুঁজতে আসবে না। চিৎকার করে মরে গেলেও কেউ শুনতে পাবে না। মোমবাতিটাও একসময় দপ্ করে নিভে গেল। এখন আমার জন্যে রয়েছে শুধু নিকষ কালো অন্ধকার।

রোকসানা নাজনীন

একান্ত আপনার

বিখ্যাত ইংরেজ ভদ্রলোকটিকে চোখে পড়তেই দেখলাম, তিনিও তাকিয়ে রয়েছেন আমার দিকে।

'সার গাই হলিস?' জানতে চাইলাম আমি।

'হ্যাঁ। আপনি নিশ্চয় সাইকিয়াট্রিস্ট জন কারমোডি?'

মাথা ঝাঁকালাম। তারপর ভাল করে তাকালাম বিখ্যাত মানুষটির দিকে। লম্বা, হালকা-পাতলা, একমাথা হলুদাভ চুল, থোকা থোকা গোঁফ। পরনে টুইডের পোশাক। সম্ভবত কোনও এক পকেটে আছে একটা মনোকল, আর ছাতাটা ছেড়ে এসেছেন বাইরের কোনও ঘরে।

কিন্তু অনেক ভেবেও বুঝতে পারলাম না, ব্রিটিশ অ্যাম্ব্যাসির সার গাই হলিস বিশাল এই শিকাগো শহরে আমার মত একজন লোকের সঙ্গে কেন দেখা করতে এসেছেন।

বসে পড়লেন সার গাই। গলাটা পরিষ্কার করে খানিকটা অস্বস্তিমাখা দৃষ্টি বুলোলেন চারপাশে। তারপর ডেস্কের এক ধারে পাইপটা ঠুকে নিয়ে মুখ খুললেন।

'লণ্ডন আপনার কেমন মনে হয়?'

'কেন বলুন তো—'

'আমি আপনার সাথে লণ্ডন-বিষয়ক কিছু আলোচনা করতে চাই, মি. কারমোডি।'

সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে সব ধরনের লোকের সঙ্গে মেশার অভ্যেস আছে আমার। সুতরাং মৃদু হেসে শরীরটা এলিয়ে দিলাম।

'শহরটার এমন কিছু আপনার চোখে পড়েনি, যা অদ্ভুত?' জানতে চাইলেন তিনি।

'ওখানকার কুয়াশা তো বিখ্যাত।'

'ঠিক বলেছেন। কুয়াশা। কুয়াশাটাই গুরুত্বপূর্ণ। সত্যি বলতে কী, পরিবেশ হিসেবে একেবারে আদর্শ।'

'কীসের পরিবেশ?'

রহস্যময় একটা হাসি ফুটে উঠল সার গাই হলিসের ঠোঁটে। বিড়বিড় করে বললেন, 'খুনের।'

'খুনের?'

'হ্যাঁ। আপনার কি কখনও মনে হয়নি, পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলোর মধ্যে লণ্ডনের পরিবেশই খুন করার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত?'

ধারণাটা চমকপ্রদ। লণ্ডন নরহত্যার আদর্শ জায়গা।

'প্রথমেই একেবারে সঠিক কথাটা উল্লেখ করেছেন আপনি,' বললেন সার

গাই। 'এরকম পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে কুয়াশার কোনও তুলনা হয় না। তা ছাড়া এসব ব্যাপারে ব্রিটিশদের কিছু অদ্ভুত ধারণা আছে, যেটাকে আপনি বলতে পারেন—খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি। হত্যাকে তারা একরকম খেলাই মনে করে।'

নড়েচড়ে বসলাম। মতবাদটা সম্পূর্ণ নতুন।

'অবশ্য হত্যাকাণ্ডের পরিসংখ্যান দিয়ে আপনাকে আমি বিরক্ত করতে চাই না। ওসব রেকর্ড ঘাঁটলেই পাওয়া যায়। তবে এ-কথা ঠিক যে, ইংরেজ মাত্রেই অপরাধের ব্যাপারে কৌতূহলী।

'একটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবার সাথে সাথে শুরু হয় উত্তেজনা। অপরাধী কি পুলিশকে বোকা বানাতে পারবে? সেসময়ের খবরের কাগজ একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই আপনি সব বুঝতে পারবেন। প্রত্যেকেই উন্মুখ হয়ে থাকে, কে হারে কে জেতে।

'ব্রিটিশ আইনে বন্দী নির্দোষ প্রমাণিত হবার আগ পর্যন্ত তাকে অপরাধী ভাবা হয়। এটা পুলিশের সুবিধে। কিন্তু এখানকার পুলিশকে আগ্নেয়াস্ত্র সাথে রাখার অনুমতি দেয়া হয় না, যেটা অপরাধীদের সুবিধে।'

সার গাই ঠিক কী বলতে চান, বুঝে উঠতে পারলাম না। তবু কোনওরকম বাধা না দিয়ে চুপ করে রইলাম।

'সত্যি বলতে কী, এসব আইন-কানুনের জন্যেই প্রত্যেকটা ইংরেজ হয়ে উঠেছে খুদে শার্লক হোমস।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'কখনও লক্ষ করেছেন, ব্রিটিশ উপন্যাস কিংবা নাটকে হত্যাকাণ্ড কতখানি জনপ্রিয়?'

হাসলাম আমি। বললাম, 'অ্যাঞ্জেল স্ট্রীট।'

'লেডিজ ইন রিটায়ারমেন্ট,' বললেন তিনি। 'নাইট মাস্ট ফল।'

'পেমেন্ট ডিফারড,' যোগ করলাম আমি। 'ল্যাবারনাম গ্রোভ। কাইণ্ড লেডি। লাভ ফ্রম আ স্ট্রেঞ্জার। পোরট্রেট অভ আ ম্যান উইথ রেড হেয়ার। ব্ল্যাক লাইমলাইট।'

মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'অ্যালফ্রেড হিচকক কিংবা এমলিন উইলিয়ামস-এর সিনেমাগুলোর কথাই ধরুন না। অভিনেতা হিসেবে থাকতেন উইলফ্রেড লসন আর লেসলি ব্যাঙ্কস্।'

'চার্লস লটন,' বলে চললাম আমি। 'এডমণ্ড গয়েন। বেসিল র‍্যাথবোন। রেমণ্ড ম্যাসি। সার সেড্রিক হার্ডউইক।'

'আপনি দেখছি এসব ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ,' বললেন তিনি।

'মোটেই না,' হাসলাম আমি। 'স্রেফ একজন সাইকিয়াট্রিস্ট।'

সামনে ঝুঁকে পড়লাম। স্বর একটুও পরিবর্তন না করে বললাম, 'আমি শুধু জানতে চাই, এসব মেলোড্রামাটিক আলোচনা করার জন্যে আপনি আমাকে বেছে নিলেন কেন?'

একটু থতমত খেয়ে গেলেন তিনি। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ পিটপিট করলেন।

'আসলে আমি এসব আলোচনা করতে চাইনি,' বিড়বিড় করতে লাগলেন। 'না। মোটেই না। আমি শুধু একটা পদ্ধতি অনুসারে এগোচ্ছিলাম—'

'এগোননি। বরং বলুন, থেমে আছেন। সার গাই, চটপট বলে ফেলুন তো—ঠিক কী বলতে চান।'

এভাবে কথা না বললে সাইকিয়াট্রিস্টদের চলে না। অন্তত আমি লোককে ভড়কে দিয়ে অনেক ফল পেয়েছি।

ফল এবারেও পেলাম।

চোখ সরু করে সামনে ঝুঁকে পড়লেন সার গাই। 'মি. কারমোডি,' বললেন তিনি, 'আপনি কখনও জ্যাক দ্য রিপার-এর নাম শুনেছেন?'

'খুনী?' জানতে চাইলাম আমি।

'হ্যাঁ। সবচেয়ে কুখ্যাত। স্প্রিং হীল জ্যাক কিংবা ক্রীপেনও যার কাছে তুচ্ছ। জ্যাক দ্য রিপার। রেড জ্যাক।'

'আমি তার কথা শুনেছি।'

'তার ইতিহাস জানেন?'

'দেখুন, সার গাই, এসব কুসংস্কারাচ্ছন্ন খোশগল্প করা আমাদের মানায় না।'

এবারের খোঁচাটাও জায়গামত লাগল। লম্বা করে শ্বাস টানলেন তিনি। 'এটা খোশগল্প নয়। এর সাথে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত।'

প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে কথা বললেও খুব একটা বিরক্ত হলাম না। পৃথিবীর যাবতীয় অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শোনার জন্যে সাইকিয়াট্রিস্টদের পয়সা দেয়া হয়। 'চালিয়ে যান,' বললাম আমি। 'শোনা যাক গল্পটা।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে গল্প শুরু করলেন সার গাই।

'লণ্ডন। ১৮৮৮ সাল। গ্রীষ্মের শেষ আর শরৎকালের শুরুতেই ঘটল ঘটনাগুলো। হঠাৎ করেই এসে হাজির হলো জ্যাক দ্য রিপার। ছুরি হাতে ছায়ামূর্তির মত ঘুরতে লাগল ইস্ট এণ্ড-এ। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল হোয়াইটচ্যাপেল আর স্পিটালফিল্ডস্-এ। সে কোত্থেকে এসেছে, জানতে পারল না কেউ। তবে এটা বুঝতে কারও বাকি রইল না যে, সে বয়ে এনেছে মৃত্যু। ছুরিকাঘাতে মৃত্যু।

'ছ' ছ'বার সে-ছুরি নেমে এল লণ্ডনের মেয়েদের গলা আর শরীর লক্ষ্য করে। প্রথম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলো ৭ অগাস্ট। উনচল্লিশ বার ছুরি চালানো হয়েছে মেয়েটার শরীরে। ভয়ঙ্কর! ৩১ অগাস্ট ঘটল দ্বিতীয় ঘটনা। কৌতূহলী হয়ে উঠল খবরের কাগজগুলো। ততোধিক কৌতূহলী জনসাধারণ।

'কে এই খুনী, যে তাদের মধ্যেই আছে, অথচ চষে বেড়াচ্ছে রাতের শহর আর অলিতে-গলিতে খুন করছে নির্বিঘ্নে? সবচেয়ে বড় কথা—আবার সে আঘাত হানবে কখন?

'তৃতীয় ঘটনা ঘটল ৮ সেপ্টেম্বর। অস্থির হয়ে উঠল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড। স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রায় সবাইকে নিয়োগ করা হলো। এদিকে গড়ে উঠল গুজবের স্তূপ। খুনের নৃশংস ধরনই জন্ম দিল গুজবের।

'ছুরি চালানোর ক্ষেত্রে খুনীর তুলনা নেই। তবে গলা কাটাটাই তার বিশেষ পছন্দ। ধীরেসুস্থে শিকার বাছাই করে সে, তারপর ছুরি চালিয়ে দেয় নারকীয়

উল্লাসে। তার কণ্ঠ শুনতে পায় না কেউ। কারও চোখে ধরা পড়ে না সে। ভোরে রাস্তার পাহারাদাররা শুধু খুঁজে পায় বীভৎস সব মৃতদেহ।

'কে সে? সে কি মানুষ? পাগলা কোনও সার্জন? কসাই? কাণ্ডজ্ঞানহীন বৈজ্ঞানিক? উন্মাদ আশ্রমের পলাতক উন্মাদ? অধঃপতিত কোনও মহৎ ব্যক্তি? পুলিশের কেউ নয়, তা-ই বা কে জানে?

'আর ঠিক এই সময়েই খবরের কাগজে প্রকাশিত হলো বিশেষ একটা কবিতা। রচনা করেছেন অজ্ঞাতনামা কোনও কবি। পড়ে মনে হয়, জনসাধারণের গুঞ্জন বন্ধ করার লক্ষ্যেই যেন রচিত হয়েছে কবিতাটি। কিন্তু গুঞ্জন না কমে বরং আরও বেড়েই চলল। ওটার একটা স্তবক ছিল এরকম:

কসাই নই আমি, নই ছাগলছানা
নই আমি জাহাজের বিদেশী কাপ্তেন,
তা হলে কে আমি?
বন্ধুত্বে যার জুড়ি মেলা ভার,
একান্ত আপনার—
জ্যাক দ্য রিপার।

'এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ফাঁক হয়ে গেল আরও দু'টো গলা।'

বাধা দিলাম সার গাইকে। 'চমৎকার,' মন্তব্য করলাম আমি ব্যঙ্গের একটা ক্ষীণ আভাস ফুটে উঠল কণ্ঠে।

চোখ সরু হয়ে এল তাঁর। কিন্তু ওই পর্যন্তই। 'থমথম করতে লাগল পুরো লণ্ডন। অজানা এক আতঙ্কে কাঁপতে লাগল সবাই। আবার কখন আঘাত হানবে রেড জ্যাক? ধীরে ধীরে পার হয়ে গেল অক্টোবর। কিছুই জানা গেল না রিপার সম্বন্ধে। সে যেন বাস করে কুয়াশার রাজ্যে। প্রথম নভেম্বরের হিমেল বাতাসের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল লণ্ডনের রূপোপজীবিনীরা। প্রতিদিন সকালের সূর্য তাদের জন্যে বয়ে আনল আশীর্বাদ।

'৯ নভেম্বর। নিজের ঘরেই পাওয়া গেল মেয়েটিকে। অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গিতে শুয়ে আছে সে। পাশেই সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে তার মাথা আর হৃৎপিণ্ড।

'ছড়িয়ে পড়ল তীব্র আতঙ্ক। কিন্তু সে আতঙ্ক অর্থহীন। পুলিশ, সাংবাদিক আর সাধারণ মানুষ তটস্থ হয়ে রইল। কিন্তু আর আঘাত হানল না জ্যাক দ্য রিপার।

'মাসের পর মাস কেটে গেল। দেখতে দেখতে ঘুরে এল বছর। ধীরে ধীরে কমে এল কৌতূহল, কিন্তু স্মৃতি রয়ে গেল। কেউ বলল, জ্যাক পালিয়ে গেছে আমেরিকায়। কেউ বলল, আত্মহত্যা করেছে। তারা বলল—আর লিখল। এবং এখনও লিখেই চলেছে। জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন ধারণা, প্রকল্প, তর্ক আর প্রমাণ। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি, জ্যাক দ্য রিপার কে ছিল। সে কেন খুন করত। কিংবা হঠাৎ খুন বন্ধই বা করল কেন।'

চুপ করলেন সার গাই। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, তিনি আমার তরফ থেকে কিছু মন্তব্য আশা করছেন।

'সামান্য আবেগপ্রবণ হয়ে পড়া ছাড়া,' বললাম আমি, 'আপনার গল্প বলার ধরনটা সত্যিই চমৎকার।'

'সমস্ত কাগজপাতি জোগাড় করেছি আমি,' বললেন সার গাই হলিস। 'প্রত্যেকটা পড়ে দেখেছি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।'

উঠে দাঁড়ালাম আমি। শ্রান্তির কপট হাই তুলে বললাম, 'শুতে যাবার আগে এরকম গল্প শুনতে মন্দ লাগে না। আপনি যে ব্রিটিশ অ্যাম্বাসির একশো একটা কাজ ফেলে আমার মত একজন সাধারণ সাইকিয়াট্রিস্টকে এসব শোনাতে এসেছেন, সেজন্যে আমি সত্যিই নিজেকে বড় ধন্য মনে করছি।'

কাজ হলো এবারের খোঁচাতেও।

বললেন, 'আপনি নিশ্চয় জানতে চান, কেন এতটা কৌতূহলী হয়ে পড়লাম?'

'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

'কারণ,' বললেন সার গাই হলিস, 'আমি জ্যাক দ্য রিপারকে অনুসরণ করছি। আমার বিশ্বাস, সে এখানেই আছে—শিকাগোতে।'

আবার বসে পড়লাম। এবার আমার চোখ পিটপিট করার পালা।

'কথাটা আবার বলুন তো,' তোতলাতে লাগলাম আমি।

'জ্যাক দ্য রিপার এই মুহূর্তে শিকাগোতেই আছে। আমি তার পিছু নিয়েছি।'

'থামুন, একটু থামুন!'

হাসির কোনও আভাস নেই তাঁর মুখে। অর্থাৎ, তিনি রসিকতা করছেন না।

'শুনুন,' বললাম আমি। 'খুনগুলো কখন ঘটেছিল?'

'অগাস্ট থেকে নভেম্বর। ১৮৮৮ সাল।'

'১৮৮৮? সেই সময় যদি জ্যাক দ্য রিপার একজন শক্তসমর্থ লোক হয়ে থাকে, তা হলে তো এতদিনে তার মরে ভূত হয়ে যাবার কথা! এটা বুঝতে পারছেন না কেন যে, তখন যদি তার জন্মও হয়ে থাকে, এখন তার বয়স হবে ৮৫!'

'এত বয়স হবার কথা বুঝি ভদ্রলোকের?' হাসলেন সার গাই হলিস। 'নাকি ভদ্রমহিলার? কারণ, জ্যাক দ্য রিপার মেয়েও হতে পারে। অন্য কিছু হওয়াও বিচিত্র নয়।'

'সার গাই, এবার মনে হচ্ছে, আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। আপনার একজন সাইকিয়াট্রিস্টের প্রয়োজন।'

'হয়তো তাই। আচ্ছা, মি. কারমোডি, আমাকে কি সত্যিই পাগল মনে হচ্ছে?'

সোজাসুজি তাঁর দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকালাম। কিন্তু কথাটার সত্যি একটা জবাব দেয়া দরকার।

'স্পষ্ট বলতে কী—না।'

'তা হলে জ্যাক দ্য রিপার যে এখনও বেঁচে আছে, সে-কথা আমি কেন বিশ্বাস করলাম, তা আপনার শোনা উচিত।'

'হ্যাঁ, শোনা উচিত।'

'এ-ব্যাপারে আমি গবেষণা করছি গত তিরিশ বছর ধরে। যেখানে যেখানে

হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, নিজে গেছি সেখানে। কথা বলেছি পুলিশের সাথে। বন্ধুবান্ধব আর পরিচিত লোকজনের সাথে। যারা খুন হয়েছে, তাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে কথা বলতেও ছাড়িনি। জ্যাক দ্য রিপার সম্পর্কিত কাগজপাতির একটা লাইব্রেরি গড়ে তুলেছি আমি। অদ্ভুত, কিম্ভূত প্রত্যেকটা মন্তব্য পড়েছি।

'কিন্তু তেমন কিছুই জানতে পারিনি। সেসব কাগজপাতির বর্ণনা দিয়ে আপনার বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না। যাই হোক, এদিক দিয়ে সুবিধে না হলেও আরেক পথ ধরে এগোতে যথেষ্ট সুফল পেয়েছি। সেইসব অপরাধ নিয়ে গবেষণা শুরু করেছি, যেগুলোর কোনও সমাধান হয়নি।

'পৃথিবীর বড় বড় শহরে সংঘটিত রহস্যময় প্রত্যেকটা অপরাধের পেপার কাটিং আছে আমার কাছে। সানফ্রান্সিস্কো। সাংহাই। কলিকাতা। প্যারিস। বার্লিন। প্রিটোরিয়া। কায়রো। মিলানা। এডিলেইড।

'এসব অপরাধের মধ্যে মেয়েদের গলা কাটার ব্যাপার আছে। হত্যার পর সারা শরীর খোঁচানো হয়েছে ছুরি দিয়ে। হ্যাঁ, আমি এগিয়েছি রক্ত শুঁকতে শুঁকতে। নিউ ইয়র্ক থেকে শুরু করে চষে ফেলেছি পুরো আমেরিকা। তারপর গেছি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। তারপর আফ্রিকা, ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা হয়ে ফিরে এসেছি আবার। সবসুদ্ধ এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের সন্ধান পেয়েছি সাতাশিটা।

'এই তো কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটল ক্লিভল্যাণ্ডে। মনে পড়ছে? তারপর অতি সম্প্রতি দু'টো ঘটনা শিকাগোয়। একটা দক্ষিণ ডিয়ারবোর্ন-এ। আরেকটা হ্যালস্টিডের আশপাশে কোথাও। একই ধরনের অপরাধ, একই কৌশল। শুনে রাখুন, প্রত্যেকটা হত্যাকাণ্ডের পেছনে আছে—জ্যাক দ্য রিপার!'

আমি হাসলাম। 'অত্যন্ত শক্ত যুক্তি। তা ছাড়া আপনি অপরাধ-বিশেষজ্ঞ, সুতরাং এ-বিষয়ে আপনার সাথে কোনওরকম তর্ক করার ইচ্ছে আমার নেই। শুধু একটা খটকা লাগছে। ব্যাপারটা খুব ছোট্ট, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ।'

'সেটা কী?' জানতে চাইলেন সার গাই।

'পঁচাশি বছরের কোনও মানুষের পক্ষে কি হত্যা করা সম্ভব?'

চুপ করে রইলেন সার গাই হলিস। এবারে সত্যিসত্যিই কোণঠাসা করতে পেরেছি তাকে। কিন্তু—

'মনে করুন, তার বয়স বাড়ে না,' ফিসফিস করে বললেন তিনি।

'কী বলতে চান?'

'মনে করুন, জ্যাক দ্য রিপার বুড়ো হয়নি। মনে করুন, আজও সে যুবকই আছে।'

'বেশ। আপনার খাতিরে না হয় এক মুহূর্তের জন্যে মনে করলাম। কিন্তু এবার আপনাকে বাঁধার জন্যে যে নার্স ডাকতে হয়।'

'আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে কোনও রসিকতা করছি না,' বললেন সার গাই।

'আমার কাছে যারা আসে, তারা সবাই অবশ্য এরকম কথাই বলে। নানারকম কথা শুনতে পায় তারা, দেখতে পায় দৈত্য-দানব। তবু অসাধারণ

ক্ষমতা-সম্পন্ন এই লোকগুলোকে বেঁধে রাখি আমরা।'

কথাগুলো একটু বেশি নিষ্ঠুর হয়ে গেল। তবে ফল পেলাম হাতেনাতে। উঠে পড়ে আমার মুখোমুখি হলেন তিনি।

'স্বীকার করছি, ধারণাটা অস্বাভাবিক। কিন্তু এ-কথাও ঠিক যে, জ্যাক দ্য রিপার সম্পর্কিত প্রত্যেকটা ধারণাই অল্পবিস্তর অস্বাভাবিক। তো, সবাই যদি এরকম ধারণা পোষণ করতে পারে, আমি করলেই সেটা দোষের হবে কেন? লোকের ধারণা, সে একজন ডাক্তার। কিংবা ম্যানিয়াক। মহিলাও হতে পারে।'

'কিন্তু ডাক্তার আর মহিলারাও বুড়ো হবার হাত থেকে রেহাই পায় না। এমনকী ম্যানিয়াকও।'

'আর যদি জাদুকর হয়?'

'জাদুকর?'

'হ্যাঁ। যদি জাদু, ডাকিনীবিদ্যা কিংবা ব্ল্যাক ম্যাজিক চর্চা করার অভ্যেস থাকে তার?'

'থাকলেই বা কী?'

'আমি গবেষণা করেছি,' বললেন সার গাই। 'পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা করেছি। সৌর, চান্দ্র, নাক্ষত্র—প্রত্যেকটা তিথির সাথে মিলিয়ে দেখেছি হত্যার। খোঁজার চেষ্টা করেছি জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচারে তারিখগুলোর তাৎপর্য।'

তাঁর পাগলামি সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহই রইল না। তবু বাধা না দিয়ে শুনে চললাম কথাগুলো।

'এমনও তো হতে পারে যে, স্রেফ হত্যার আনন্দেই হত্যা করেনি জ্যাক দ্য রিপার। আসলে ওগুলো ছিল—উৎসর্গ।'

'কীরকম?'

কাঁধ ঝাঁকালেন সার গাই। 'বলি। নরবলি। নির্দিষ্ট কিছু চান্দ্র বা নাক্ষত্র তিথিতে রক্ত উৎসর্গ করলে বর দান করে আঁধারের ঈশ্বর। অনন্ত যৌবনের বর।'

'যত্তসব আজগুবি কথা!'

'না। আজগুবি নয়। তা-ই করেছে জ্যাক দ্য রিপার।'

আবার উঠে দাঁড়ালাম। 'আপনার ধারণাগুলো কৌতূহল সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সার গাই—আপাতত অন্য একটা ব্যাপার জানার জন্যে কৌতূহল জাগছে আমার। আপনি এত লোক থাকতে আমাকে এসব শোনাতে এসেছেন কেন? আমি তো পুলিশের কেউ বা অপরাধ-বিশেষজ্ঞ নই। এমনকী উইচক্র্যাফটের ওপরও আমার কোনও দখল নেই। আমি অত্যন্ত সাধারণ একজন সাইকিয়াট্রিস্ট। এসবের সাথে আমার সম্পর্ক কোথায়?'

হাসলেন সার গাই।

'আপনি তা হলে কৌতূহল বোধ করছেন?'

'হ্যাঁ। এখানে আপনার নিশ্চয় কোনও উদ্দেশ্য আছে।'

'তা আছে। তবে আপনার কৌতূহলের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়াই ছিল আমার প্রথম উদ্দেশ্য। এবার শুনুন আমার পরিকল্পনা।'

'বলুন।'

বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর মুখ খুললেন সার গাই হলিস।

'জন কারমোডি, আমি আর আপনি মিলে জ্যাক দ্য রিপারকে বন্দী করতে চলেছি।'

প্রথম সাক্ষাতে এসব কথাই বলেছিলেন সার গাই। এতে তাঁর চরিত্রেরও অনেকটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

অবশ্য তাঁর ধারণার মধ্যে কোনও জটিলতা নেই। তবে, ওটাকে ধারণা না বলে অনুমান বলাই ভাল।

'এখানকার লোকেদের খুব ভাল করে চেনার কথা আপনার,' বললেন তিনি। 'আর সেজন্যেই আমি আপনার কাছে এসেছি। লেখক, চিত্রকর, কবি—মোটকথা এখানকার বুদ্ধিজীবী, বোহেমিয়ান, আধ পাগলা, সবধরনের লোকের সংস্পর্শেই এসেছেন আপনি।

'এবং এদের মধ্যেই লুকিয়ে থাকতে পারে জ্যাক দ্য রিপার। সুতরাং এদের সাথে যদি পরিচয় করিয়ে দেন, আমি হয়তো ঠিক লোকটাকে চিনে নিতে পারব।'

'পরিচয় করিয়ে দিতে তো কোনও অসুবিধে নেই,' বললাম আমি। 'কিন্তু আপনি কি তাকে চিনতে পারবেন? তার চেহারা কেমন, আপনি জানেন না। সে যুবকও হতে পারে, বৃদ্ধও হতে পারে। তা ছাড়া সে করেই বা কী? ধনী, দরিদ্র, ভিক্ষুক, চোর, ডাক্তার, আইনজীবী—সে হতে পারে এর যে কোনও একটা। তাই বলছি, চিনতে পারবেন তো?'

'সে দেখা যাবে,' সশব্দে শ্বাস ফেললেন সার গাই। 'কিন্তু তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। এক্ষুনি।'

'এত তাড়া কীসের?'

আবার শ্বাস ফেললেন সার গাই। 'আগামী দু'দিনের মধ্যে সে আবার খুন করবে।'

'আপনি নিশ্চিত?' আগেই বলেছি, হত্যার তারিখ নিয়ে গবেষণা করেছি আমি। অনন্ত যৌবন বজায় রাখতে হলে আগামী দু'দিনের মধ্যে আরেকটা খুন তাকে করতেই হবে।

'সুতরাং যেভাবেই হোক, তার আগে বন্দী করতেই হবে তাকে।'

'কিন্তু এতে আমার ভূমিকা কোথায়?'

'আপনি শুধু আপনার বন্ধুবান্ধবদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিন। আমাকে নিয়ে চলুন বিভিন্ন পার্টিতে।'

'কিন্তু আমার বন্ধুবান্ধবরা সবাই স্বাভাবিক মানুষ।'

'রিপারও তাই। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শুধু নির্দিষ্ট কিছু রাতে সে হয়ে ওঠে রক্তপিপাসু দানব।'

'বেশ,' বললাম আমি। 'আপনাকে পার্টিতে নিয়ে যাব। এতক্ষণ ধরে যেসব কথা আপনি বললেন, সেগুলো ভুলে যাবার জন্যেও অন্তত খানিকটা মদ আমার খাওয়া দরকার।'

সেই সন্ধ্যাতেই তাঁকে নিয়ে গেলাম লেস্টার ব্যাস্টনের স্টুডিওতে।

এলিভেটরে উঠে তার চিলেকোঠার দিকে যেতে যেতে সতর্ক করে দিলাম সার গাইকে।

'ব্যাস্টন কিন্তু সত্যিকারের ছিটগ্রস্ত। তার অতিথিরাও তা-ই। সুতরাং যে কোনও পরিস্থিতির জন্যে তৈরি থাকবেন।'

'সে আমি আগেই চিন্তা করেছি,' গম্ভীর গলায় কথাটা বলে প্যান্টের পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করলেন সার গাই।

'এসব কী—'

'এখানেই যে তাকে পাওয়া যাবে না, সে-কথা কে বলতে পারে?' আমাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন তিনি।

'কিন্তু গুলিভরা রিভলভার নিয়ে পার্টিতে যাওয়া চলে না!'

'ঘাবড়াবেন না। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কিছু করব না।'

বিস্মিত হলাম আমি। আচরণ দেখে সার গাইকে স্বাভাবিক মানুষ বলে ভাবা কঠিন।

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এগোতে লাগলাম ব্যাস্টনের ঘরের দিকে।

'তো,' ফিসফিস করে বললাম আমি, 'কীভাবে পরিচয় করিয়ে দেব আপনাকে? আপনার সত্যিকারের পরিচয় আর এখানে আসার উদ্দেশ্য খুলে বলব সবাইকে?'

'কোনও যায় আসে না। খোলামেলা হওয়াই তো ভাল।'

'কিন্তু এতে একটা ঝুঁকি রয়ে যাচ্ছে না? জ্যাক দ্য রিপার যদি সত্যিই থাকে এখানে, আপনার পরিচয় পাবার সাথে-সাথে কী গা ঢাকা দেয়ার একটা চেষ্টা করবে না সে?'

'আমার তো মনে হয়, যদি সেরকম কিছু ঘটে, আমার নাম শুনে মুহূর্তের জন্যে হলেও ঘাবড়ে গিয়ে সে প্রকাশ করে ফেলবে নিজেকে।'

'সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবেও আপনি বিখ্যাত হতে পারতেন,' বললাম আমি। 'আপনার এই পরিকল্পনা সত্যিই তুলনাহীন। তবে আবার সাবধান করে দিচ্ছি, এদের মাথায় কিন্তু আসলেই ছিট আছে।'

সার গাই হাসলেন।

'সেজন্যে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এ-ব্যাপারে একেবারেই নিজস্ব একটা পরিকল্পনা আছে আমার। হঠাৎ যদি অদ্ভুত কিছু করে বসি, আপনি যেন মোটেই ঘাবড়াবেন না।'

মাথা নেড়ে টোকা দিলাম দরজায়।

স্বয়ং ব্যাস্টন আমাদের নিয়ে গেল ভেতরে।

'আহা!' একবার আমার চৌকো হ্যাট, আরেকবার সার গাই-এর গোঁফের দিকে তাকাতে তাকাতে বলল সে, 'সিন্ধুঘোটক আর ছুতোর হাজির হয়েছে একসাথে।'

পরিচয় করিয়ে দিলাম সার গাইকে।

'চলুন, চলুন,' আমাদের পথ দেখিয়ে পিছে পিছে আসতে লাগল ব্যাস্টন।

অস্থির পায়ে চলাফেরা করছে বেশ কিছু লোক। সারা ঘরে মেঘের মত উড়ে বেড়াচ্ছে সিগারেটের ধোঁয়া।

প্রত্যেকের হাতেই একটা করে গ্লাস। চোখ-মুখ লাল। ঘরের এক কোণে তারস্বরে বেজে চলেছে পিয়ানো।

ইতোমধ্যে মনোকল পরে নিয়েছেন সার গাই। তিনি দেখলেন মহিলা কবি ল্যাভার্ন গনিস্টারকে। কড়া চোখে তাকালেন হাইমি ক্র্যালিক-এর দিকে। হাইমি বসেছিল মেঝের ওপরে। মদ আনার জন্যে ডাইনিং-রুমের দিকে যাবার সময় ডিক পুল হঠাৎ তার পেটের ওপর পা তুলে দিতেই চেঁচিয়ে উঠল বেচারি।

কমার্শিয়াল আর্টিস্ট নাদিয়া ভিলিনফ যে জনি ওডকাট-এর উল্কির নিন্দা করল, সেটাও তাঁর কান এড়াল না।

পর্যবেক্ষণ হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলত, কিন্তু হঠাৎ ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল লেস্টার ব্যাস্টন। একটা পাত্র মেঝের ওপর আছড়ে ফেলে চুপ করতে বলল সবাইকে।

'আজ বিখ্যাত দু'জন লোক এসেছেন আমাদের মাঝখানে,' আমাদের দিকে হাতের শূন্য গ্লাসটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে কানফাটানো চিৎকার করে বলতে লাগল ব্যাস্টন। 'সিন্ধুঘোটক আর ছুতোর। সিন্ধুঘোটক হলেন ব্রিটিশ অ্যাম্বাসির সার গাই হলিস। ছুতোর আর কেউ নন, আমাদের সুপরিচিত, বিখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্ট জন কারমোডি।'

কথা শেষ করেই খপ্ করে সার গাই-এর হাত চেপে ধরল সে, হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল ঘরের মাঝখানে। মনে হলো, তিনি বোধহয় আপত্তি করবেন। কিন্তু চোখ টিপে আমাকে আশ্বস্ত করলেন সার গাই। সত্যিই যে কোনও পরিস্থিতির জন্যে তৈরি হয়ে আছেন তিনি।

'কিছু মনে করবেন না, সার গাই,' বলল ব্যাস্টন, 'নতুন কোনও অতিথি এলে তাকে প্রশ্ন করা আমাদের প্রথা। আপনি জবাব দিতে প্রস্তুত আছেন তো?'

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকালেন সার গাই।

'বেশ,' বিড়বিড় করে বলল ব্যাস্টন। 'বন্ধুগণ, এবারের মাল এসেছে ব্রিটেন থেকে। এসো সবাই।'

শুরু হয়ে গেল প্রশ্নবাণ। শোনার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু আমাকে চোখে পড়ার সাথে সাথে ছুটে এল উদ্ভিন্নযৌবনা লিডিয়া ডেয়ার, টেনে নিয়ে গেল ভেস্টিবিউলে।

ওর হাত থেকে রেহাই পেয়ে ফিরে আসতে দেখি, আসর একেবারে জমে উঠেছে।

এতক্ষণ অন্যেরা প্রশ্ন করছিল, এবার এগিয়ে এল ব্যাস্টন।

'জনাব সিন্ধুঘোটক, আজরাতে আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা জানতে পারি কী?'

'আমি জ্যাক দ্য রিপারকে খুঁজছি।'

কেউ হাসল না।

ভীষণ অবাক হলাম। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, এরাও নিশ্চয় আমার মতই ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয়নি।

ল্যাভার্ন গনিস্টার। হাইমি ক্র্যালিক। নিরীহ। ডিক পুল। নাদিয়া ভিলিনফ। জনি ওডকাট আর তার স্ত্রী। বার্কলে মেল্টন। লিডিয়া ডেয়ার। এরাও নিরীহ, নিতান্তই ভালমানুষ।

কিন্তু ডিক পুল জোর করে হাসছে কেন। হাসি লুকিয়ে রাখতেই বা ব্যস্ত কেন বার্কলে মেল্টন।

বুঝতে পারছি, এসব চিন্তার কোনও মানে হয় না। তবু আজ যেন একেবারেই নতুন চোখে দেখছি অতি পরিচিত এই লোকগুলোকে। নির্দোষ পার্টিতে যেমন দেখা যায়, তার আড়ালে লুকিয়ে আছে প্রত্যেকেরই একটা করে গোপন জীবন।

কারা লুকোতে চাইছে সেই স্বরূপ?

এদের মধ্যে কারা পূজা করে অশুভের?

এমনকী লেস্টার ব্যাস্টনও কী সন্দেহের বাইরে?

আমরা সবাই ভাল মানুষ। কিন্তু বিশেষ কোনও মুহূর্তে আমাদের মধ্যেই কেউ হয়তো হয়ে ওঠে রক্তলোলুপ দানব। আমি জানি, এখন এখানকার সবাই সবাইকে দেখছে সন্দেহের চোখে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন সার গাই। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন নিজের সৃষ্ট পরিবেশ।

কিন্তু পৃথিবীতে এত কিছু থাকতে তিনিই বা জ্যাক দ্য রিপারকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কেন? এমনও তো হতে পারে যে, তিনি নিজেও লুকিয়ে রাখতে চাইছেন রহস্যজনক কোনও অধ্যায়...

স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে থমথমে আবহাওয়াটাকে হালকা করে তুলল ব্যাস্টন।

'জনাব সিন্ধুঘোটক কিন্তু আমাদের সাথে কোনওরকম রসিকতা করেননি,' সার গাই-এর পিঠে একটা চাপড় মেরে তাঁকে জড়িয়ে ধরল সে। 'তিনি সত্যিই জ্যাক দ্য রিপার-এর পিছু নিয়েছেন। তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে কিংবদন্তির সেই খুনীর কথা?

'তাঁর ধারণা, রিপার শুধু বেঁচেই নেই, ছুরি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই শিকাগো শহরে। সত্যি বলতে কী'—গলা একেবারে নামিয়ে ফেলল ব্যাস্টন—'তিনি বিশ্বাস করেন, আমাদের মধ্যেই কেউ একজন জ্যাক দ্য রিপার।'

খুকখুক করে হাসতে লাগল সবাই। কড়া চোখে লিডিয়া ডেয়ার-এর দিকে তাকাল ব্যাস্টন। 'তোমাদের অত খুশি হবার কিছু নেই,' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'জ্যাক দ্য রিপার মেয়েও হতে পারে। হয়তো তার আসল নাম ছিল জিল দ্য রিপার।'

'তার মানে আপনি আমাদেরও সন্দেহ করছেন?' সার গাই-এর দিকে তাকিয়ে বলল ল্যাভার্ন গনিস্টার। 'কিন্তু জ্যাক দ্য রিপার লোকটা কী অনেক আগেই উধাও হয়ে যায়নি? ১৮৮৮ সালে?'

'আরে বাবা!' মাঝখান থেকে বলে উঠল ব্যাস্টন। 'তুমি এত কিছু জানলে কীভাবে? সন্দেহজনক! ওর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন, সার গাই—দেখে যা মনে হচ্ছে, ওর বয়েস হয়তো মোটেই অত কম নয়। এইসব মহিলা কবিদের অতীত কখনোই সুবিধের হয় না।'

একেবারেই তরল হয়ে গেল পরিবেশ।

আর ঠিক তখনই জিনিসটা চেপে ধরল ব্যাস্টন।

'বুঝতে পারছ কিছু?' চিৎকার করে উঠল সে। 'জনাব সিন্ধুঘোটকের কাছে একটা আগ্নেয়াস্ত্র আছে।'

সার গাই বাধা দেবার আগেই তাঁর পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে নিল ব্যাস্টন।

উদ্বিগ্ন চোখে তাকালাম আমি। কিন্তু চোখ টিপে আবার আমাকে আশ্বস্ত করলেন তিনি।

সুতরাং চুপচাপ ব্যাস্টন-এর কার্যকলাপ দেখতে লাগলাম আবার।

'জনাব সিন্ধুঘোটকের সাথে খারাপ ব্যবহার করাটা মোটেই উচিত হবে না,' চিৎকার করে বলল সে। 'কারণ, শুধু এই পার্টিতে যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনি এসেছেন সুদূর ইংল্যাণ্ড থেকে। তাঁকে বরং একটা সুযোগ দিই আমরা। তোমরা যদি স্বীকার না-ই করো, তিনি নিজেই খুঁজে বের করবেন—খুনী কে।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল জনি ওডকাট।

'এক মিনিটের জন্যে বাতি নিবিয়ে দেব আমি। রিভলভার হাতে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকবেন সার গাই। এই ঘরের মধ্যে যদি সত্যিই রিপার থাকে, অন্ধকারের সুযোগে হয় সে রিভলভারটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে, নয়তো খতম করে দেবে তার অনুসরণকারীকে।'

মৃদু প্রতিবাদ করতে চাইলেন সার গাই, কিন্তু চারপাশের হুল্লোড়ে হারিয়ে গেল তাঁর কণ্ঠ। এদিকে আমি এগোবার আগেই দ্রুত পায়ে সুইচের কাছে গিয়ে পৌঁছুল ব্যাস্টন।

'কেউ নড়বে না,' গলায় কপট গাম্ভীর্য যোগ করল সে। 'পুরো এক মিনিট আমরা অন্ধকারে থাকব। হয়তো সে-সময় আমাদের জীবন নির্ভর করবে নৃশংস একজন খুনীর করুণার ওপর।'

নিবে গেল বাতি।

খুকখুক করে হেসে উঠল কে যেন।

ভেসে এল পদশব্দ। ফিসফাস।

আমার মুখে হাত বুলিয়ে দিল কেউ।

টিকটিক করে এগিয়ে চলেছে ঘড়ির কাঁটা, কিন্তু তার চেয়ে জোরে শব্দ হচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ডের।

অন্ধকারে একদল বোকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোনও মানে হয় না। তবু মনে হচ্ছে, কোথায় যেন ওত পেতে আছে ভয়ঙ্কর একটা বিপদ।

এরকম অন্ধকারেই চুপিচুপি ঘুরে বেড়াত জ্যাক দ্য রিপার। সাথে থাকত

একটা ছুরি। কার্যকলাপ দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, সে আসলেই একটা উন্মাদ।

কিন্তু উন্মাদ হোক আর যা-ই হোক, অনেক দিন আগেই তার দেহ মিশে গেছে মাটির সাথে।

হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন সার গাই হলিস।

তারপরেই ভারী কিছু পতনের শব্দ।

সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিল ব্যাস্টন।

সমস্বরে চিৎকার ছাড়ল সবাই।

ঘরের মাঝখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন সার গাই। রিভলভারটা তখনও শক্ত করে ধরা।

একে একে তাকালাম সবার মুখের দিকে। আতঙ্কিত হলে কত বিচিত্র রূপই না ধারণ করে মানুষের মুখ!

কেউ পালিয়ে যায়নি। ওদিকে আগের মতই উপুড় হয়ে পড়ে আছেন সার গাই হলিস।

ফুঁপিয়ে উঠে মুখ ঢাকল ল্যাভার্ন গনিস্টার।

'ঘাবড়াবেন না।'

লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন সার গাই। হাসছেন।

'একটা পরীক্ষা করলাম। জ্যাক দ্য রিপার এখানে থাকলে আমি মারা গেছি ভেবে হয়তো মুহূর্তের জন্যে প্রকাশ করে ফেলত নিজের অস্তিত্ব। অসাবধানে।

'যাই হোক, আপনারা সবাই যে ভাল মানুষ, সে-বিষয়ে আমার আর কোনও সন্দেহ নেই।

প্রথমে ব্যাস্টন, তারপর একে একে সবার দিকে চাইলেন হলিস।

সবশেষে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার বোধ হয় এখান থেকে যাওয়া উচিত, জন। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ঘুরে ক্লজিটের দিকে রওনা দিলেন তিনি। পিছে পিছে আমি। একটা কথাও বলল না কেউ।

এর পরে পার্টি আর জমল না মোটেই।

পর দিন সন্ধ্যায় সার গাই-এর সাথে দেখা করলাম দক্ষিণ হ্যালস্টিডের পূর্ব-নির্ধারিত স্থানে।

গত রাতের ওই ঘটনার পর আমি যে কোনও ধরনের পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত।

সার গাইকে চোখে পড়তে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম আমি। তারপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লাম পেছন দিক থেকে, 'ভউ!' হাসলেন তিনি। কিন্তু নিজের অজান্তেই বাম হাতটা চলে গেছে রিভলভারের কাছে।

'তৈরি?' জানতে চাইলাম আমি।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'আপনি যে কোনও প্রশ্ন ছাড়া আসতে রাজি হয়েছেন, এতে সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। বোঝা যাচ্ছে, আমার বিচারবুদ্ধির ওপর আস্থা এসেছে আপনার।'

আমার একটা হাত ধরে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন তিনি।

'আজ রাতে ভীষণ কুয়াশা পড়েছে, জন,' বললেন সার গাই হলিস। 'ঠিক লণ্ডনের মত।'

মাথা নাড়ালাম।

'নভেম্বরের পক্ষে ঠাণ্ডাটাও খুব বেশি।'

আবার মাথা নাড়ালাম আমি।

'অদ্ভুত, সত্যিই বড় অদ্ভুত,' বিড়বিড় করে বললেন সার গাই। 'লণ্ডনের কুয়াশা আর নভেম্বর মাস। এরকম সময়ে আর পরিবেশেই হত্যার উল্লাসে মেতে উঠত জ্যাক দ্য রিপার।'

অন্ধকারেই হাসলাম। 'সার গাই, এটা লণ্ডন নয়—শিকাগো। আর মাসটা নভেম্বর হলেও সাল ১৮৮৮ নয়। ইতোমধ্যে কেটে গেছে পঁচাশি বছর!'

সার গাইও হাসলেন, কিন্তু সে হাসিতে কোনও প্রাণ নেই। 'আপনার মত অতটা নিশ্চিত আমি হতে পারছি না,' ফিসফিস করে বললেন তিনি। 'চারপাশে ভাল করে তাকিয়ে দেখুন। শুধু সরু সরু গলি আর ঘোরপ্যাঁচ রাস্তা। ঠিক যেন ইস্ট এণ্ড। মাইটার স্কোয়ার। গত একশো বছরে এসব জায়গার কোনও পরিবর্তন হয়নি।'

'সামনেই সাউথ ক্লার্ক স্ট্রীট,' বললাম আমি। 'এদিকে দরিদ্র লোকেদের বাস। আপনি আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

'অনুমান,' বললেন সার গাই। 'স্রেফ অনুমানের ওপর নির্ভর করে আমি এসেছি এদিকে। কারণ, এরকম জায়গাতে ঘুরে বেড়াতেই ভালবাসত জ্যাক দ্য রিপার। উজ্জ্বল আলোতে আপনি তাকে আশা করতে পারেন না। যদি তাকে পান, পাবেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকায়। দেখবেন, নিঃশব্দে বসে সে অপেক্ষা করছে শিকারের।'

'তাই বুঝি সাথে একটা রিভলভার বয়ে বেড়াচ্ছেন?' ব্যঙ্গটা আর গোপন করতে পারলাম না। বিরক্তও হয়েছি ভীষণ। জ্যাক দ্য রিপার যেন লোকটাকে একেবারে পেয়ে বসেছে।

'রিভলভারের প্রয়োজন হতে পারে,' গম্ভীর গলায় বললেন সার গাই। 'কারণ, আজরাতেই হত্যা করবে সে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম আমি। কুয়াশাচ্ছন্ন, নির্জন রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম দু'জনে। এখানে-ওখানে দু'একটা দরজার ওপর জ্বলছে শুধু টিমটিমে বাতি। তা ছাড়া, চারপাশ ঢাকা পড়ে আছে গাঢ় অন্ধকারে।

হঠাৎ একটা চিন্তা চমকে তুলল আমাকে। পরিবেশটা ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করছে আমার ওপর! মাথা ঠাণ্ডা না রাখলে হয়তো সার গাই-এর মতই উন্মাদনা পেয়ে বসবে আমাকে!

'খেয়াল করেছেন, একটা লোকও নেই আশেপাশে?' হাত বাড়িয়ে চেপে ধরলাম তাঁর কোটের একটা প্রান্ত।

'তাকে আসতেই হবে,' বললেন সার গাই। 'হ্যাঁ, এখানেই আসবে সে। অশুভ জায়গাই আকর্ষণ করে অশুভকে। তাছাড়া, হত্যার কাজটা সে সব সময়ই

সেরেছে ঘিঞ্জি এলাকাতে।

'বুঝতেই পারছেন, নোংরা জায়গার প্রতি একটা বিশেষ দুর্বলতা ছিল তার। তা ছাড়া, হত্যার জন্যে সে যেসব মেয়েদের খুঁজত, এ-ধরনের জায়গাতেই তাদের পাওয়া যায় সহজে।'

হাসলাম আমি। 'তা হলে চলুন, নোংরা জায়গাতেই যাওয়া যাক। ঠাণ্ডায় হাত-পা একেবারে জমে যাবার জোগাড়। খানিকটা মদ না খেলেই নয়। আপনারা ব্রিটিশ। আপনাদের পক্ষে এই ঠাণ্ডা কিছু না হলেও আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব।'

একটা গলির মুখে এসে দাঁড়ালাম আমরা।

গলির ভেতরে একটা শুঁড়িখানা।

'এখানেই ঢুকে পড়ি,' কাঁপতে কাঁপতে বললাম আমি। 'আর তো পারি না!'

'চলুন,' বললেন সার গাই। গলিটাতে ঢুকে পড়লাম আমরা। দরজার সামনে গিয়ে থেমে গেলাম আমি।

'কী দেখছেন?' জানতে চাইলেন তিনি।

'দেখছি,' জবাব দিলাম আমি। 'এসব জায়গা মোটেই ভাল নয়, সার গাই। সাবধান না হলে যে কোনও সময় ঘটে যেতে পারে ভয়ঙ্কর বিপদ।'

'চিন্তাটা মন্দ নয়, জন।'

'ভয়ের কিছু তো দেখছি না,' পর্যবেক্ষণ শেষ করে বললাম আমি। 'চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক।'

বারটা খুবই নোংরা। একটা আলো জ্বলছে কাউন্টারে। কিন্তু সে-আলো এতই নিষ্প্রভ যে, পেছনদিকের সব কিছুই প্রায় অস্পষ্ট।

অলসভাবে চলাফেরা করছিল বিশালদেহী এক নিগ্রো। হঠাৎ সে দেখতে পেল আমাদের।

'শুভ সন্ধ্যা,' বললাম আমি।

জবাব দেয়ার আগে আমাদের আপাদমস্তক দেখে নিল সে। তারপর বের করল সব কটা দাঁত।

'শুভ সন্ধ্যা। কী চাই বলুন?'

'জিন,' বললাম আমি। 'দু'টো। খুব ঠাণ্ডা পড়েছে আজ।'

'হ্যাঁ।'

গ্লাসে জিন ঢেলে দিল সে। দাম মিটিয়ে সাথে সাথে গ্লাস সাবাড় করে দিলাম আমরা। ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠল সারা শরীর।

আরও দু'গ্লাস জিন নিলাম আমরা। চুমুক দিতে লাগলাম। নিগ্রোটা আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল ঢুলুঢুলু চোখে।

টিকটিক করে এগিয়ে চলল বারের ঘড়িটা। বাইরে মাতাল হয়ে উঠেছে বাতাস।

গল্প শুরু করলেন সার গাই।

কিছুটা নেশা হয়েছে তাঁর। তাই প্রথম সাক্ষাতে বলা কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি

করলেন বারবার।

অসীম ধৈর্য নিয়ে শুনতে লাগলাম আমি। আবার এক গ্লাস জিন দিলাম সার গাইকে। তারপর আবার এক গ্লাস।

কিন্তু যত মদ পেটে পড়ল, ততই বেড়ে চলল তাঁর বকবকানি। এমন সব কথা বলতে লাগলেন, যেন দিব্যচক্ষে দেখছেন, ছুরি হাতে বেরিয়ে পড়েছে জ্যাক দ্য রিপার।

আবার খোঁচা লাগালাম আমি।

'বেশ। আপনার কথাগুলো না হয় সত্যি বলেই মেনে নিলাম। ধরে নিলাম, নরবলি দিয়ে দিয়ে সে লাভ করেছে অনন্ত যৌবন এবং সারা পৃথিবী ভ্রমণ করার পর এই মুহূর্তে বাস করছে শিকাগোতে। কথা হলো, তাতে কী এসে যায়?'

'কী এসে যায় মানে?'

'মানে খুব সোজা। জ্যাক দ্য রিপার যদি সত্যিই শিকাগোতে থাকে, তবু এই বারে বসে চুকচুক করে মদ খেতে খেতে আপনি আশা করতে পারেন না যে, সে এখানে এসে বুক পেতে দেবে আপনার রিভলভারের সামনে। আর তাকে পেলেই বা আপনি কী করবেন, বুঝতে পারছি না।'

এক ঢোক জিন খেলেন সার গাই। 'শয়তানটাকে পাকড়াও করে সোজা তুলে দেব সরকারের হাতে। মীমাংসা হয়ে যাবে প্রায় শতাব্দী-প্রাচীন একটা রহস্যের।

'আপনি যত অবিশ্বাসই করুন, সমগ্র মানবজাতির বিভীষিকা, অনন্তযৌবনা সেই খুনী আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে নিঃশব্দে। মানুষের রক্ত উৎসর্গ করছে আঁধারের ঈশ্বরের উদ্দেশে!'

এসবই কি বেশি জিন পান করার ফল? না। ওই তো ধীরে সুস্থে আরেকটা জিন নিচ্ছেন সার গাই। অনেক ভেবেও বুঝতে পারলাম না, শেষমেশ কী করতে চলেছে এই লোক।

'আরেকটা কথা,' বললাম আমি। 'আপনি কিন্তু এখনও বলেননি, কীভাবে পাকড়াও করবেন জ্যাক দ্য রিপারকে।'

'সে নিজেই আসবে,' বললেন সার গাই। 'আমি বুঝতে পারি। আধ্যাত্মিক শক্তি আছে আমার।'

সার গাই আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন নন। আসলে তিনি একজন উন্মাদ। ঘোর উন্মাদ।

রাগে গা জ্বলে গেল আমার। পুরো এক ঘণ্টা ধরে বসে বসে এক গর্দভের প্যাঁচাল শোনার কোনও মানে হয়? সে আমার নিয়মিত রোগী হলেও না হয় একটা কথা ছিল।

'যথেষ্ট হয়েছে,' সার গাই আবার জিনের বোতলের দিকে হাত বাড়াতেই বাধা দিলাম আমি। 'যথেষ্ট হয়েছে। এখন একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে কেটে পড়া যাক। অনেক রাত হয়েছে। আপনার ধুরন্ধর বন্ধুটি আজ আর আসবে বলে মনে হয় না। আগামীকাল আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাগজগুলো বরং তুলে দেয়া হোক এফ.বি.আই-এর হাতে। খুনী পাকড়াও করার ব্যাপারে আমার কিংবা আপনার

চেয়ে ওরা অনেক বেশি ওস্তাদ।'

'না,' টেনে টেনে বললেন সার গাই। 'কোনও ঘোড়ার গাড়ি ডাকাডাকি চলবে না।'

'বেশ। ঘোড়ার গাড়িতে না যেতে চান, অন্য কিছুতে যাওয়া যাবে। কিন্তু আপাতত এখান থেকে বেরোনো দরকার,' ঘড়ি দেখতে দেখতে বললাম আমি। 'বারোটার বেশি বাজে।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে, টলতে টলতে দাঁড়ালেন তিনি। দরজার দিকে এগোতে এগোতে পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলেন রিভলভারটা।

'দিন, আমাকে দিন ওটা!' ফিসফিস করে বললাম আমি। 'রাস্তায় খোলা রিভলভার দুলিয়ে হাঁটা উচিত হবে না।'

রিভলভারটা নিয়ে কোটের পকেটে রেখে, তাঁর একটা হাত ধরে বের করে নিয়ে এলাম বার থেকে। ফিরেও তাকাল না নিগ্রোটা, গভীর ঘুমে সে তখন বিভোর।

বাইরে আসতেই কেঁপে উঠল সারা শরীর। ইতোমধ্যে আরও অনেক বেড়ে গেছে কুয়াশা। গলিমুখটাই দেখা যাচ্ছে না। ঠাণ্ডাটাও চেপে বসেছে। চারপাশটা কেমন যেন স্যাঁতসেঁতে। অন্ধকার। আর তারই মাঝে বইছে মৃদুমন্দ বাতাস।

কাঁপতে শুরু করেছেন সার গাইও। জিন খেলে ঠাণ্ডাটা তেমন সহ্য হয় না। কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেও তো ঠাণ্ডা কমবে না। তাই এগোতে লাগলাম আমরা কুয়াশা ভেদ করে।

ঠিকমত হাঁটতে পারছেন না সার গাই, তবু চারদিক উঁকিঝুঁকি মারার বিরাম নেই তাঁর, যেন যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও গলি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে আকাঙ্ক্ষিত সেই ব্যক্তিটি।

মহাবিরক্ত হয়ে উঠলাম আমি।

বললাম, 'ছেলেমানুষির চূড়ান্ত! জ্যাক দ্য রিপার-এর পিছু নিয়েছেন, তাই না? খামখেয়ালেরও একটা মাত্রা আছে!'

'খামখেয়াল?' আমার দিকে তাকালেন সার গাই। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, ভীষণ আহত হয়েছেন ভদ্রলোক। 'আপনি—আপনি এটাকে খামখেয়াল বলছেন?'

'নয়তো কী?' বিড়বিড় করে বললাম আমি। 'কিংবদন্তির সেই খুনীর পিছু নেয়ার আর কোনও অর্থ আছে?'

দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল তাঁর।

ফিসফিস করে বললেন, 'লণ্ডনে, ১৮৮৮ সালে... যেসব মেয়েদের রিপা হত্যা করে নৃশংসভাবে... তাদের মধ্যে একজন ছিল আমার মা।'

'কী বললেন?'

'বাবা আর আমি শপথ নিই, যেভাবেই হোক, প্রতিশোধ নেব এই মৃত্যুর। আমার মতই রক্তের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এগোতে থাকেন বাবা। কিন্তু ১৯২৬ সালে অজ্ঞাতনামা এক আততায়ীর ছুরিকাঘাতে বাবা মারা যান হলিউডে। পৃথিবীর কেউ না জানলেও আমি জানি, কে ছিল সেই আততায়ী।

'এর পরে স্বাভাবিকভাবেই দায়িত্বটা এসে পড়ে আমার ওপর। দায়িত্বটা পালিত হবে সেদিন, যেদিন তাকে শেষ করতে পারব নিজহাতে।

'সে আমার মায়ের জীবন নিয়েছে। আরও অনেকের জীবন নিয়েছে কেবল নিজে বেঁচে থাকার নারকীয় উদ্দেশ্যে। সে অত্যন্ত চালাক, শয়তানের চেয়েও ধুরন্ধর। কিন্তু আমার হাত থেকে নিস্তার পাবার কোনও উপায় তার নেই!'

'সার গাই, এখানেও যে একটা খটকা থেকে যাচ্ছে।'

'কী?'

'১৮৮৮ সালেও যদি আপনার জন্ম হয়ে থাকে, এখন তা হলে আপনার বয়স ৮৫ হবার কথা। অথচ... আপনিও কি তা হলে অনন্ত যৌবনের বর পেয়েছেন?'

হাসলেন সার গাই। 'হয়তো প্রতিশোধ নেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষাই আজও আমাকে এতটা সুস্থ রেখেছে।'

এতক্ষণে সব বুঝলাম। পিছু তিনি ছাড়বেন না। তাঁর ইচ্ছে জ্যাক দ্য রিপার-এর মতই অদম্য।

আগামীকাল ঠাণ্ডা মাথায় আবার তিনি শুরু করবেন অনুসরণ। অবশ্য দু'দিন আগে হোক আর পরেই হোক, কাগজপাতিগুলো তাঁকে তুলে দিতেই হবে এফ.বি.আই.-এর হাতে। আর, তাতে কাজটা বরং অনেক সোজা হয়ে যাবে।

'চলুন,' এগোতে বললাম তাঁকে।

'এক মিনিট,' বললেন সার গাই। 'রিভলভারটা দিন তো।' খুব দ্রুত আবার দৃষ্টি বুলোলেন চারদিকে। 'ওটা সাথে না থাকলে কেমন যেন একটা অস্বস্তি লাগে।'

অন্ধকার একটা গলির দিকে এগিয়ে চললেন সার গাই।

আমি যেতে চাইলাম না, কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা।

'রিভলভারটা দিন, জন,' আবার বললেন তিনি।

'বেশ।'

কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়েই আবার বের করে আনলাম আমি।

'রিভলভার কই,' বললেন তিনি। 'ওটা তো ছুরি।'

'জানি।'

ছুরি উঁচিয়ে দ্রুত ঝুঁকে পড়লাম সামনের দিকে।

'জন!' আর্তনাদ করে উঠলেন সার গাই হলিস।

'জন নয়,' যেন বাতাসকে কথা শোনাচ্ছি, এমনভাবে ফিসফিস করে উঠলাম আমি। 'বলুন... জ্যাক।'

মূলঃ রবার্ট ব্লচ
রূপান্তরঃ খসরু চৌধুরী

কানামাছি ভোঁ ভোঁ

ক্লিয়ারলন।

একটি দোতলা বাড়ি। সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত।

প্রধান গেট পার হলেই ভেতরে দীর্ঘ ফাঁকা লন। বিশ গজের মধ্যে কোনও গাছাগাছালি নেই। কাজেই তেমন ছায়া বা অন্ধকারও নেই। এই মুহূর্তে বাড়িটির সব কয়টি ঘরে বাতি জ্বলছে। দূর থেকে দেখে খুব অবাক হলো রুডনি হাণ্টার। বিষয়টি অস্বাভাবিক লাগছে তার কাছে।

'সামনের দরজাটাও কেমন হাঁ করে খোলা দেখো,' যেন স্বামীর মনোভাব বুঝে কথাটি বলল মরিয়েল।

গাড়ি এসে থামল সিঁড়ির কাছে। নেমে উপরে কয়েক ধাপ উঠল হাণ্টার। দরজার দুপাশে কাঁচের জানালা। পর্দা ওঠানো। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ভেতরের সব কিছু। বাম দিকে ডাইনিংরুম। ডানদিকে লাইব্রেরী। মানুষজনের সাড়াশব্দ নেই। খাঁ খাঁ করছে বাড়িটি।

পথে একবার থেমে অল্প কিছুক্ষণ জিরিয়েছে ওরা। কিন্তু তাতে এমন দেরি হয়ে যায়নি যে ওদের জন্যে বাড়িতে কেউ থাকবে না। সস্ত্রীক ক্রিসমাস পার্টির দাওয়াত দিয়ে গেল কোথায় সব? ভাবতে ভাবতে গাড়ির কাছে ফিরে এল হাণ্টার। ভেতর থেকে দুটো সুটকেস নামিয়ে টেনে নিয়ে চলল আবার দরজার দিকে। গাড়িতে চুপচাপ বসে আছে মরিয়েল।

উপরে উঠে দরজার ভেতরে মাথা গলিয়ে শিস দিল হাণ্টার। এল না কেউ। এবার নকার ধরে শুরু করল ঘটাং ঘটাং। প্রতিধ্বনি ছাড়া কিছুই শোনা গেল না এবারও।

'মনে হচ্ছে এ বাড়িতে কোনও জনমানুষ নেই। আমরা বরং...' ধুপধাপ করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গা ঘেঁষে দাঁড়াল মরিয়েল।

'মলি লিখেছিল বাড়িতে ওর দুটো চাকর আছে। কাজেই ওরা যদি বাইরে যায়ও, তা হলে অন্তত চাকরগুলো তো থাকবে। সন্দেহ হচ্ছে আমরা ঠিক জায়গামত এসেছি কিনা।'

'ঠিকই এসেছি। গেটে বাড়ির নাম পরিষ্কার লেখা আছে। তা ছাড়া এই এলাকায় মাইলখানেকের মধ্যে তো আর কোনও বাড়ি নেই,' জবাব দিল মরিয়েল।

বাম দিকের ডাইনিং রুমে সাইড বোর্ডে কাটা মুরগী আর বিশাল এক গামলায় কাজু বাদাম দেখা যাচ্ছে। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। সামনে একটা চেয়ারে ছড়ানো উল আর কাঁটা দেখে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেও এখানে কেউ বসেছিল।

'চলো ভেতরে ঢুকি। মনে তো হচ্ছে এইমাত্র আগুন জ্বালানো হয়েছে।' হলরুমে ঢুকে হাতের ব্যাগগুলো নামাল হাণ্টার। পেছনের খোলা দরজা বন্ধ করার জন্য এগুতেই চট করে হাত চেপে ধরল মরিয়েল। 'ওটা খোলা থাক,' ফিসফিস

করে বলল সে।

'কেন?'

'আমার ভয় করছে,' হাতটা আরও জোরে চেপে ধরল মরিয়েল।

'আরে ধুর। ছাড়ো তো।' হাত ছাড়িয়ে নিলেও বুকের ভেতরটা ধুক করে উঠল হাণ্টারের। সশব্দে দরজা বন্ধ করল সে। ঠিক তখন ডান দিকের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল মেয়েটি।

দেখতে সুশ্রী। বয়েস বিশ-বাইশ। হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হলো এ বাড়ির গৃহকর্ত্রী সে, নিদেনপক্ষে গভর্নেস। একটু মোটা গড়নের হলেও ক্ষীণ কটি। পরনে বাদামী রঙের স্কার্ট, মাথার চুলও বাদামী, মাঝখানে সিঁথি কাটা। মেয়েটির হাতে একটি থলে, দেখে মনে হচ্ছে ভেতরে তুলোর মত কিছু রয়েছে। সোজা এগিয়ে এল সে আগন্তুকদের দিকে।

'অত্যন্ত লজ্জিত আমি,' রিন রিন করে উঠল কণ্ঠ, 'কড়া নাড়ার শব্দ শুনছিলাম, তবে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না... তোমরা নিশ্চয় অনেকক্ষণ হয় দাঁড়িয়ে আছ?' প্রশ্ন করল সে।

'না না, তাতে কী?' স্বগতোক্তি করল হাণ্টার। কিন্তু মনে হলো ও এত জোরে কড়া নেড়েছে যে তাতে মরা মানুষও জেগে ওঠার কথা। মেয়েটির হাতের থলির দিকে চোখ পড়তে নিজেই ব্যাখ্যা শুরু করল সে, 'এটি কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলার জন্যে ব্যবহার করা হয়। রুমাল দিয়ে চোখ বাঁধা হলে খেলা জমে না। ফাঁক দিয়ে সব দেখা যায়, ইচ্ছে করলে খুলেও ফেলা যায়। কিন্তু যদি এরকম একটা বালিশের খোলা দিয়ে মাথা থেকে গলা পর্যন্ত ঢেকে রাখা যায়, তা হলে কেউ কিছু দেখতে পায় না; অথচ শ্বাসকষ্টও হয় না,' আত্ম নিমগ্ন কণ্ঠস্বর। শির শির করে উঠল হাণ্টারের গা।

'কী যা তা বকছি,' হঠাৎ যেন সচেতন হলো মেয়েটি। 'তোমরা কোত্থেকে এসেছ?'

'আমি হাণ্টার। ও আমার স্ত্রী মরিয়েল। এ-বাড়ির মালিক ব্যানিস্টার সাহেব আমার বন্ধু। ইস্টারের দাওয়াত করেছেন আমাদের। আসতে একটু দেরি হয়ে গেল....'

'কিন্তু... তিনি তোমাদের কিছু বলে দেননি?'

'কী ব্যাপারে?' প্রশ্ন করল দুজনে একসাথে।

'এই রাতে বেশ কিছু সময় এ বাড়িতে কোনও জনমনিষ্যি থাকে না। গত ষাট বছর ধরে চলছে এই নিয়ম। সবাই বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। বলতে পারো পালিয়ে যায়।'

'কী বলছ এসব? কোথায় যায় সবাই?'

'চার্চে,' হাসল মেয়েটি। 'বিশেষ এক প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে যায় ওরা।'

কথাবার্তাগুলো কেমন খাপছাড়া মনে হচ্ছে ওদের।

'যেখানে যা থাকে তেমনি রেখে বেরিয়ে যায় সবাই। কিন্তু কেন যে যায়, কেউ জানে না। আমাদের মনে হয় ব্যানিস্টার নিজেও জানে না।'

'তুমি কে?' হঠাৎ প্রশ্ন করল মরিয়েল। গলার স্বর কেঁপে উঠল তার! 'এসব

কথা আমাদের বলছ কেন?'

'না না, আমি পাগল নই,' আশ্বস্ত করছে মেয়েটি। 'যাকগে, তোমরা সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছ। এসো, ভেতরে এসে বসো।'

প্রসঙ্গ পাল্টে লাইব্রেরি ঘরের দিকে আহ্বান করল ওদের। পেছন পেছন রওনা হলো দুজন।

ঘরটা লম্বা, ছাদ নিচু। রাস্তার দিকের জানালাগুলোতে পর্দা নেই। তবে ফায়ারপ্লেসের পাশের জানালায় পর্দা ঝুলছে। উইণ্ডো বে অর্থাৎ তিনদিক থেকে আলো বাতাস আসতে পারে এরকম কুলঙ্গিযুক্ত জানালাটি বিশেষভাবে পর্দা ঢাকা। বসতে বসতে হাণ্টারের মনে হলো ওই পর্দাটি যেন আচমকা নড়ে উঠল।

'ও কিছু না,' হাণ্টারের দৃষ্টি অনুসরণ করে বলল মেয়েটি। 'ওখানে কিছু নেই। বহু বছর আগে এক ভদ্রলোক উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুই দেখতে পাননি। তবে তাঁর হাতে কিছু একটা ঠেকেছিল যার কথা তিনি কাউকে কোনওদিন বলেননি।... তারপর থেকেই এ বাড়িতে এত আলো জ্বলে।'

এসব এলোমেলো কথা শুনে অসুস্থ বোধ করছে মরিয়েল। বসে পড়ল সে একটি সোফায়।

'আমরা বরং একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি,' অবস্থা সামাল দেয়ার জন্য বলল হাণ্টার।

'আরে না না,' যেন আর্তনাদ করে উঠল মহিলা। 'বস বস।' ফায়ারপ্লেসের কাছ থেকে দৌড়ে এসে মরিয়েলের একদম গা ঘেঁষে বসল সে। হাণ্টার নিশ্চিত এই মেয়ের মাথা খারাপ। নইলে এত টালবাহানা করছে কেন সে।

সোফার পেছনে বুক শেলফে থরে থরে বই সাজানো। রুডনি হাণ্টারের নিজের লেখা দুটো বইও রয়েছে ওখানে।

'ওই বইগুলোর লেখক কি তুমি?' বইগুলোর দিকে আঙুল তুলে ইশারা করল মেয়েটি।

'হ্যাঁ।' হাণ্টারের চোখেও পড়েছে বইগুলো।

'তা হলে,' হঠাৎ কণ্ঠস্বর খাদে নেমে গেল, 'আমি তোমাকে একটি কাহিনি শোনাতে চাই। এই বাড়িতে, এই ঘরে বহুদিন আগে একটি খুন হয়। পুলিশ অবশ্য তার কোনও কিনারা করতে পারেনি। সেই কাহিনিটি...'

'কী ঘটেছিল?' চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়েও বসে পড়ল হাণ্টার।

বাঁ চোখের কোণা কচলে নিল মেয়েটা। চমকে উঠল মরিয়েল।

'দিন তারিখ মনে নেই। সেই আঠারোশো সত্তরের দিকের কথা তো। তবে মাসটি ছিল ফেব্রুয়ারি। সে বছর খুব বরফ পড়েছিল দেশে। অনেক পশুপাখি মারা গিয়েছিল সেবার।

'এই বাড়ি এই ঘর সব আজকের মতই ছিল। তবে সেসময় এত আলো ছিল না। প্যারাফিনের বাতি জ্বলত ঘরে। পানি তোলা হত কুয়া থেকে। খবরের কাগজ পাওয়া যেত কালেভদ্রে। সেসময় সাজগোজের স্টাইল এখনকার মত ছিল না। ছেলেরা দাড়ি রাখত। মেয়েরা তা পছন্দও করত।

'এই বাড়িটায় থাকত নতুন বিবাহিত এক তরুণ দম্পতি। মেয়ের নাম জেন,

ছেলের নাম এডওয়ার্ড। বরটির অবশ্য দাড়ি ছিল না। নাকের নীচে ছিল পুরো ঘন গোঁফ। দেখতে তেমন ভাল না হলেও মানুষটি ছিল সাদাসিধে। কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবসা করত সে।

'স্ত্রীকে নিয়ে সুখী হতে চেয়েছিল এডওয়ার্ড। কিন্তু বউ-এর মন পড়ে আছে অন্যখানে, সুখী হবে কেমন করে। বিয়ের আগেই অনেক পাণিপ্রার্থী ছিল জেনের। আর জেন নিজে মজে ছিল উইকস নামের একজনের মধ্যে। মুখ ভর্তি কালো দাড়ি, গলায় সোনার চেন, আর ছাদ খোলা একটা গাড়িতে করে সারা শহর চষে বেড়াচ্ছে উইকস, এই ছিল তার স্মার্টনেস। অনেক মেয়েরই স্বপ্ন পুরুষ সে।' ভাঁজ করা থলেটা নাড়তে নাড়তে কথা বলছে জেন। 'ব্যবসা উপলক্ষ্যে প্রায়ই লণ্ডনে থাকতে হত এডওয়ার্ডকে। মাঝে মাঝে রাতে বাড়ি ফিরত না। প্রথম প্রথম খারাপ লাগত জেনের। কিন্তু সয়ে গেল আস্তে আস্তে। বাড়িতে জেনের সঙ্গী ছিল একজন বয়স্কা চাকরাণী।

'ফেব্রুয়ারির এক রাতের কথা বলছি। এডওয়ার্ড বাড়িতে নেই। ভাইঝির বাচ্চা হবে, সে উপলক্ষ্যে চাকরাণীটিও গেছে বাইরে। বরফ পড়ছে সারাদিন। অনেক রাতে মুডি নামের এক ভদ্রলোক এই বাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, দোতলায় আলো জ্বলছে। জানালার পাশে মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে জেন। মুডি সাহেবই শেষ ব্যক্তি যিনি জেনকে জীবিত দেখেছিলেন।

'হ্যাঁ, দেখেছে আরও একজন। সেই উইকস। সে এবং তার দুই বন্ধু ডক্টর সাটন আর রেসের পাগল পউনিকে নিয়ে গ্রামের বাইরে এক তাঁবুতে সারাদিন আড্ডা গুলতানি মেরে রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ ফিরছিল এই পথ দিয়ে। গাড়ি চালাচ্ছিল উইকস্।

'আকাশে ভরা চাঁদ। বরফ পড়া থেমে গেছে। ঝকমক করছে পৃথিবী। এ বাড়িটা পার হবার সময় আচমকা ব্রেক কষল উইকস। কী ব্যাপার? নীচের তলায় আলো জ্বলছে অস্বাভাবিকভাবে। "ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না আমার কাছে। একটু দেখা দরকার। আমি জানি এডওয়ার্ড এখন বাড়িতে নেই। ওর স্ত্রী ঘুমায় সকাল সকাল। তা হলে এই সময় ওখানে হচ্ছেটা কী? চোর ছ্যাঁচড় হলে এক হাত দেখে নেব আমি।" দুবার বলল সে শেষের কথাটা। তারপরই একলাফে গাড়ি থেকে নেমে হন হন করে চলল বাড়ির দিকে। গাড়িতে বসে রইল অন্যরা। ওরা দেখল জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল উইকস্। কিছুক্ষণ ওভাবে থেকে ফিরে এল আবার গাড়ির কাছে। "না তেমন কিছু না। মিয়া বিবির গোলমাল।" বলল সে শান্ত কণ্ঠে। "এডওয়ার্ড বাড়ি ফিরেছে। ইদানীং ও একটু শুকিয়ে গেছে। অবশ্য আমার দেখার ভুলও হতে পারে। ওকে আমি দেখিনি। ছায়া দেখে ওরকম মনে হলো।" তারপর সবিস্তারে বর্ণনা শুরু করল উইকস্, সে দেখেছে সিঁড়ির গোড়ায় এলোচুলে মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে মিসেস এডওয়ার্ড। আর উইকস্-এর দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এডওয়ার্ড। পরনে লম্বা কোট, মাথায় হ্যাট। দূর থেকে ওর হ্যাটের নড়াচড়া দেখে মনে হলো কোনও বিষয় নিয়ে দুজনের খুব কথা কাটাকাটি হচ্ছে।

'লোকটিকে অবশ্য ওর চেনার কথাও নয়,' মন্তব্য করল মেয়েটি। 'পরের দিন সকাল সাতটা নাগাদ মিসেস র‍্যাণ্ডেল, মানে ওই চাকরাণীটি বাড়ি ফিরে এল। মনটা প্রফুল্ল। ভাইঝির ছেলে হয়েছে। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে নকার নাড়াচাড়া করেও কেউ দরজা খুলল না দেখে অবাক হলো সে। জানালা দিয়েই ভেতরে ঢুকল সে। আর তখুনি চোখের সামনের দৃশ্যটি দেখে চিৎকার করে উঠল।

'মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে আছে বেগম সাহেব। কোমর থেকে শরীরের নিম্নাংশ পুড়ে ঝলসে গেছে। নাইট গাউন, ড্রেসিং রোপ পুড়ে সেঁটে আছে গায়ের সঙ্গে। মেঝেতে রক্ত আর প্যারাফিনের তেল ভিজে চপচপ করছে। ভাঙা বোতল থেকে তেল গড়াচ্ছে। কাছেই একটা মোমদানি, তাতে পুড়ে যাওয়া মোমের শেষাংশ। দোতলায় ওঠার কয়েকটা সিঁড়িও ঝলসে গেছে। বাতিতে পর্যাপ্ত তেল নেই, থাকলে হয়তো পুরো বাড়িটাই ছাই হয়ে যেত।

'জেনের গলা ধারাল কোনও অস্ত্র দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়া হয়েছে। পুড়তে পুড়তে দরজার দিকে এগিয়ে এসেছিল সে। কিন্তু পৌঁছাবার আগেই মারা গেছে।' এক মুহূর্ত থামল কাহিনিকার। একটু নড়ে-চড়ে বসতেই চট করে হাণ্টারের কাছে সরে এল মরিয়েল।

'পুলিশ এল পরে। পরীক্ষা করে দেখল কিছুই চুরি হয়নি বাড়ি থেকে।' আবার শুরু হলো কাহিনি। ওরা মোমসহ মোমবাতিটাকে আলামত হিসাবে গ্রহণ করল। ওদের হিসেব মতে মোমবাতিটি বেডরুম থেকে হাতে নিয়ে নেমেছে জেন। আর ভাঙা ল্যাম্পটা এনেছে সে নিজে। পুলিশের ধারণা খুনী যখন ওকে আক্রমণ করে ওটা তখন হাত থেকে পড়ে যায়। তেল ছিটকে পড়ে গায়। এবং আগুন ধরে যায় তার পরপরই। আর তখুনি হ্যাট মাথায় খুনীটা ওর গলা কেটে উপরে উঠে যায়। এবং কোনও ভাবে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

'পুলিশের ধারণা, মিসেস এডওয়ার্ড নীচে নেমেছিলেন স্বামীর জন্য নয়, অন্য কারও জন্যে। কারণ জেনির লাশের কাছাকাছি পাওয়া গেল একটা ভাঙা ওষুধের বোতল আর একটা চিঠির টুকরো টুকরো করা কয়েকটা অংশ। পাঠোদ্ধার করে পুলিশ যা বুঝল তা হলো কেউ একজন প্রচুর ভালবাসার কথা বলে, সেরাতে জেনির কাছে অভিসারে আসার প্রস্তাব রেখেছিল।'

'পুলিশ হাতের লেখা চেনেনি?' প্রশ্ন করল হাণ্টার।

'চিনেছে। হাতের লেখা ছিল উইকস্-এর।' জবাব দিল মেয়েটি। 'পুলিশ অবশ্য মান সম্মানের কারণে প্রমাণের চেষ্টা করেনি। তবে উইকসকে জের করেছে। ওর কাছে একটা রক্ত-মাখা ছুরিও পাওয়া গেল। তবে সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে দেখা গেল উইকস ওটি খরগোশ মারার জন্য ব্যবহার করেছিল। পুলিশ বিষয়টি নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করল না। কারণ এরকম খুন পৃথিবীতে কারও পক্ষেই করা সম্ভব নয়। ওরা তা পরিষ্কার বুঝেছিল।'

'তার মানে?'

'ও কিছু না। এমনি বললাম।' কান খাড়া করে দূরের কোনও শব্দ শোনার চেষ্টা করল মেয়েটি। তারপর শুরু হলো আবার, 'মিসেস এডওয়ার্ডের মৃত্যুর বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই বরফ পড়া শেষ হয়েছিল। কাজেই দরজার বাইরে ওর

দুজোড়া পরিষ্কার পায়ের চিহ্ন দেখে বুঝতে পারল কোনটি উইকস-এর আর কোনটি র‍্যাণ্ডেলের।

'উইকসকে কোনওভাবে সন্দেহ করা গেল না। ডক্টর সাটন আর পউনি নিজের চোখে দেখেছে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ও ফিরে এসেছে গাড়ির কাছে। তারপর সারারাত কাটিয়েছে বন্ধুর বাড়িতেই। তা ছাড়া হ্যাট মাথায় লম্বা লোকটাকে ও নিজেই দেখেছে। আর র‍্যাণ্ডেল ব্যস্ত ছিল সারারাত ধাত্রীর কাজে। একথাও অনেকে জানত।'

'আচ্ছা, এতসব যে বলছ, সব কি সত্যি কথা?' আচমকা প্রশ্ন করল মরিয়েল।

'অক্ষরে অক্ষরে।'

'আমার মনে হয় ওর স্বামী ওকে খুন করেছে।'

'না, না। বড় নিরীহ ওর স্বামী বেচারি,' নরম কণ্ঠে বলল মেয়েটি। 'সে রাতে সে ছিল চেরিং ক্রসের কাছে একটা হোটেলে। ওখান থেকে আর কোথাও যায়নি সে। বাড়িতে তো নয়ই।... স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদে পাগলের মত হয়ে গেল লোকটা। ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে দেশান্তরী হলো সে। যাবার আগে পুড়িয়ে দিয়ে গেল স্ত্রীর বিছানাপত্র সব।'

'তা হলে খুন করল কে?' প্রশ্ন করল হান্টার। 'দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ঘরে তৃতীয় কোনও পায়ের চিহ্ন নেই, খুনী এল গেল কীভাবে? তার উপর ঘটনা ঘটল ফেব্রুয়ারি মাসে অথচ বাড়ি ছেড়ে সবাই চলে যায় ক্রিসমাস ইভে? দুয়ের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই।'

'সে আরেক গল্প। ...সময়ে সব কিছু বদলে যায়। মানুষের বয়েস বাড়ে। চরিত্র পাল্টায়।' এক মুহূর্ত দম নিল সে। 'যাহোক, পুলিশ কেইসটাকে বাতিল ঘোষণা করল। এই বাড়ির কিছু পরিবর্তন হলো। বাইরে পাম্প বসল। নতুন মালিক এল। প্রিন্স অভ ওয়েলস ভারত সফরে গেলেন। গ্রীষ্ম বর্ষা আগের মতই এল গেল।

'এর মধ্যে অনেকে মারা গেলেন। মিসেস র‍্যাণ্ডেল, ডক্টর সাটন কেউ বেঁচে থাকল না। তবে বেশ ফুলে ফেঁপে উঠল উইকস। বিয়ে করল সে অগাধ সম্পত্তির মালিক লিমশে নামের এক মেয়েকে। জেন যখন মারা যায় তখন এই মেয়েটির সঙ্গেও খুব দহরম মহরম চলছিল ওর। জেনি সবই জানত। শুনেছি ওর নিজের বিয়ের পর ওই মেয়েটির কথা চিন্তা করে রাগে ক্ষোভে বহুরাত নিজের বালিশ কামড়ে ছিঁড়েছে জেনি।

'যাহোক উইকস-এর বয়েসও বাড়ল। মাঝ-বয়েসে ওর চেহারা সুরৎ আরও ভাল হলো। এই বয়েসেও মেয়েরা ওর জন্যে পাগল হয়। যে কোনও আনন্দ উৎসবের সে হয় মধ্যমণি। ওর পাশে দাঁড়িয়ে স্বামীর সৌভাগ্য উপভোগ করে ওর হাঁদা বৌ!

'এক ক্রিসমাস ইভের দিন। বাড়ির মালিক ফ্যান্টন সাহেব ঠিক করলেন উৎসব করবেন। তবে তেমন জাঁকজমক হবে না। দাওয়াত করলেন এলাকার সব গণ্যমান্য ব্যক্তিকে। উইকসও বাদ গেল না। এসব শুনেছি মিসেস ফ্যান্টনের এক চাচীর কাছে। উৎসবের দিন তিনি এ বাড়িতেই ছিলেন।

'দুপুর হতেই অতিথিরা আসতে শুরু করল। বেশ স্ফূর্তির মুডেই আছে

সবাই। কিন্তু চাচীর কেন যেন কিছুই ভাল্লাগছে না। সারা বাড়িতেই মেটে মেটে গন্ধ পাচ্ছেন তিনি। এদিকে মুরগী কাটতে গিয়ে নিজের আঙুল কেটে গেল মিসেস ফ্যাণ্টন-এর। আর ফ্যাণ্টন সাহেব তো কার্পেট বিছাতে গিয়ে নিজের স্ত্রীকেই মা বলে ডেকে বসলেন। চাচীর কাছে সব কিছুই অশুভ মনে হচ্ছে।

'আগেই বলেছি হালকা মেজাজের উৎসব। ছেলেবেলার খেলাধুলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কিছু। যেমন, রবিন ফর অ্যাপেলস্, নাটস্ ইন মে এসব। জমে উঠল সবাই। সব কিছুর মধ্যমণি উইকস্। ওকে বাদ দিয়ে যেন কিছুই জমে না। চান্স পেলেই মেয়েদের গালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সে। মেয়েগুলোও হ্যাংলার মত গাল বাড়িয়ে দিচ্ছে ওর হাতের স্পর্শের জন্য। অবশ্য জানালার পর্দার আড়ালে মিসেস টুইলোর সঙ্গে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলল সে।

'সন্ধ্যা নাগাদ শুরু হলো খুব বাতাস। রাতও বাড়ছে। স্ন্যাপ ড্রাগন বাতি জ্বালাবার ব্যবস্থা করলেন গৃহকর্তা। এর মধ্যে খেলায় নতুন একটি সংযোজন হলো। গামলাভর্তি আঙ্গুর থাকবে। এক খাবলায় যে সবচেয়ে বেশি তুলতে পারবে সে হবে বিজয়ী। ফ্যাণ্টন সাহেব নিজে যখন আঙ্গুর তুলছেন, ঠিক তখুনি মিসেস ফ্যাণ্টনের মনে হলো তিনি যেন ওর মুখের কাছে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। অবশ্য চেহারা চিনতে পারেননি।

'রাত বাড়ছে। বাচ্চাদের ঘুম পাচ্ছে। এদিকে বড়দের খেলা জমে উঠেছে খুব। কে একজন প্রস্তাব করল কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলার। পছন্দ হলো সবার। একটুকরা কাপড় দিয়ে বাঁধা হলো একজনের চোখ। শুরু হলো ছোঁয়াছুঁয়ি। মেয়েদের কারও চোখ বাঁধা হলে ঘুরেফিরে গিয়ে ধরে সে উইকসকে। ওটাই যেন মজা। বিষয়টিতে মহাবিরক্ত হলো ফ্যাণ্টন। নিশ্চয় ফাঁকফোকর দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়। নইলে সবাই ওই উইকসকে ধরে কেন? বিকল্প ব্যবস্থা করল ফ্যাণ্টন। একটা বালিশের কভার নিয়ে এল সে—এই যে আমার হাতে দেখছ ঠিক এটার মত। মাথায় পরালে চোখে কিছু দেখা যাবে না, আবার দমও বন্ধ হবে না।

'যা হোক, নতুন ব্যবস্থা সবাই মেনে নিল। খেলা চলছে। এর মধ্যে গোলমাল শুরু করল ঘরের বাতি। মাঝে মাঝেই নিভু নিভু হয়ে যাচ্ছে। একজনের মাথায় খোলটা পরাতে পরাতে ঘাড় ফিরিয়ে নিজের স্ত্রীকে সলতেটা উসকে দিতে নির্দেশ দিল ফ্যাণ্টন। কার মাথায় খোলটা পরানো হলো তার চেহারাটা দেখতে পেল না সে।

'কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলায় কী হয়? যার চোখ বাঁধা হয় সে প্রথমে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ অনড় হয়ে, ঠিক করে কোন দিকে যাবে, তারপর হাতড়ে হাতড়ে রওনা হয় সেদিকে। এক্ষেত্রেও তাই হলো। চোখ বাঁধা মানুষটি সামান্য ঝুঁকে সামনের দিকে এগুতে শুরু করল। কিন্তু তারপরই কয়েক লাফে পৌঁছে গেল সোজা উইকস-এর সামনে। একটা টেবিলের কোণায় মদের গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। কানামাছিকে দেখে হাসল সে। দুই কদম সামনে এগিয়ে আচমকা লাফ দিল কানামাছি। চট করে সরে গেল উইকস। সামলে নিয়ে আবার এগুলো চোখ বাঁধা লোকটি। পিছাতে গিয়ে টবে রাখা একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল উইকস। খেলা খুব জমে উঠেছে। মজা পেয়ে সবাই

খুব উৎসাহ দিচ্ছে। চোখ বাঁধা মাছি আবার এগুচ্ছে। এবার উইকস-এর একদম মুখোমুখি সে। গলা থেকে কোনও শব্দ বের হচ্ছে না উইকস-এর।

'বুক কেসের কোণায় আটকে গেল সে। বের হলেই ছুঁয়ে ফেলবে কানামাছি। অথচ দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পাচ্ছে না সে। "দয়া করে এই জিনিসটাকে যেতে বলো, ফ্যান্টন," চিৎকার করল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে লাফ দিল মাছি।

'বে-উইণ্ডোর পর্দার আড়ালে সরে গেল উইকস। কাছাকাছি ছিল মিস টুইগ। সেন দেখল ছোঁয়ার পরও কানামাছি মুখ থেকে কভারটা সরায়নি। কিন্তু ঠিক যে জায়গায় বেঁধে থাকার কথা সে জায়গাটা রক্তিম হয়ে উঠল। চিৎকার করল উইকস। ধুপধুপ শব্দ হলো পতনের। তারপর সব চুপচাপ।

'সবই কি বেশি মদের ঘোর নাকি? বুঝতে পারছে না ফ্যান্টন। পর্দার এপার থেকে দুজনকেই ডাকাডাকি করল বেরিয়ে আসার জন্যে। কিন্তু ওপার থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। মেয়েটাকে ভেতর থেকে বের করে আনার জন্যে উঁকি দিল মিসেস অ্যাবোট। এবং দেখল বে-উইণ্ডো ভেতর থেকে বন্ধ অথচ ওখানে পড়ে আছে শুধুমাত্র উইকস। দাড়িভর্তি মুখটা স্থির চোখে তাকিয়ে আছে শূন্যে। দৃষ্টিতে নির্জলা আতঙ্ক। রক্তাক্ত কণ্ঠনালী। কামড়ে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে ওটা। মারা গেছে উইকস। যেহেতু ওই লোকটি জেনকে খুন করেছে, আমি মনে করি এরকম মৃত্যু ওর প্রাপ্য ছিল,' শেষ করল বক্তা।

' শ্রোতাদের মুখে কোনও কথা নেই। ঘরের ভেতর যেন সপ্তদশ শতাব্দীর নীরবতা বিরাজ করছে। ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার তাড়া বোধ করলেও প্রশ্ন করল হাণ্টার, 'তোমার কথা মত জেনকে খুন করেছে উইকস। অথচ তুমিই বললে সে রাতে ও ওই বাড়িতেই ঢোকেনি। তা হলে ওর পক্ষে খুন করা কীভাবে সম্ভব হলো?'

'উইকস এই বাড়িতে ঢোকেনি। ঠিক। ওর ঢোকার প্রয়োজন তো শেষ হয়ে গিয়েছিল। একদিকে সে পরকীয়া চালাচ্ছে জেনের সঙ্গে অন্যদিকে প্রেম করছে লিমশের সঙ্গে। এদিকে এটি জানাজানি হয়ে গেলে লিমশে আর তার সম্পত্তি দুটোই হাতছাড়া হয়ে যায় ওর। সুতরাং সুযোগে পুরো সদ্ব্যবহার করল সে।'

'কীভাবে?'

'খুব সহজে। উইকস আর দলবল যখন এ-রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এ-বাড়িতে আগুন জ্বলছিল তখন। এবং উইকস জেনেশুনে চেপে গেল সব।'

'আসলে কী ঘটে ছিল?'

'প্রেমিকের চিঠি পেয়ে দোতলা থেকে তড়িঘড়ি নামছিল জেন। একহাতে না জ্বালানো বাতি, অন্য হাতে প্রজ্বলিত মোমবাতি। আর একটা পুরনো ওষুধের বোতলে প্যারাফিন তেল। নীচে নেমে ল্যাম্পে তেল ঢেলে মোমবাতির আলোতে ওটা জ্বালাবার ইচ্ছা ছিল তার।

'দ্রুত পায়ে নামছে জেন। সিঁড়ির প্রায় অর্ধেক নেমে এসেছে সে। আচমকা নাইট গাউনে পা আটকে হুমড়ি খেয়ে নীচে পড়ল সে। খান খান হয়ে ভেঙে গেল হাতের বোতল। তেল ছিটকে পড়ল গায়ে। মোমবাতির আগুন চট করে লেগে গেল তেলে। এখানেই শেষ নয়। ভাঙা বোতলের একটি তীক্ষ্ণ ফলা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল গলা। মাটিতে পড়েও জ্ঞান হারাল না জেন। শরীর পুড়ছে, গলা

থেকে গরম রক্ত ঝরছে। তবুও দরজার দিকে এগুবার চেষ্টা করছে সে।

'আর এই পুরো দৃশ্যটাই দেখল উইকস। গাড়িতে বসা দুই বন্ধুর জন্য আজ রাতে ওর জেনের কাছে আসা সম্ভব নয় এই তথ্যটুকু জানিয়ে চলে যাবার ইচ্ছে ছিল তার।

'জানালা দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল সে জেন পুড়ছে। ওর দিকে তাকিয়ে মিনতি করছে করুণ চোখে। নীল ধোঁয়া ওকে ঘিরে রয়েছে। আস্তে আস্তে ওর চোখের সামনেই হলুদ আগুন গ্রাস করল জেনকে। কিছু করল না উইকস। সেই মুহূর্তে যদি সে ঘরে ঢুকত, হয়তো বেঁচে যেত জেন। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় মরতে দিল সে জেনকে।

'বন্ধুদের কাছে ফিরে এসে গল্প করল লম্বা কোট আর হ্যাটের। ও যখন গাড়ির কাছে ফিরে এল, সবাই দেখেছিল ওর কপাল ঘামছে। কিন্তু কেউ কোনও প্রশ্ন করেনি তাকে।

'আশা করি এখন বুঝতে পারছ কেন জেন ওয়েক্স এতদিন অপেক্ষা করেছিল বদলা নেয়ার জন্য?'

সারা ঘরে নীরবতা। মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। বাদামী স্কার্টটা কোমরের কাছে সেঁটে আছে। ক্ষীণ আলোয় হান্টারের মনে হলো এই মেয়েটির সব কিছুই মেকি। এটি এর আসল চেহারা নয়। আবার বসল মেয়েটি।

'এর পর থেকে প্রায় প্রতি ক্রিসমাসেই এ বাড়িতে এরকম ঘটনা ঘটতে শুরু করল। বিশেষ করে কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলা হলেই মরতো কেউ না কেউ। আর সবই ঘটত সন্ধ্যা সাত থেকে আটটার মধ্যে।'

উইণ্ডো-বের দিকে তাকিয়ে হান্টার বলল, 'আমরা যখন এখানে আসি তখন সাতটা বাজছিল। তারমানে এখুনি...'

'হ্যাঁ,' চকচক করে উঠল মেয়েটির চোখ। 'তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তোমাদের অনুরোধ করেছিলাম গল্পটি শোনার জন্যে। তোমরা শুনেছ। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

জানালার পর্দাগুলো নড়ল না কিন্তু হঠাৎ মনে হলো যেন ঘর থেকে ধোঁয়াটে ভাবটা কেটে গেল। উইণ্ডো-বের দিকে এগিয়ে এসে পর্দাটা তুলে দিল হান্টার। একদম গা ঘেঁষে দাঁড়াল মরিয়েল। ওপাশে একটা খালি চেয়ার। চিত্রিত কাপড় দিয়ে ঢাকা। দূর আকাশে চাঁদ উঠেছে। চেয়ারটা সম্পর্কে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই হান্টার দেখল ঘরে কেউ নেই। সাদা হয়ে গেল মরিয়েলের মুখ। খামচে ধরল সে হান্টারের হাত। বে-উইণ্ডোর দিকে আর তাকাবার সাহস হচ্ছে না ওদের।

হঠাৎ দূর থেকে শোনা গেল মানুষজনের কণ্ঠস্বর। চার্চ থেকে ফিরছে সবাই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওরা।

মূলঃ জন ডিকসনকার
রূপান্তরঃ বিশু চৌধুরী

অশ্ব মানব

শেনদুঁ নামের সেই অদ্ভুত লোকটির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে সাঁ জামেন দ্য প্রে নামে এক কবি আমার জীবনে এসেছিল। প্রতীকী কবিতা লিখত সে। এখান থেকে ওখান থেকে শব্দ আর বাক্য ধার করে সে কবিতার মালা গেঁথে পাঠকের গলায় পরাত। সাহিত্য জগতের নাক উঁচু তথাকথিত আঁতেল সমাজ ওই কবিতায় নতুনত্বের স্বাদ পেয়ে তাকে মাথায় তুলে নাচত। পত্রিকার সম্পাদক সমালোচক, কবি, লেখক এমনকী রমণীকুল তার প্রশংসায় থাকত পঞ্চমুখ। অতএব কবি হিসেবে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হয়নি। ওপরে ওঠার জন্যে প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছিল সে। তার সেই জীবন সংগ্রাম পর্বে আমারও যৎসামান্য ভূমিকা ছিল। আমার দেয়া আর্থিক সাহায্য বেশ উপকারে আসত তার। আমি তখন সবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। আয় ছিল সামান্য। ওই অল্প আয় প্রবল প্রতিভাবান কবির জন্যে যথেষ্ট ছিল না। কাজেই আমার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবার প্রয়োজনীয়তা সে সামান্যই অনুভব করছিল। একদিন স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিল, আমার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখতে চায় না সে। তার এই মর্মান্তিক প্রত্যাখ্যান আমার হৃদয়ে এমন গভীর বেদনার ক্ষত সৃষ্টি করল যে, আত্মহত্যা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও চিন্তা মাথায় আনতে পারলাম না। ওই কাজটি কীভাবে করা যায় তা নিয়েই আচ্ছন্ন হয়ে রইল মন। গ্যাসের চুলায় নিজেকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেব? সেটা করতে গিয়ে দেখলাম বাড়ির গ্যাস লাইন কাটা। সনাতন রীতি অবলম্বন করে সেন নদীতে ডুবে মরা যায়। কিন্তু মুশকিল হলো ঠাণ্ডা পানি আমি একদম সইতে পারিনে। চলন্ত ট্রেন কিংবা বাসের নীচে ঝাঁপিয়ে পড়লেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। আর একটু হলে ওই পথটাই বেছে নিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হলো, আমার মৃত বিকৃত সুন্দর শরীরটার ছবি যখন পরের দিন খবরের কাগজে ছাপা হবে আমার প্রাণেশ্বর (এখনও সে আমার মনের মণিকোঠায়) তখন বাঁকা হাসি হাসবে। ওই ভাবনা মনে আসতেই মৃত্যুর চিন্তা মাথা থেকে তাড়িয়ে দিলাম। বাঁচার প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে উঠল মন। নিজেকে কষে একখানা ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন কী করবি বল?'

এরকম যখন অবস্থা তখন খবরের কাগজের একটি বিজ্ঞাপন চকিতে আমার দৃষ্টি কেড়ে নিল। 'বাচ্চা ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করার জন্যে ফরাসী তরুণী আবশ্যক।—শেনদুঁ।' ঠিকানাটা আয়ারল্যাণ্ডের। সবুজ শ্যামল আয়ারল্যাণ্ড ছিল আমার স্বপ্নের দেশ। আমার রোমাণ্টিক কল্পনার ভুবন। তা ছাড়া শুনেছি ইঙ্গ-স্পেন যুদ্ধের সময় আমার এক পূর্বপুরুষের সঙ্গে এক আইরিশ রমণীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, সেই সুবাদে আমার শরীরে কিঞ্চিৎ আইরিশ রক্ত প্রবহমান।

কাল বিলম্ব না করে আমি একখানা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলাম। সাত তাড়াতাড়ি জবাবও এল। শেনদুঁ আমার জীবন বৃত্তান্ত ও ছবি চেয়ে পাঠিয়েছেন। দেরি না

করে আমি যাবতীয় কাগজপত্র পাঠিয়ে দিলাম। শেনদুঁ-এর সঙ্গে আমার ঘন ঘন চিঠি চালাচালি হতে লাগল। শেনদুঁ লোকটি কেমন কল্পনায় আনতে চেষ্টা করলাম—পারলাম না। মনে তো হয় ভালই হবে—বেশ ক'জন ছেলেপুলের পিতা তিনি। বউটা নিশ্চয়ই মারা গেছে অকালে, না হলে এরকম বিজ্ঞাপন দেবেন কেন? তাঁর চিঠির নির্ভেজাল ইংরেজি মুগ্ধ করল আমাকে। সেই সময় ইংরেজি ভাষার ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিলাভের জন্যে পড়াশোনা করছিলাম আমি।

আয়ারল্যাণ্ড যাবার পরিকল্পনার কথা শুনে বন্ধুবান্ধবরা আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। ওই দূরদেশে না যাওয়ার জন্যে আমাকে অনুরোধ উপরোধ করতে লাগল। কারণ ওরা ভালবাসত আমাকে। আমাকে হারাতে চায় না ওরা। কথাটি আমার প্রেমিক প্রবরের কানেও গিয়েছিল। আমি আত্মহত্যা করলে সে অবশ্য একটা দীর্ঘ কবিতা রচনার সুযোগ পেত। ওই কবিতায় শেক্সপীয়রের তরতাজা সনেটের স্বাদ অনুভব করে তার স্তাবক ও সাহিত্য সমালোচক গোষ্ঠী তাকে নিয়ে আর একদফা লম্ফঝম্ফ করতে পারত। সেই কবিও আমার আয়ারল্যাণ্ড গমনের সংবাদে আপসের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এল। কিন্তু জীবনের স্রোত তখন আমাকে অনেক দূরে ঠেলে নিয়ে গেছে। সেখান থেকে ফেরবার আর কোনও উপায় ছিল না। ততদিনে আগাম বেতনের মোটা অঙ্কের চেক ডাক যোগে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। আমিও ডাবলিনের টিকেট বুক করে ফেললাম। মনে মনে বললাম—পারী ও তার অহঙ্কারকে নির্বাসন দিলাম আমি। এখন থেকে মন প্রাণ সঁপে দেব শেনদুঁ ও তার পরিবারের সদস্যদের সেবায়।

যাত্রাপথের অভিজ্ঞতা মোটেও সুখকর হলো না। সী সিকনেস বলতে যা বোঝায় তাই হলো আমার। তার ওপর দুটো সুটকেস হারিয়ে ফেলেছিলাম বলে মনটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। জাহাজ থেকে নেমে সঠিক ট্রেনে চাপতেও বেশ বেগ পেতে হলো। এখানেই শেষ নয়, ট্রেনের পথ শেষ হতে দু'বার বাস বদলের ঝামেলা পোহাতে হলো আমাকে। মোট কথা ভ্রমণকালিন সময়টা ছিল নিদারুণ দুর্ভোগে ভরা, যা কিনা ফরাসী হিসেবে আমার বিবেচনায় আদিম, অমানবিক ও বেদনাদায়ক। ভাগ্যিস আমার সঙ্গে একখানা ভ্রমণ ম্যাপ ছিল, তা না হলে যে কী হত ঈশ্বরই জানেন। বাস থেকে নামার পর শেনদুঁর বাসভবন থেকে পাঠানো এক লোকের সাক্ষাৎ পেলাম। সে আমার বাক্সখানা কাঁধে তুলে নিতে নিতে বলল, 'আপনিই তা হলে সেই ফরাসী তরুণী, বাচ্চাদের দেখাশোনা করবেন?' লোকটা আমাকে একটা বোটে নিয়ে গেল। নিকষ কালো রাত বাইরে। দু'পাশে ছোট ছোট বাতি দপ দপ করে জ্বলছে। অলৌকিক অদ্ভুত আঁধার কেটে আমাদের নৌযান এগিয়ে চলছে। ভেতরে ভেতরে ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছিলাম। এ কোথায় এলাম আমি? চলেছিই বা কোথায়? পারী ছেড়েই বা এলাম কেন? একটা ছোট কেবিনের ভেতরে মরার মত পড়ে ছিলাম ক্ষুৎ পিপাসা আর ক্লান্তি নিয়ে। নৌযানটি মূলভূমি ছাড়িয়ে শেনদুঁর সাম্রাজ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এখন সবে সেপ্টেম্বর, তবুও খুব শীত করছিল আমার। নৌযানের ক্যাপ্টেন এসে জানাল, 'চলুন, এসে গেছি আমরা। নামতে হবে।' বাইরে বেরিয়ে দেখি থৈ থৈ করছে জল। তীরে নামলাম আমরা। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। সেই সাথে শেনদুঁর

সাম্রাজ্যে বন্দী হয়ে গেলাম আমি। কিন্তু কোথায় মঁশিয়ে শেনদুঁ? কোন জন তিনি? কেউ আমাকে বলল না।

শেনদুঁর বাড়িতে বেশ ক'টি ছেলে মেয়ে। বয়স ছ' থেকে ষোলোর মধ্যে। এরা সবাই যে একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তা বিশ্বাস হতে চায় না আমার। কিন্তু ওদের মধ্যেকার চেহারার মিল আমার ধারণার ভিত নড়বড়ে করে দেয়। বাচ্চারা আমাকে খুশি মনেই গ্রহণ করে। ওরা বেশ সহজ সরল ও খোলামেলা। আমাকে খুব খাতির যত্ন করতে লাগল। ওদের মধ্যে যে বয়সে সবার বড় সে এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি খুব ক্লান্ত, চলুন আপনাকে শোবার ঘরটা দেখিয়ে দেই।' বাচ্চারা দল বেঁধে আমাকে শোবার ঘরে নিয়ে এল। ঘরটি বেশ খোলামেলা, বড় ও আরামদায়ক। এক কোনায় শীত তাড়ানোর জন্যে 'ফায়ারপ্লেসের' আয়োজন। ফ্রান্স ছেড়ে চলে আসার পর এই প্রথম এত আরামদায়ক গৃহকোণে ঠাঁই পেলাম। বাচ্চাদের মধ্য থেকে একজন বলল, 'বড্ড শীত, আগুন না জ্বালালে টেকা যাবে না। আমরা কেউ এসে রোজ সকালে আগুন জ্বালিয়ে দেব।' শীঘ্রি কয়েকজন ট্রেতে আমার জন্যে প্রচুর গরম খাবার নিয়ে এল। আমার পছন্দের সব খাবারই ওরা এনেছে। সুস্বাদু খাবার খেয়ে ফায়ারপ্লেসের উষ্ণতায় দ্রুত ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

যখন ঘুম ভাঙল তখন নতুন একটি দিনের আগমন ঘটেছে। কেমন অদ্ভুত ঠেকতে লাগল আমার। কেউ এসে বলল না কী করতে হবে আমাকে, আমার কাজটাই বা কী। শেনদুঁর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত এর কোনও সুরাহা হবে বলে মনে হলো না। কিন্তু কখন তিনি আসবেন তাও জানি না। মনে মনে ভাবলাম ছেলেপুলেদের বাবা না আসা পর্যন্ত আমি ওদের ফরাসী শিক্ষার ক্লাসটা চালু করে দিতে পারি। আমার এই পরিকল্পনাটা ওদের জানানো হলে ওরা এমন ভাব দেখাল, যেন ওদের সঙ্গে ঠাট্টা করছি। কারও মধ্যেই ফরাসী ভাষা শেখবার কোনও আগ্রহ দেখলাম না। বাচ্চাগুলো এমনিতে বেশ নম্র ও ভদ্র। ওরা আমাকে নিজেদের একজন বলে গণ্য করতে ভালবাসত। ওদের দৃষ্টিতে আমি বড়জোড় বাড়ির একজন অতিথি। মাতৃহীন এই অবোধ শিশুগুলো আমার কথা তেমন একটা আমল দিত না। আমি যখন 'ও হে বাচ্চারা' বলে হাঁকডাক দিতাম তখন ওদের মধ্যে কোনও চাঞ্চল্যই লক্ষ করা যেত না। বুঝতে দেরি হলো না, এরা কোনও শিক্ষকের অনুশাসনে অভ্যস্ত নয়। কেবল মাত্র বাড়ির কেয়ারটেকার যখন হাঁকডাক দেয় তখন তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। অতএব আমি হাল ছেড়ে দিয়ে ওদের পিতৃদেবের প্রতীক্ষায় দিন গুণতে লাগলাম।

এখানকার পরিবেশ এমন ভিন্ন ও অদ্ভুত হবে ভাবতেই পারিনি। অতীত দিনের স্মৃতি মন থেকে দ্রুত মুছে যাচ্ছিল। শেনদুঁ নিযুক্ত কেয়ারটেকারটির আচরণ ও গতিবিধি রীতিমত সন্দেহজনক ঠেকছিল। লোকটা এত কম কথা বলে যে, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় সে বোবা। ওর কাঁধেই আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব ন্যস্ত। সে এত দক্ষতার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে যে, প্রতিরাতেই দেখি সে আমার দরজায় তালা লাগিয়ে যায়। প্রায়ই গভীর রাতে ঘোড়ার ডাক ও খুরের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আমার।

মাস গেলেই বেতন পেয়ে যাই। কেয়ারটেকার মাসের পয়লা তারিখে একটা খামের ভেতরে করে টাকাটা নাশতার ট্রেতে রেখে দেয়। বলাবাহুল্য টাকা দিয়ে করবার মত কিছু নেই এখানে। নির্জন দ্বীপে একটা দোকান পর্যন্ত নেই। ভাল ভাল খাবার খেয়ে শুধু মোটা হচ্ছিলাম। জীবন এত একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল যে মরতে ইচ্ছে করছিল আমার। স্বেচ্ছায় এই জীবন বেছে নিয়েছি আমি, কাজেই অভিযোগ করব কার কাছে? কী অভিযোগই বা করব?

এর মধ্যেই বসন্ত আসি আসি করছে। একদিন সকালে শেনদুঁর বাচ্চারা সোরগোল করতে করতে আমার রুমে এসে জানাল তাদের বাবা নাকি ফিরে এসেছেন, ঘাটে তাঁর বোট ভিড়েছে। আমাদের সবাইকে সেখানে যেতে হবে। মেষের পালের মত আমরা কেয়ারটেকারের পেছন পেছন রওনা দিলাম। বাচ্চাদের স্ফূর্তি ও উত্তেজনার মধ্যে আমিও রীতিমত রোমাঞ্চ অনুভব করতে লাগলাম। যাক এতদিন পরে নিয়োগ কর্তার দেখা পেতে যাচ্ছি আমি। আজ সমুদ্র ভীষণ শান্ত। গতকালও সমুদ্র ছিল উত্তাল, উন্মত্ত। কূলের অদূরে তাঁর নৌকা দেখতে পেলাম আমরা। নৌকা থেকে বেরিয়ে এলেন দীর্ঘদেহী সৌম্যকান্তি এক সুপুরুষ। পরম আগ্রহ ভরে তাঁর প্রতি দৃষ্টি মেলে ধরলাম। আমার সেই প্রেমিক কবির সঙ্গে তুলনা করতে চাইলাম তাঁকে। কিন্তু কবির মুখখানা কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। তিনি এমন দৃপ্ত পদভারে নৌকা থেকে নেমে এলেন যে, আমার মনে হলো নাচের তালের সঙ্গে পা ফেলছেন। নিজের পরিচয় দিয়ে স্পষ্ট ফরাসী উচ্চারণে বললেন, 'আমারই নাম শেনদুঁ। অবশেষে আপনার সাথে সাক্ষাৎ ঘটায় আমি আনন্দিত, আশা করি এখানে ভাল লাগছে আপনার। শীতকালটা আর বেশি দিন নেই– তারপরেই তো ঝরঝরে প্রসন্ন দিন, কী বলেন?'

আমি মুখে মৃদু হাসি নিয়ে তার দিকে তাকালাম। হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বললাম, 'আমার মাতৃভাষায় কথা বলার জন্যে ধন্যবাদ।'

'আপনার যখন খুশি আমার সঙ্গে ফ্রেঞ্চ বলবেন। তা বলে আবার ইংরেজিটা ভুলে যাবেন না যেন। ইংরেজির ওপর কী একটা কোর্স যেন করছিলেন?'

'বাদ দিন কোর্স ফোর্স। আপনি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে সংস্কৃতিতেও কথা বলতে পারেন। আমার কী মনে হয় জানেন? আপনি যে ভাষাতেই কথা বলেন না কেন, আমি ঠিক তা বুঝতে পারব।' এরপর আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কতদিন থাকবেন এখানে?' একথা বলেই লক্ষ করলাম তাঁর মুখ মুহূর্তেই কালো হয়ে উঠেছে। বুঝলাম মস্তবড় ভুল করে ফেলেছি।

তিনি ধীরেসুস্থে বললেন, 'কতদিন থাকব চট করে বলতে পারছি না। নানান অবস্থার ওপর নির্ভর করবে কতদিন থাকতে পারব না পারব।'

শেনদুঁর আগমনে আমার জীবন ধারাই পাল্টে গেল। বাচ্চারা এখন খুব একটা আমার ধারে কাছে ঘেঁষে না। খাওয়া দাওয়াটাও সেরে নেয় রান্নাঘরে বসে স্টুয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে। শেনদুঁর নজর অবশ্য চারদিকে। আমি যাতে নিঃসঙ্গ বোধ না করি এ জন্যে তিনি কড়া দৃষ্টি রাখেন। তাঁর সঙ্গে বসে ডিনার বা লাঞ্চ করার জন্যে সর্বদা পীড়াপীড়ি করেন। আমার ভারী লজ্জা লাগে। ছেলেমেয়েরা বেশ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে ইদানীং। আগের মত আমার যত্নআত্তির তেমন

প্রয়োজন হয় না তাদের। আমার ভীষণ খারাপ লাগে। দেখভাল করবার জন্যে এত পয়সা খরচ করে আমাকে রাখা হয়েছে অথচ কাজকর্ম কিছুই করতে হচ্ছে না। এসব কথা তুললে শেনদুঁ হেসে উড়িয়ে দেন। বলেন, 'এসব ছোটখাট বিষয় রাখুন তো, করবার মত ঢের জরুরী কাজ রয়েছে।' এরপর আমার কোনও ওজর আপত্তি ধোপে টেকে না অথচ তাঁর কোনও জরুরী কাজের দায়িত্বও আমার কাঁধে ন্যস্ত করা হয় না।

এখন তো আমার সবকিছুই বদলে গেছে। আহারের তালিকাটি পর্যন্ত। আমার সুবিধার জন্যে যে হালকা খাবার আর আইরিশ স্টুর বন্দোবস্ত ছিল এখন আর তা নেই। গৃহকর্তা যা যা খান আমাকেও তাই পরিবেশন করা হয়। এখন বসন্ত কাল। শীতের কাঁপন নেই—বাতাসে উষ্ণতা। বনে বনে ফুল, গাছে গাছে পাখি। শেনদুঁ প্রায়ই আমাকে দূরের পাইন বনে বেড়াতে নিয়ে যান। পরম আদরে আমার হাত ধরে হেঁটে বেড়ান। সঙ্গী হিসেবে তিনি ভারী চমৎকার। মানুষটিও খুব দিল খোলা। পৌরুষের দীপ্তিতে ঝলমল করে তাঁর দীর্ঘকায় কাঠামো। নিজের কথা বলেন কম, আমার কথা শোনেন বেশি। এসব দেখে শুনে ভয় হলো অচিরেই আমি আমার চাকুরিদাতার সঙ্গে প্রেমে পড়বার বিপদ ডেকে আনছি।

ডিনার সেরে শেনদুঁ তাঁর নিজের ঘরে চলে যান কাজ করতে। কী কাজ করেন তা অবশ্য কখনও আমাকে বলেননি। আমি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করতেই টের পাই কেয়ারটেকার আমার দরজায় তালা লাগিয়ে দিচ্ছে। একদিন শেনদুঁকে বললাম, 'কেয়ারটেকার ব্যাটার কাণ্ড দেখেছেন? রোজ রোজ আমাকে তালা মেরে রাখে। ওর কি ধারণা দস্যুরা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে?'

তিনি হেসে বললেন, 'কে জানে, হতেও পারে! মোট কথা আমরা আপনাকে হারাতে চাইনে। আপনার কাছে এটা অতিরিক্ত সতর্কতা বলে মনে হতে পারে কিন্তু আমাদের দেশে এটাই রীতি। আপনি তালাবদ্ধ ঘরে সম্পূর্ণ নিরাপদে আছেন এটা নিশ্চিত হয়ে আমি শুতে যাই।'

আমার জন্যে তাঁর এই উৎকণ্ঠা মুগ্ধ করে আমাকে। লোকটার কী দরদ আমার জন্যে! যতই দিন যায় আমি তত বেশি বেশি শেনদুঁর সঙ্গ সুধা লাভ করতে থাকি। আমি এখন সত্যিই সুখী– এখন আর কোনও দুঃখ নেই আমার!

মে মাসের মাঝামাঝি নাগাদ তিনি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। সে সঙ্গে একটা দুঃখের কথাও শোনালেন। বললেন, 'পরিতাপের বিষয় এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, লক্ষ্মীটি। আরও বছর খানেক তোমাকে এই দ্বীপ দেশে থাকতে হবে। পারবে তো একা থাকতে?'

আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমি খুব কান্নাকাটি করলাম কিন্তু প্রত্যাখ্যান ছিল অনিবার্য। তিনি বললেন, 'আগামী বছর আবার দেখা হবে। সবকিছু নির্ভর করছে তোমার ওপর। আমি তোমাকে বিয়ে করব আর তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। খুব ভাল করে ভেবে দেখো কী করবে। স্বাধীনভাবে ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নাও, আবেগ দ্বারা পরিচালিত হলে কিন্তু চলবে না। অন্যথায় আমি দ্বীপ ছেড়ে যাবার পর তুমি বছরের বাকি সময়টা আমার সঙ্গে কাটাতে পারবে বটে কিন্তু ইউরোপের প্রান্তসীমায় পৌছা মাত্র আমরা বিচ্ছিন্ন হব, আর কোনওদিন

দেখা হবে না আমাদের। এখন বলো কোনটা করবে তুমি।'

কয়েকদিন পর হীরার আংটি আঙুলে পরিয়ে তিনি বিয়ে করলেন আমাকে। বিয়ের অনুষ্ঠানে জাঁকজমকের অন্ত ছিল না। উৎসবের আমেজ চলল দীর্ঘদিন। ছেলেমেয়েরা আমোদ আহ্লাদ করতে করতে শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বিয়ের কারণে আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কোনও পরিবর্তন এল না। শেনদুঁ সাহেব রাতে কাজ কর্ম শেষ না করা পর্যন্ত আমাকে ঘুমাতে যেতে বারণ করতেন। এ ব্যাপারে আমি কোনও কথা বললে তিনি বলতেন, 'লক্ষ্মীটি, কাজ শেষ না করে কি আসা যায়?'

সুখের সীমা ছিল না আমার। আরাম আয়েশে কাটছিল জীবন। চিন্তা নেই ভাবনা নেই, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নেই। বালিশে মাথা ঠেকানো মাত্র গভীর নিদ্রা। কখন তিনি আমার কাছে আসেন কখন চলে যান মনেই করতে পারি না। আমাদের মধ্যে অল্পই কথা হয়। তিনি আসেন, আমাকে ভালবাসা দেন। আমরা প্রেমের খেলায় মত্ত হই, তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি। তিনি বলেন দিন আর রাত্রি নাকি তাঁর কাছে সমান। আমাদের 'মধুচন্দ্রিমা' চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। এক সময় আমার মাথা ঘোরা বমি বমি পাওয়া আর টক জিনিস খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে কিন্তু হানিমুন যেন শেষ হতে চায় না। আমার বাচ্চা হবে জেনে উল্লাস আনন্দে ফেটে পড়েন আমার স্বামী। এত আনন্দের মধ্যেও তিনি আমাকে বিদায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভুল করেন না। কী নিষ্ঠুর এই পুরুষ জাতি! ভীষণ বেদনায় কাতর হয়ে পড়ি আমি। আমার এই করুণ অবস্থা দেখে তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'লক্ষ্মী সোনা আমার, এত ভাবনা কী? আমি তোমাকে ভালবাসি না? তোমার জন্যে খারাপ লাগে না আমার? কাল কিন্তু তুমি নিজে গিয়ে আমাকে বোটে তুলে দিয়ে আসবে।'

'কবে ফিরবে?'

'যখন বাগানে জংকুইল ফুটবে।'

'সে তো ফোটে বসন্তে। বসন্ত আসতে এখনও কত্তো দেরি। বাচ্চা হওয়ার সময় তুমি তা হলে থাকছ না?'

তিনি হেসে বললেন, 'এগারো মাসের মাথায় ঠিক ফিরে আসব আমি।'

আমার মন এত খারাপ ছিল যে আর কিছুই বলতে পারলাম না। ফ্রান্সে তো বাচ্চা হতে এত বেশি সময় লাগে না।

গাড়ি বোঝাই করে বাচ্চারা তাদের বাবাকে তুলে দিতে গেল। একপাল বাচ্চাকাচ্চার মধ্যেই তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। গভীর ভালবাসার দৃষ্টি মেলে ধরলেন আমার চোখে। আবার মনে করিয়ে দিলেন রাতে শোবার আগে যেন ঘরে তালা লাগিয়ে দেই।

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে ঘরে ফিরে এলাম আমি। বাচ্চারাও আমার বেদনা অনুভব করতে পারছিল। ওরা আমাকে যথাসম্ভব উৎফুল্ল রাখতে চেষ্টা করল।

শেনদুঁহীন আমার নিঃসঙ্গ গ্রীষ্মকাল দ্রুত কেটে যাচ্ছিল। সামনেই আসছে দীর্ঘ শীতের মরসুম। যে শিশুটি আসছে তার জন্যে কিছু শীতের কাপড় বানাতে

ইচ্ছে হলো। একটা মেয়েকে ডেকে তার কাছে কিছু উল চাইলাম। মেয়েটা এসে জানাল কেয়ারটেকার নাকি বলেছে ছোট বাচ্চার জন্যে শীতের পোশাক বানাবার প্রয়োজন নেই কারণ ঘরে শিশুদের বিস্তর গরম কাপড় রয়েছে। আমি আর ওদের কিছু বললাম না।

বসন্তের আগমন প্রতীক্ষায় প্রহর কাটছিল আমার। সন্তান প্রসবের দিন ঘনিয়ে আসছিল বলে আমার উদরের স্ফীতি ঘটেছিল বেশ। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সম্ভাব্য একটা তারিখও অতিক্রান্ত হয়ে গেল। অথচ তাঁর আসার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। নিদারুণ উদ্বেগের মধ্যে আমার মনে হলো আইরিশ আবহাওয়ার কারণে বোধ করি সন্তানের আগমন বিলম্বিত হয়। এরই মধ্যে আরও একটা সপ্তাহ কেটে গেল কিন্তু কিছুই হলো না। একী যন্ত্রণায় পড়লাম আমি?

ভেবে ভেবে আমি যখন আকুল তখন হঠাৎ একদিন মহামান্য শেনদুঁ এসে হাজির। 'দেখলে তো, আমি আমার কথা রেখেছি অক্ষরে অক্ষরে। এখন দেখো যে বাচ্চা হতে আর দেরি হবে না।' তিনি এমন আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলছিলেন যে, আমি ভুলেই গেলাম আমার সন্তান জন্মাবার তারিখ দু'মাস আগে উৎরে গেছে। এবারও তিনি প্রতিরাতে আমাকে তালা দিয়ে নিজের ঘরে কাজ করতে লাগলেন।

একদিন রাতের বেলায় তিনি আমার ঘরে বসে গল্প করছিলেন আমার সঙ্গে। হঠাৎ আমার ঘরের জানালার ঠিক নীচে ঘোড়ার খুরের প্রচণ্ড শব্দ শুনে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। আমাকে শুধু বললেন, 'এক মিনিট। দেখে আসি কী হচ্ছে ওখানে।' আমি তাঁর জন্যে জেগে বসে রইলাম। ঘরের মোমটা পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হচ্ছিল। আমি শেনদুঁকে ডাকতে ডাকতে দরজার কাছে চলে এলাম। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যাওয়ায় আমার স্বামী দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছেন। হাট করে খোলা দরজাটা দেখে আমার মনে পড়ল শেনদুঁর বহুবার উচ্চারিত সতর্কবাণী, 'দরজায় তালা মারা আছে কিনা নিশ্চিত না হয়ে শোবে না। ভুলেও রাতে কখনও বাইরে বেরুবে না।' ওই মুহূর্তে তাঁর এই সাবধানবাণী আমার কাছে ভীষণ রকমের ছেলেমানুষি বলে মনে হলো। তাঁর ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেখানে আলো নেই। বিশাল হলঘরটায় একটি মাত্র বাতি অতি সামান্য আলো বিতরণ করছে। হলঘরের দরজাটাও খোলা। ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে অনুমান করলাম শেনদুঁ আস্তাবলের দিকে গেছেন। তাঁর কাছে যাওয়ার জন্যে মনটা উতলা হয়ে উঠল। কী এক দুর্নিবার আকর্ষণে আস্তাবলের দিকে পা বাড়ালাম আমি। বাতাস বইছিল ধীরে ধীরে। দূরে সমুদ্রের গর্জন অশ্বের খুরধ্বনি বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আস্তাবল থেকে ঘোড়াগুলো সব বেরিয়ে পড়ল নাকি? আমি আস্তে আস্তে আস্তাবলের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। সেখানে রাতের গভীর নৈশব্দ। ওখানে কোনও ঘোড়া দেখতে পেলাম না আমি। আধো আলো আধো অন্ধকারে আমার দৃষ্টি এসে স্থির হলো এক অবিশ্বাস্য অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর দৃশ্যে। আস্তাবলের ছাদের নীচে দেয়ালে টাঙানো বেশ কয়েকটি ঘোড়ার জীবন্ত মস্তক। বিশাল চোখগুলো স্থির দৃষ্টি মেলে আছে আমারই দিকে। সে দৃষ্টিতে ভীষণ উদ্বেগ, ভীষণ উৎকণ্ঠা। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না যখন দেখলাম ঘোড়ার মাথার নীচে যে শরীর তা শেনদুঁর বাচ্চাদের। ওদের পরনের পোশাকগুলোও শেনদুঁর

ছেলেমেয়েদেরই। হায় ঈশ্বর এতে আর সন্দেহ কী যে ওরা শেনদুঁর সন্তান! ঠাণ্ডা মাথায় গুণে দেখলাম শেনদুঁর সন্তানের সংখ্যা যত, ওখানে ঘোড়ার মাথাও ততগুলো। ঘরের একেবারে কোণায় রাখা তেজী একটি পুরুষ ঘোড়ার মাথা। স্ত্রী ঘোড়ার সঙ্গে যৌন মিলনে এই ধরনের অশ্বই ব্যবহৃত হয়। ওই ঘোড়াটি প্রবল হতাশা ও বিরক্তি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, কারও জন্যে সে প্রতীক্ষা করছে। তবে কি সে একজন অশ্বমানবীর অপেক্ষায় বসে আছে? আর যে ভাবতে পারছি না! অচিরেই জ্ঞান হারালাম আমি। তারপর আর কোনও দিন শেনদুঁর সঙ্গে দেখা হয়নি আমার। রাতের সেই ঘটনার পর আমি নিজেকে আবিষ্কার করি পারীর এক অভিজাত ক্লিনিকে। জানতে পারি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে আমার স্মৃতি লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এখন আস্তে আস্তে সেরে উঠছি আমি। কোনও কোনও সময় অতীতের সেই স্মৃতি স্মরণে আনতে পারি কিন্তু ফ্যাণ্টাসি ও বাস্তবতাকে আলাদা করতে পারি না, গুলিয়ে ফেলি।

শারীরিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠছিলাম। ভাবনা হচ্ছিল এই দামী ক্লিনিকের খরচ যোগাব কোত্থেকে? একজন নার্সের কাছে ব্যাপারটা বলতে সে জানাল, 'ওমা, আপনি এসব নিয়ে চিন্তা করছেন কেন? আপনাকে যিনি ক্লিনিকে নিয়ে এসেছেন তিনিই তো সব খরচ দিয়েছেন। ক্লিনিকের যাবতীয় ব্যয় আগাম পরিশোধ করা আছে। ও, ভাল কথা, সেই ভদ্রলোক আপনার জন্যে একটা প্যাকেট রেখে গেছেন।' একথা বলে নার্সটি একটি ছোট্ট প্যাকেট নিয়ে এল। খুলে দেখি আমাদের বিয়ের সেই হীরার আংটিটা। প্রবল রোমাঞ্চে আমি আংটিটি আঙুলে পরে ফেলি। প্যাকেটের ভেতরে একটা ব্যাংক ড্রাফট ও ছোট্ট একটা চিঠি। তাতে লেখা, 'বিশ্বাস করো, লক্ষ্মীটি, আমি ভীষণ দুঃখিত—শেনদুঁ।' মনে হলো চিঠি নয়, কোনও কবরে উৎকীর্ণ এপিটাফ পাঠ করছি আমি। আচ্ছন্নের মত নার্সকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই ভদ্রলোক এখন কোথায়! কোনও ঠিকানা দিয়ে যাননি?'

'না, তিনি কোনও ঠিকানা রেখে যাননি। যেই শুনলেন আপনি বিপদমুক্ত সেই থেকে তিনি আসা বন্ধ করলেন। তার আগে অবশ্য রোজই আসতেন।'

ক্লিনিকে শুয়েবসে খেয়েদেয়ে ভালই কাটছিল আমার। একদিন নার্সকে ফাঁক পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, আমার কোনও বাচ্চা হয়েছিল?' বিস্ময় ভরা চোখে নার্স আমার দিকে তাকাল। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম সে ভাবছে আমার মধ্যেকার সাবেক অসুস্থতা আবার ফিরে আসছে। নার্স কোনও কথা বলল না। আমিও আর তাকে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না।

দ্রুত সেরে উঠছিলাম। পূর্ণ বিশ্রামে থাকার কারণে আমার স্বাস্থ্য সুন্দর হয়ে উঠেছিল। সারা দেহে ঢলঢল লাবণ্য। কয়েক দিন পরেই ক্লিনিক থেকে ছাড়া পেলাম।

কিন্তু কী মর্মান্তিক ব্যাপার, পারীর রাজপথে আমার সেই পুরনো প্রেমিকের সাথে দেখা হয়ে গেল। আমার সেই সাধের প্রেমিক কবি—আমার সাবেক বিষফোঁড়া। আমার সুন্দর স্বাস্থ্য, বর্ণাঢ্য প্রসাধন ও দামী পোশাক দেখে বিস্ময়ের সীমা রইল না তার। আমার সামনে তাকে বড়ই দীনহীন, দরিদ্র ও ম্রিয়মান

লাগছিল। তার মধ্যেকার হামবড়া ভাবটি আগের মতই বজায় ছিল। আমাকে দেখে বলল, 'তুমি তো চলে গিয়েই খালাস, আর দেখো তুমিহীন আমার কী করুণ অবস্থা।' তার এই বাঁদরামি ছিল বড়ই হাস্যকর ও করুণ। সে পকেট থেকে দুটি এনভেলাপ বের করে আমাকে দেখিয়ে বলল, 'তোমাকে লিখেছিলাম, প্রাপক পাওয়া যায়নি বলে দু'খানাই ফেরত এসেছে।'

আমি শেনদুঁকে লেখা আমার চিঠিগুলোর কথা উল্লেখ করে বললাম, 'দেখ বেশি বক বক করবে না। আমার চিঠিগুলো কিন্তু ওই ঠিকানায় মঁশিয়ে শেনদুঁর কাছে ঠিকই পৌঁচেছে। ওটিই সঠিক ঠিকানা।'

'বাহ্, বাহ্, চমৎকার ভুয়া একটা নাম বাগিয়েছ তোমার চাকুরিদাতার জন্যে। আমি জানি ওই ভৌতিক রেসের ঘোড়াটাই তোমাকে এই নাম আবিষ্কারে উৎসাহিত করেছে।'

'ভৌতিক ঘোড়া? কী যা তা বলছ। এমন ঘোড়ার নাম আমি জীবনেও শুনিনি।'

আমার সাবেক বিষফোঁড়া বকবক করেই যাচ্ছিল কিন্তু তার কোনও কথাই আমার কানে ঢুকছিল না।

আমি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে এসে গভীরভাবে ঘোড়ার বিষয়টি ভাবতে লাগলাম। পত্রিকা খুলে রেসের খবরের পাতায় চোখ রাখতেই দেখলাম গত কয়েক দিন ধরে রেসের ময়দানে শেনদুঁ নামে একটি ঘোড়া অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। কেউ তার ধারে কাছে ভিড়তে পারছে না।

ব্যাংক থেকে সব টাকা তুলে নিয়ে রেসের মাঠে গেলাম আমি। যাবার সময় সঙ্গে কিছু চিনির টুকরো নিয়ে নিলাম। মনে মনে ভাবলাম আজ বড্ড ছেলেমানুষিতে পেয়ে বসেছে আমাকে। মাঠে পৌঁছে রুদ্ধশ্বাসে ঘোড়ার নম্বর ও জকির রঙের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলাম। নম্বরের দিকে না তাকিয়েই শেনদুঁকে চিনতে পারলাম আমি। তার মাথা ও চোখ জোড়া মুহূর্তের মধ্যে আমাকে আমার হারিয়ে যাওয়া স্বামীর কথা স্মরণ করিয়ে দিল। ক্ষণকালের জন্যে এমন আবেগ বিহ্বল হয়ে পড়লাম যে, মনে হলো দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। ঘোড়াটি ভীষণ লম্ফঝম্ফ করছিল আর তার মুখ থেকে ফেনা গড়িয়ে পড়ছিল। বিস্ময়ের ঘোরে চৈতন্য হারাবার উপক্রম হলো আমার। যে ছেলেটা ঘোড়াটিকে নিয়ে যাচ্ছিল সে বিড়বিড় করে বলল, 'শেনদুঁর ব্যাপার বোঝা ভার। সারা শীতে সে দৌড়েছে খচ্চরের মত এখন দৌড়াচ্ছে আগুনের ফুলকির মত।' ঘোড়াটি আমার কাছে আসতে লাফালাফি থামিয়ে শান্ত হলো। মাঠের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। ঘোড়াটি আমার কাছে দাঁড়িয়ে শান্ত চোখ তুলে তাকাল। লজ্জাবনত আমি ধীরে ধীরে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। ব্যাগ থেকে একটুকরো চিনি বের করতে গেলে ছেলেটি বাধা দিয়ে বলল, 'কিছু খেতে দেবেন না ওকে। এখন খাওয়ানো মানা।' ও ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল আর আমি অন্ধের মত তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। এসব দেখে ছেলেটা বলল, 'মাদাম দেখছি ঘোড়া চেনেন। ভারি অদ্ভুত এই ঘোড়াটি। মনে ধরলে সে মাঝে মাঝে সুন্দরী মেয়েদের প্রেমে পড়ে এবং রেসের সময় তার সেই ভালবাসার পাত্রীর কথা মনে করে

প্রাণপণ দৌড়ায়। তখন অন্য কোনও ঘোড়া ওকে হারাতে পারে না। এ রকমই দেখে আসছি।'

নিজের হৃদপিণ্ডের কম্পনের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম আমি। কেবলই শেনদুঁর মাতৃহীন ছেলেমেয়েগুলোর কথা ভাবছিলাম। আহারে বাছারা! নিজেকে প্রশ্ন করলাম আমি, তোমার আগে আর কয়টি মেয়ে ওদের মায়ের আদর দিয়েছে—দেখাশোনা করেছে? পরক্ষণেই ভাবলাম এসব নিয়ে মাথা ঘামানো বোকামি ছাড়া কিছু নয়।

শেনদুঁর জন্যে আমার যথাসর্বস্ব বাজি রাখলাম। চমৎকার দ্রুতগতিতে দৌড়ে সবার আগে গেল সে। আমি তার আগমন প্রতীক্ষায় প্যাডককে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখলাম খানিকটা ঘেমেছে সে। মাথা উঁচু করে বলিষ্ঠ পায়ে এগিয়ে আসছে। কিন্তু হায়, আমাকে তাকিয়ে দেখবার কোনও লক্ষণই তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা গেল না।

রেসের মাঠের এই ঘটনার পর আমার স্মৃতি থেকে সব কিছু ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। আমিও ওসব আর মনে করতে চাইনে। নিজের মনের সাথে আর কোনও দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ না হয়েই আমি বুঝতে পেরেছি এসবের কার্যকরণ অনুসন্ধানের চেষ্টা নিতান্তই বাতুলতা। যে ঘোড়াটি রেস জিতে আমাকে মস্ত বড়লোক বানিয়ে দিয়েছে তার মুখচ্ছবি কল্পনা করে তার সঙ্গে অন্য কাউকে জড়িয়ে এখন কী লাভ? বাজি ধরেছিলাম, বাজি জিতেছি, ব্যস আর কিছু নয়...

মূলঃ আন কাম্পিয়ঁ
রূপান্তরঃ দিলওয়ার হাসান

ইরানী জিন

নামাজ পড়ে মসজিদের বারান্দায় এসে বসেছেন হাফেজ হুজুর। তাঁর চার পাশ ঘিরে বসে আছে ভক্ত আর গ্রামবাসীরা। আলাপ চলছিল দেশের অবস্থা, দশের অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে। রোজই এই সময় হুজুর এসে বসেন এখানে, লোকজন আসে, উপদেশ শোনে, কখনও নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা বলে। হুজুর কাউকে নিরাশ করেন না। প্রার্থনা করে কেউ খালি হাতে ফেরে না তাঁর কাছ থেকে। জ্ঞানী-গুণী লোক, জমিদারের ছেলে জমিদার। দিলটাও তেমনি দরাজ।

সেদিনও বসে আছেন হুজুর সবাইকে নিয়ে। আলাপ-আলোচনা চলছিল। একসময় হুজুর তাকালেন বাইরের দিকে—তাকিয়েই রইলেন সেদিকে। ওদিকে গাছ-পালা আর ঝোপজঙ্গলের মাঝখান দিয়ে একটা সরু পায়ে চলা রাস্তা চলে গেছে। একজন জিজ্ঞাসা করল, 'হুজুর, কী দেখছেন অমন করে?'

হুজুর সেদিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিলেন, 'জিনদের বরযাত্রী যাচ্ছে।'

সবাই ঘুরে তাকাল সেদিকে—কিছুই দেখা গেল না। একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কই হুজুর, আমরা তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

হুজুর মুচকি হাসলেন একটু, বললেন, 'সবাইকে ওরা দেখা দিতে চায়ও না।' তারপর লোকজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা দাঁড়াও, তোমাদের বিয়ের মিষ্টি খাওয়াতে পারি কিনা দেখি।' আস্তে করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, ডান হাতটা একটু উঁচু করে নাড়ালেন, বিড় বিড় করে কী বললেন, ঠোঁট নড়ল, কথা বোঝা গেল না। আবার আস্তে করে এসে বসলেন আগের জায়গায়। একটু পরে একজনকে বললেন, 'যাও, ওখানে ওই রাস্তার কাছে গিয়ে দেখো কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

লোকটা উঠে মসজিদের বারান্দা থেকে নেমে চলে গেল সেদিকে। দূরে গাছ-পালার আড়াল থেকে যখন বেরিয়ে আসছে লোকটা, দেখা গেল তার হাতে একটা সবুজ কাগজে মোড়া বড় ঝুড়ি। লোকটা বলে, 'রাস্তার ওপরেই রাখা ছিল, কী সুন্দর ঘ্রাণ বেরুচ্ছে!'

হুজুর তখনি ঝুড়ি খুলে মিষ্টিগুলো ভাগ করে দিলেন সবাইকে। এমন অদ্ভুত সুন্দর স্বাদের মিষ্টি আগে কেউ কখনও খায়নি।

হুজুরদের বাড়িটা ছিল তিন একর জমির ওপরে। বাড়ি নয়, বিরাট এক প্রাসাদ। তাঁর দাদার আমলের দেড়তলা বাড়ি। এক মানুষ উঁচু খিলানের ওপর তৈরি। সতেরোটা কামরা তাতে। চারদিকে তিন মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভিতরের উঠানে নানা ধরনের গাছ। বাড়ির উত্তর পূর্ব কোণে ছিল একটি লেবু আর করমচা গাছ। এসব গাছ বোধহয় বেশিদিন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। এ গাছ দুটোও মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এক বিরাট এলাকা জুড়ে ডাল-পালা ছড়িয়ে রেখেছিল। গাছগুলোর নীচের দিক ছিল তকতকে পরিষ্কার।

জ্যোৎস্না রাতে চারদিক যখন নিঝুম হয়ে আসত, তখন দেখা যেত চাঁদের আলোয় করমচা তলায় দাঁড়িয়ে সাদা ঢিলে-ঢালা পোশাক পরা একজন পুরুষ আর একটা মেয়ে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ফারসীতে। এঁরা আছেন এখানে বহুদিন ধরে, হুজুরের দাদার আমল থেকে। হুজুরের দাদা পালতেন এঁনাদের, নিয়ে এসেছিলেন সুদূর ইরান থেকে। হুজুরের দাদী হাজি ছিলেন। অত্যন্ত পরহেজগার আর ধার্মিক ছিলেন তিনি। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সমস্ত ঘর-দোর ধোয়াতেন। তারপর আগর বাতি জ্বেলে রাখতেন সারা বাড়িতে। রাত জেগে কোরআন তেলাওয়াত আর জিকির-আসকারে কাটাতেন। গ্রামের মাঝখানে বড় একটা পাকা মসজিদ বানিয়ে দিয়েছিলেন। মসজিদের পাশে একটা শান বাঁধানো পুকুরও খুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। লোকে বলত, হুজুরদের আয় উন্নতি সব জিনদের কারণেই।

এ সব অনেকদিন আগের কথা। হাফেজ হুজুরের ছেলে হাবিবউল্লাহ্ বাপের মতই আরবী-ফারসীতে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শুধু জমিদারি দেখাশোনা করতেন, অন্য কোনও কাজ-কাম করতেন না। যুগের পরিবর্তনের সাথে মানুষের মত পালটায়। হাবিবউল্লাহ্ নিজের ছেলে-মেয়েদের আরবী-ফারসী না পড়িয়ে ইংরাজি স্কুলে ভর্তি করালেন। ছেলে-মেয়েরা প্যাণ্ট-স্কার্ট-টাই পরে স্কুলে যায়। বাড়িতে মেম সাহেব মাস্টারনী রাখা হলো। বাড়ির পরিবেশ গেল পাল্টে। যখন-তখন বাড়িতে গ্রামোফোনে বাজত ইংরেজি গান আর ইংরেজি গানের সুর। ছেলেমেয়েদের বন্ধুরা আসত। মাস্টাররা আসত, তাদের বন্ধুরা আসত। বাড়িতে মাঝে মাঝে পার্টি হত। অনেক রাত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া আর হৈ-হুল্লোড় চলত সেদিন। হাবিবউল্লাহ্‌র একমাত্র কন্যা মনুজান সেজেগুজে পার্টিতে আসত, কি যেন একটা ছোট্ট প্রজাপতি—ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। বন্ধু মাস্টাররা হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। প্রশংসা করত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা মনুজান ছাদে দাঁড়িয়ে ছিল একা। নামার সময় দেখল কে একজন সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে পিছন ফিরে। সাদা ধবধবে কাপড় পরনে, পাতলা ফিনফিনে কাপড়ের ওড়না মাথায়—বাতাসে উড়ছে। মনু প্রথমে ভেবেছিল বাড়ির ঝি-চাকরানীদের কেউ হবে, কিন্তু চাকরদের কাপড় কি অত ফর্সা আর সাদা হয়? তা ছাড়া, কাপড় পরার ধরনটাও অন্যরকম। মনু ডাক দিল, 'কে ওখানে?'

আস্তে করে ঘুরে দাঁড়াল মহিলাটি। সাদা রসুনের খোসার মত মুখের রং, কালো সুরমা টানা বড় বড় চোখ, রক্ত জবার মত টকটকে লাল। চোখ দু'টি মানুষের চোখের মত নয়, উপরে-নীচে খাড়াভাবে চেরা। দেখা মাত্র মনু ভয়ে চিৎকার করে পড়ে গেল সেইখানেই। চিৎকার শুনে দাসী-বাঁদীরা ছুটে এল। মনুর মা—নবীজান বিবি ছুটে এলেন। ধরাধরি করে শুইয়ে দেয়া হলো খাটের ওপর। গোলাপ পানির ঝাপটা আর পাখার বাতাস চলতে থাকল। নবীজান পড়া পানি দিলেন মেয়ের মুখে। অনেকক্ষণ পর মেয়ে চোখ খুলে তাকাল, চোখ দু'টি রক্তের মত লাল। রাতে প্রচণ্ড জ্বর এল—ঘুমাতে পারে না, খালি চমকে ওঠে বার বার। নবীজান বিবি এতে ভয় পেলেন খুব। হাবিবউল্লাহ্ বাড়ি ছিলেন না, জমিদারির

কাজে অন্যত্র গিয়েছিলেন। নবীজান বিবি বড় ছেলে কাদের বক্সকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর স্বামীকে খবর দিতে।

নৌকার পথ। যেতে দু'দিন, আসতে দু'দিন। কাদের বক্সকে আসতে দেখে হাবিবউল্লাহ্ খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। ছেলের মুখে সবিশেষ শুনে তিনি বজরা ছাড়বার হুকুম দিলেন মাঝিকে। বাপে-পুতে রওনা হয়ে গেলেন তখনই।

রাতের বেলা। বজরা চলছে ভরা নদী দিয়ে। নিজের কুঠরিতে শুয়ে আছেন কাদের বক্স। পাশের কুঠরিতে আছেন হাবিবউল্লাহ্। শুয়ে শুয়ে কাদের বক্স শুনতে পেলেন তাঁর বাপের গলার আওয়াজ। কথা চলছে ফারসীতে। আরও দু'জন লোকের গলার শব্দ শোনা যাচ্ছে—একজন খুব উত্তেজিত, অপরজন যেন তাকেই বলে কয়ে কী যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রথম লোকটা যেন কোনও কিছুই মানতে চাইছে না। অনেকক্ষণ ধরে চলল তুমুল বাক-বিতণ্ডা। একসময় যেন একটু ভাঁটা পড়ল তর্কে। কাদের বক্স ঘুমিয়ে পড়লেন একসময়।

সকালে নাস্তায় বসে হাবিবউল্লাহ্কে বেশ গম্ভীর মনে হলো। তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, রাতে কি ঘুমের কোনও রকম ব্যাঘাত হয়েছিল?'

কাদের বক্স মুখ নিচু করেই উত্তর করলেন, 'জ্বি-না।'

অনেক হেকিম-বৈদ্য-কবিরাজ এল, ঝাড়ফুঁক, পানি পড়া সবই হলো এক এক করে, কিন্তু কিছুতেই কিছু করা গেল না। পাঁচ দিনের জ্বরে মনুজান মারা গেল। সে নাকি না-পাক গায়ে করমচা গাছে হাত দিয়েছিল। মেয়ের শোকে নবীজান বিবি পাথর হয়ে গেলেন। আহার নিদ্রা সমস্তই ত্যাগ করলেন তিনি। মেয়ের যেদিন চল্লিশা সেইদিন নবীজান বিবিও দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন মেয়ের কাছে।

শোক বিহ্বল হাবিবউল্লাহ্ দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন শহরে। বাড়িটা অনেকদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল, তারপর এক ধনী ব্যবসায়ী সেটা কিনে নেন। হাবিবউল্লাহ্ বা তাঁর ছেলেরা আর কোনও দিন গ্রামে ফিরে যাননি। কাদের বক্স বলেন, 'বৃদ্ধ বয়সেই হাবিবউল্লাহ্ মারা যান। মারা যাওয়ার আগের রাতে তিনি সারারাত কার সাথে যেন ঝগড়া করেছিলেন ফারসীতে।'

বাড়ি কিনে ধনী ব্যবসায়ীটি সেখানে সপরিবারে বসবাস করতে আসেন। তাঁদের বহুদিনের শখ ছিল এমন একটি বাড়িতে বাস করার। প্রথমেই তাঁরা বাড়ির ভিতরের বড় বড় গাছগুলো কেটে ফেলে সেখানে ভাল ভাল ফুলের গাছ লাগান। যে লোকটি গাছগুলো কেটেছিল, করমচা গাছটি কাটার পর তার রক্তবমি শুরু হয়—কয়েক ঘণ্টা পরেই সে মারা যায়।

করমচা গাছটি যেখানে ছিল সেখানে লাগানো হয়েছিল একটি যুঁইফুলের গাছ। গাছটি অল্পদিনের মধ্যেই অন্য সব গাছকে ছাড়িয়ে বেড়ে উঠেছিল পাঁচিলের ওপর, আর চারপাশেও ডালপালা বিস্তার করে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল। গ্রীষ্ম-বর্ষায় ফুলে ফুলে ভরে উঠত গাছটি। ফুলের গন্ধে পুরো বাড়ি ম ম করত। একদিন সাহেবের হুকুম মত মালী ফুল গাছের নীচের দিকের কিছু ডাল ছেঁটে দিয়ে হালকা করে দিল। বিবি সাহেব ফুলওয়ালা ডালগুলো বেছে আনতে বললেন মালীকে। ডালগুলো নিয়ে তিনি ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখলেন যত্ন করে। দু'একটা

ছোট ডাল সহ ফুল গুঁজে নিলেন নিজের খোঁপাতে।

সন্ধ্যায় বিবি সাহেব দাঁড়িয়ে ছিলেন বারান্দায়। বাইরে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। দমকা বাতাস বইছিল মাঝে মাঝে। বাতাসের ঝাপটায় যুঁইফুলের গাছটি দুলে উঠছিল বার বার। উপরের ডালপালাগুলো এসে বাড়ি খাচ্ছিল জানালার শার্সিতে। আনমনা হয়ে সেই দিকেই তাকিয়ে ছিলেন তিনি। গাছের পাতা আর বৃষ্টির পানিতে জানালার শার্সিটা একাকার হয়ে আছে—হঠাৎ তাতে ফুটে উঠল একটা সুন্দরী মেয়ের মুখ—ক্রমে ক্রমে পুরো অবয়ব। জানালার বাইরে যুঁই গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, ফর্সা-জ্যোৎস্নার মত মুখ, কাজল কালো ভুরু, কিন্তু রক্ত লাল চোখে তাকিয়ে আছে তাঁরই দিকে—চোখের কোনাগুলো উপরে-নীচে খাড়া করা; ভয় পেয়ে ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকলেন তিনি, দেখলেন—অপর দিকের জানালাতেও সেই একই মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে চোখ লাল করে। চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর জ্ঞান আর কখনও ফেরেনি। তৃতীয় দিনে মারা গিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। ওঁর স্বামী বাড়িটি এক কলেজের কাছে বিক্রি করে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

কলেজ কর্তৃপক্ষ বাড়িটিকে হোস্টেল বানিয়েছিলেন। বিকালবেলা হোস্টেলের ছেলেরা ছাদে উঠত, বেড়াত, গল্প করত। একদিন তিনটি ছেলে কারনিস থেকে পা পিছলে পড়ল নীচে। কেউ বাঁচল না। একজন অল্পক্ষণ বেঁচেছিল, সে বলেছিল—তাকে একজন পিছন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। কোনও ছেলে নয়, একটা লোক। মাথায় সাদা পাগড়ী, খাড়া খাড়া লাল চোখ! এদের তিনজনেরই ঘাড় ভেঙে গিয়েছিল—অন্য কোনও অঙ্গ নয়। কীভাবে সেটা সম্ভব, ডাক্তাররা বুঝতে পারেননি। বলেছিলেন, সত্যি ঘটনা অনেক সময় ভূতুড়ে কাণ্ডকেও হার মানায়! প্রত্যক্ষদর্শী কিছু ছেলে বলেছিল, ওরা তিনজনেই ওখানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে গিয়ে পড়ে যায়।

কর্তৃপক্ষের আদেশে ছাদের চারদিকে মজবুত দেওয়াল তুলে দেয়া হলো—ভবিষ্যতে যেন এমন দুর্ঘটনা আর না ঘটে।

শতদল চৌধুরী

মধ্যরাতের খাবার

ক্রি রি রিং! টেলিফোনের শব্দে চমকে উঠল নীতু। একা বাড়িতে ও। একটা ভূতের গল্প পড়ছিল। বাবা মা সিনেমা দেখতে গেছেন। রাত বারোটার আগে ফিরবেন না। ফোন বেজেই চলেছে। ধরছে না নীতু। জানে বাবা মা'র ফোন নয়। প্রয়োজন হলে নীতুর মোবাইলে তাঁরা ফোন করতেন। আজে বাজে কারও ফোন নয়তো? ইদানীং একটা ছেলে খুব জ্বালাচ্ছে চতুর্দশী নীতুকে। যখন তখন মোবাইলে ফোন করে বলে বেশিরভাগ সময় সেল ফোন বন্ধ রাখে নীতু। তার পক্ষে নীতুদের বাড়ির নাম্বার জোগাড় করা কঠিন কিছু নয়। ধরবে না ধরবে না করেও রিসিভার তুলে নিল ও। ঝন্ ঝন্ শব্দটা চাপ সৃষ্টি করছে নার্ভে।

'হ্যালো?'

এক মহিলার কণ্ঠ। চিনতে পারল না নীতু। খুব দ্রুত কথা বলছেন। বললেন এ মুহূর্তে তার একজন বেবী-সিটার খুব দরকার। খুব জরুরী প্রয়োজনে এখুনি বাইরে যেতে হচ্ছে তাঁকে। নীতু যদি ঘণ্টা তিনেকের জন্য তার সাত মাসের বাচ্চাটাকে একটু দেখে রাখে খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করবেন তিনি।

জবাব দিতে ইতস্তত করল নীতু। স্কুলে গরমের ছুটিতে এবারই প্রথম ও বাইরে যায়নি। সময় কাটাতে প্রতিবেশী এক আন্টির ডে কেয়ার সেন্টারে বেবী সিটিং করছে। সন্দেহ নেই মহিলা ওখান থেকে জোগাড় করেছে নীতুর নাম্বার। কিন্তু সে তো দিনের বেলা কয়েক ঘণ্টার জন্য বেবী সিটিং করে। এখন বাজে রাত সাড়ে আটটা। এত রাতে যাওয়া কি ঠিক হবে?

নীতুর কণ্ঠে দ্বিধা লক্ষ করে মহিলা চট করে এমন একটা পারিশ্রমিকের প্রস্তাব দিলেন, ডে কেয়ার সেন্টারের প্রায় আধা মাসের বেতনের সমান। এবার আর দ্বিধা করল না নীতু। তা ছাড়া রাতে কখনও বেবী সিটিং করেনি ও। এর মধ্যে একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধও আছে। মহিলা নীতু রাজি হয়েছে জেনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন পনেরো মিনিটের মধ্যে নীতুদের বাসায় আসছেন ওকে তুলে নিতে। বাড়ির ঠিকানা তার জানাই আছে। ডে কেয়ার সেন্টারে নীতুর ফোন নাম্বারের সঙ্গে বাড়ির ঠিকানাও লেখা ছিল।

বাবাকে ফোন করল নীতু। মোবাইল অফ। মনে পড়ল সিনেমা হল-এ ছবি চলাকালীন মোবাইল বন্ধ রাখতে হয়। বাবা মা মেট্রো সিনেমা হল-এ হরর ছবি 'ভ্যান হেলসিং' দেখতে গেছেন। ছবিটি নাকি রমরমা চলছে। সিনেমা দেখতে ভাল্লাগে না নীতুর। সে কার্টুন ছবি দেখে আর বই পড়ে। বইয়ের মধ্যে নিজের একটা জগৎ সৃষ্টি করে নিয়েছে নীতু। বেবী সিটারের কাজটাও উপভোগ করে সে। নাদুসনুদুস গুটু গুটু বাচ্চাগুলোর সঙ্গে খেলা করে ভালই কেটে যায় সময়।

কাঁটায় কাঁটায় পোনে ন'টায় নীতুদের বাড়িতে হাজির হয়ে গেলেন মহিলা। নিজের পরিচয় দিলেন মিসেস বারলফ বলে। কেনসিংটন স্ট্রীটে থাকেন। হড়বড়

করে বললেন হঠাৎ একটি জরুরী বিজনেস ডিনারে যেতে হচ্ছে তাঁকে। তাঁর স্বামী আগেই চলে গেছেন ওখানে। ফোন করে মিসেস বারলফকে এখুনি যেতে বলেছেন। না গেলেই নয়। এতটুকু বাচ্চাকে ডিনারে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাই উপায় না দেখে নীতুকে ফোন করেছেন। নীতুর নাম শুনেছেন মিসেস ক্রিস্টির কাছে। নীতুর মনে পড়ল একটি সুপার মার্কেটে কর্মরত মিসেস ক্রিস্টি তাঁর দু'বছরের মেয়েটিকে সকাল বেলা নীতুদের ডে কেয়ার সেণ্টারে দিয়ে যান। কাজ শেষে নিয়ে যান।

কালো একটা গাড়িতে চড়ে এসেছেন মিসেস বারলফ। গাড়ি চলতে শুরু করার পর নীতুর মনে পড়ল মহিলার তড়বড়ানির চোটে সে মহিলার ফোন নাম্বার কিংবা বাড়ির ঠিকানা কোনও কিছুই বাসায় রেখে আসেনি। এমনকী তাড়াহুড়োয় মোবাইল ফোনটাও আনা হয়নি। মিসেস বারলফ আশ্বস্ত করলেন তাকে। বললেন নীতুর বাবা মা বাসায় ফেরার আগেই তাকে নিজে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। ডিনার শেষ হওয়া মাত্র নিজের বাসায় চলে আসবেন মিসেস বারলফ।

অ্যাডভেঞ্চারের লোভে বেবী সিটিংয়ের প্রস্তাবে তাৎক্ষণিকভাবে রাজি হয়ে গেলেও এখন কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে নীতুর। বারবার মনে হচ্ছে কাজটা বোধহয় ঠিক করেনি ও।

বৃষ্টি পড়ছে। শীতল হাওয়া আসছে খোলা জানালা দিয়ে। ঘুম ঘুম ভাব এসে গেল নীতুর। চটকা ভেঙে গেল মহিলার খসখসে কণ্ঠস্বরে।

'আমার বাচ্চাটাকে তোমার ভালই লাগবে,' বললেন মিসেস বারলফ। 'মাত্র সাত মাস বয়স ওর। কিন্তু এখনই মাথায় ক্ষুরধার বুদ্ধি।'

'কী নাম ওর?' জিজ্ঞেস করল নীতু। 'আপনার বাচ্চা কি জেগে আছে এখনও?'

'না। না। নিকোলাস ঘুমিয়ে পড়েছে আরও ঘণ্টাখানেক আগে।' হাসলেন মিসেস বারলফ। মহিলার ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক। ভ্যাম্পায়ারের মত লাগছে।

নীতু জানল মহিলার বাচ্চা রাত বারোটায় ঘুম থেকে জেগে ওঠে। তখন তাকে দুধ খাওয়াতে হয়।

'আপনার ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা বাজবে নাকি?' শঙ্কিত হলো নীতু।

'আমি বারোটার আগেই ফিরে আসার চেষ্টা করব,' বললেন মিসেস বারলফ। 'পার্টির ব্যাপার। বোঝোই তো। তবে ভয় নেই। আমি নিজে পৌঁছে দিয়ে আসব তোমাকে বাসায়।'

অন্ধকার রাত। বৃষ্টির কারণে রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে একটা দুটো গাড়ি স্যাৎ করে ওদের গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে মুখে হেডলাইটের জোরালো আলো ফেলে।

কনসিংটন স্ট্রীটে ঢুকল কালো গাড়ি। মহিলা ভালই ড্রাইভ করেন। মেইন রোড ধরে বেশ খানিকটা এগিয়ে বামে মোড় নিলেন তিনি। ঢুকে পড়লেন লম্বা, আঁকাবাঁকা একটা গলিতে। নীতু জায়গাটা চেনার চেষ্টা করল। ইলেকট্রিসিটি নেই। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না কিছু। হঠাৎ আরেকটা মোড় ঘুরলেন মিসেস

বারলফ। প্রকাণ্ড, পুরানো একটা বাড়ির সামনে ব্রেক কষলেন। প্রকৃতি ফর্সা করে ঝিলিক দিল বিদ্যুৎ। সোনালি আলোয় বাড়িটির পেছনে একটা মাঠ দেখতে পেল নীতু। তার পরে জঙ্গল। জঙ্গল! নিউ ইয়র্ক শহরে জঙ্গল!! এ কোথায় এসেছে নীতু। ওর গা ছমছম করে উঠল। আশপাশে কোথাও বাতি না জ্বললেও দোতলা বিশাল বাড়িটিতে আলো দেখতে পেল। নিশ্চয় জেনারেটর চলছে। বাড়ির সামনে পুরানো আমলের দুটো গ্যাস ল্যাম্প জ্বলছে। মাটিতে অদ্ভুত ছায়া ফেলছে।

বাড়িটি ধূসর রঙ করা। জানালায় হলুদ রঙ। ছাদটা ঢালু। পুরো বাড়িটিতে কেমন ভীতিকর একটা ব্যাপার আছে। নীতুর পেটের ভেতরটা শিরশির করছে। আবারও মনে হলো ভুল করে ফেলেছে ও। এখানে আসা উচিত হয়নি।

নীতুর দিকের দরজা খুলে গেল। মিসেস বারলফ দাঁড়িয়ে আছেন পাশে, চেহারায় অধৈর্য ভাব।

'নেমে এসো,' বললেন তিনি। 'এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমার স্বামী রাগ করবেন।'

মহিলার কণ্ঠে কর্তৃত্বের সুর স্পষ্ট। আমি নামতে চাই না, কথাটা বলার সাহস হলো না নীতুর। দরজা খুলে নেমে পড়ল ও। মহিলার পেছন পেছন এগোল সদর দরজার দিকে। ভারী সেগুন কাঠের দরজা। বড়, কালো একটা চাবি বের করলেন তিনি, তালায় ঢুকিয়ে মোচড় দিলেন। ক্লিক শব্দে খুলে গেল তালা।

একটা সরু হলঘরে ঢুকল নীতু। দেয়ালের কুলুঙ্গিতে মিটমিট করে জ্বলছে মোম। কালো আর লাল ব্রোকেড পেপারে মোড়া দেয়ালে ভৌতিক ছায়া ফেলেছে। মাথার উপর একটা ঝাড়বাতি জ্বেলে দিলেন মিসেস বারলফ। নীতুর শুকনো চেহারা লক্ষ করলেন।

'তোমাকে কেমন চিন্তিত দেখাচ্ছে,' হাসলেন তিনি। 'এখানে ভয়ের কিছু নেই। নিকোলাসের ঘর দোতলায়। রান্নাঘরটা বাড়ির পিছন দিকে। লাইব্রেরি আছে। সময় কাটাতে বই পড়তে পারো। তুমি বসো। আমি নিকোলাসকে একটু দেখে আসি।'

মহিলা দোতলায় উঠে গেলেন। একটু পরে নেমে এলেন। 'নিকোলাস ঘুমাচ্ছে।' জানালেন তিনি। আমার ফিরতে যদি দেরি হয়ে যায় ওকে কিন্তু খেতে দিতে ভুল কোরো না। আর হ্যাঁ, একটা কথা। ভুলেও কিন্তু ওর ঘরের জানালার পর্দা খুলবে না।'

তড়িঘড়ি চলে গেলেন মিসেস বারলফ, নীতুকে 'গুড বাই' বলারও সুযোগ দিলেন না। মোটর স্টার্ট নেয়ার শব্দ শুনল নীতু। গর্জন তুলে চলে গেল কালো গাড়ি। নীতু হঠাৎ উপলব্ধি করল এই অদ্ভুত বাড়িতে সে একা। সামনের দরজায় দ্রুত গেল ও। লাগিয়ে দিল ছিটকিনি।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল নীতু। বাচ্চার ঘরে যাবে। সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, ধুকপুক শুরু হয়ে গেল বুকে। সামনের হলঘরটা ছায়াময়, অন্ধকার। পুরো বাড়িটাকেই ওর হরর সিনেমার ভৌতিক বাড়ির মত মনে হচ্ছে।

হলঘরের শেষ মাথায় চলে এল নীতু। একটা দরজা দেখতে পেল। ভেজানো। ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল। উঁকি দিল।

লাল ডিম বাতি জ্বলছে ঘরে। লম্বা, কাঠের একটা দোলনা দেখতে পেল নীতু। নিঃশব্দে ওদিকে হেঁটে গেল ও। ঝুঁকল। ভারি সুন্দর একটি বাচ্চা শুয়ে আছে দোলনায়। মুখখানা নীতুর দিকে ফেরানো। এক মাথা ঘন কালো চুল। নীতুর আগমন টের পেয়েই কিনা কে জানে, চোখ মেলে চাইল নিকোলাস। ঝাড়া এক মিনিট তাকিয়ে রইল ওর দিকে। সম্মোহিতের মত বাচ্চাটার দিকে চেয়ে রইল নীতু। চোখ বুজল নিকোলাস। ঘুমিয়ে পড়ল আবার। মিষ্টি, নিষ্পাপ মুখে স্মিত হাসি। মিসেস বারলফের শতাব্দী প্রাচীন বাড়িটি নীতুর বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিলেও বাচ্চাটাকে তার খুবই ভাল লেগেছে।

লাইব্রেরি ঘরটা কোন্ দিকে দেখিয়ে দিয়েছেন মিসেস বারলফ। ওই ঘরে ঢুকল নীতু। ঘরটা কালো কাঠের প্যানেলিং দিয়ে তৈরি। বড় বড় পিঠ উঁচু চেয়ার আর এক জোড়া কালো চামড়ার কাউচ চোখে পড়ল নীতুর। চেয়ারের পাশে একটা বাতি। বাতি জ্বালিয়ে চেয়ারে বসল নীতু। বাতির আলোয় ঘরের অন্ধকার দূর হলো সামান্যই। তবে বই পড়া যাবে।

লাইব্রেরি ঘরে কয়েকটা কালো কাঠের আলমারি। তাতে প্রায় সবই ঢাউস সাইজের ইংরেজি বই। বাতির আলোয় দু'একটা বইয়ের নাম পড়তে পারল নীতু। ব্ল্যাক ম্যাজিক আর উইচ ক্রাফটের উপর লেখা। সঙ্গে একটা হরর বই তো আছেই। তাই ওদিকে আর নজর দিল না নীতু। নিজের আনা ভৌতিক গল্প সংকলনে মনোনিবেশ করল।

কড়-কড়-কড়াৎ! বিকট শব্দে বাজ পড়ল কোথাও। বুকের রক্ত ছলকে উঠল নীতুর। পরমুহূর্তে বিদ্যুতের আলো ঝলসে দিল ঘর। চেয়ার ছেড়ে উঠল ও। হেঁটে গেল লাল পর্দা ফেলা জানালার ধারে। ভারী পর্দা টেনে সরাল। মাঠের ধারের জঙ্গলে বাহু ছড়িয়ে নাচছে গাছের ডাল। বৃষ্টির বেগ বেড়েছে আরও। হঠাৎ কারও সঙ্গে কথা বলার খুব ইচ্ছে জাগল নীতুর—বাবা, মা, বন্ধু, কিংবা অন্য কেউ। লাইব্রেরি ঘরে টেলিফোন খুঁজল নীতু। নেই। হলঘরেও পেল না।

অকস্মাৎ আতংক ভর করল নীতুর মনে। কুডাক ডাকছে মন। এক ছুটে বসার ঘরে ঢুকল। অন্ধকার। দেয়াল হাতড়াল বাতির সুইচের জন্য। হঠাৎ কীসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেল ও। নরম কী একটা ছুটে পালিয়ে গেল। চিৎকার করে উঠল নীতু। দৌড়ে চলে এল লাইব্রেরি ঘরে। লাল চেয়ারটাতে বসে পড়ল। পা মুড়ে নিল। হাত দিয়ে ঢাকল মুখ। তারপর ফোঁপাতে শুরু করল।

তীব্র কান্নার আওয়াজে জেগে গেল নীতু। কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না। ভীত চোখে চাইল চারপাশে। এক মুহূর্তের জন্য বুঝতে পারল না কোথায় আছে। তারপর মনে পড়ে গেল সব। দোতলা থেকে ভেসে আসছে ট্যাঁ ট্যাঁ চিৎকার। লাইব্রেরি ঘরের দেয়ালে ঝোলানো গ্রাণ্ডফাদার ক্লক গম্ভীর ঢং ঢং সুরে জানান দিল বারোটা বাজে। এখন মাঝ রাত। খিদে পেয়েছে নিকোলাসের।

নীতুর অবাক লাগল ভেবে ঠিক বারোটার সময়ই কি খিদে পেয়ে যায় বাচ্চার? আর এভাবে তারস্বরে কাঁদতে থাকে? মিসেস বারলফ তো বললেন বারোটার আগেই ফিরবেন। কই এলেন না তো এখনও!

বাচ্চার কান্না তীব্রতর হলো। কানে বাড়ি খাচ্ছে দ্রিম দ্রিম। লাফ মেরে উঠে পড়ল নীতু, এক ছুটে চলে এল রান্নাঘরে। বাচ্চার কান্না প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সারা বাড়িতে।

সুইচ টিপে বাতি জ্বালল নীতু। ওর সাড়া পেয়ে একটা ইঁদুর ফ্রিজের নীচে লুকিয়ে পড়ল। মাগো, কত্তবড় ইঁদুর! গায়ে কাঁটা দিল নীতুর। একটানে ফ্রিজের দরজা খুলল। ওপরের শেলফে একটা বোতল বোঝাই কালো রঙের জুস। দুধের বোতল খুলল নীতু। নেই। শেষে জুসের বোতল নিয়েই ছুটল সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি বাইছে নীতু, কলজে যেন গলায় এসে ঠেকেছে।

নিকোলাসের ঘরে ঢুকল নীতু। দোলনা ধরে দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চা। মুখ হাঁ করে কাঁদছে। নীতুকে দেখে থেমে গেল কান্না। হাত বাড়াল বোতলের দিকে। বোতলটা ওর হাতে দিল নীতু। দেখল বোতল মুখে পুরে চুক চুক করে জুস খাচ্ছে নিকোলাস। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নীতু। যাক, বাচ্চা ঠিকই আছে। স্রেফ খিদেয় কান্নাকাটি করছিল। ঘরে জিরো ওয়াটের লাল রঙের ডিম বাতি ছাড়া কিছুই জ্বলছে না। নীতু সুইচ খুঁজল অন্য বাতিগুলো জ্বেলে দেয়ার জন্য। আশ্চর্য! ডিম বাতি আর এয়ার কুলারের সুইচ ছাড়া আর কোনও সুইচ নেই ঘরে। এয়ার কুলার বন্ধ। তাই ভাপসা গরম লাগছে। এসি ছাড়ল নীতু। চলল না এয়ার কুলার। নষ্ট নাকি? নীতু জানালার দিকে এগিয়ে গেল। মনে পড়ে গেল মিসেস বারলফের সতর্কবাণী। তিনি জানালা খুলতে নিষেধ করেছেন। হয়তো বিদ্যুতের আলোয় ভয় পেয়ে জেগে যেতে পারে নিকোলাস, এ আশঙ্কায়। এখন তো জেগেই আছে বাচ্চা। জানালার পর্দা টেনে সরাল নীতু।

থেমে গেছে বৃষ্টি। আকাশের কালো মেঘ কেটে ভেসে উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ। রূপোলি আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিল নিকোলাসের দোলনা। সে মুখে বোতল রেখে চোখ বড়বড় করে তাকাল চাঁদের দিকে।

জানালা খুলতে যাচ্ছে নীতু, থমকে গেল অদ্ভুত একটা শব্দ শুনে। বাচ্চার মাথার পেছনের জানালায় থ্যাচ্ করে একটা শব্দ হয়েছে। এগিয়ে গেল নীতু। কাঁচের গায়ে সেঁটে আছে একটা বাদুড়, তাকিয়ে রয়েছে বাচ্চার দিকে। ঘেন্নায় মুখ বাঁকাল নীতু, পিছিয়ে গেল এক কদম। আরেকটা বাদুড় এসে নামল জানালায়। নিকোলাস হাঁ করে তাকিয়ে আছে বিকট প্রাণীগুলোর দিকে। হঠাৎ হাত থেকে বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে মেঝেতে। ঝুঁকে গেল জানালার দিকে। মেঝে থেকে বোতলটা তুলে নিল নীতু। ঘন কয়েক ফোঁটা রস পড়েছে মেঝেতে। কালচে রক্তের মত দেখাচ্ছে। গা টা কেমন রি রি করে উঠল নীতুর।

ঠিক তখন নীতুর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল নিকোলাস, লম্বা, একটানা সুরে কাঁদতে লাগল। ট্যাঁ আঅ্যা-ট্যাঁ আ আ! হাত বাড়িয়ে দিল। কোলে নিতে বলছে। নিকোলাসের কান্নাটা ঠিক যেন মানুষের বাচ্চার মত নয়, প্রলম্বিত ভৌতিক একটা সুর। গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল নীতুর। ওকে কোলে নেবে কি নেবে না দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে, চিৎকারের মাত্রা বেড়েই চলল বাচ্চার। শেষে বাধ্য হয়েই ওকে কোলে নিল নীতু। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল কান্না। নীতুর ঘাড় জড়িয়ে ধরল নিকোলাস।

নীতুর পেছনে আবার থ্যাচ করে শব্দ হলো। বুঝতে পারল আরেকটা বাদুড় এসে বসেছে জানালায়। ওদের দিকে তাকিয়ে আছে নিকোলাস, চাঁদের আলোয় চকচক করছে চোখ। ওকে কাঁধে তুলে নিল নীতু। আদর করে চাপড়ে দিতে লাগল পিঠে। ওর মাথাটা ঘাড়ের পাশে এলিয়ে দিল। ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছে। নীতু টের পেল নিকোলাসের শরীর হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠেছে। অদ্ভুত হিস্‌স্‌ শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারল নীতু, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক। চারটে ছোট দাঁত কামড়ে ধরল ওর ঘাড়, এক টানে ছিঁড়ে ফেলল জুগুলার ভেইন।

জে. বি স্টাম্পার-এ 'দ্য মিডনাইট ফিডিং' অবলম্বনে

অনীশ দাস অপু

***